PG BN S1 02 (DSC)

দ্বি-বার্ষিক স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম

(সি.বি.সি.এস; এন. ই.পি ২০২০ অনুসরণে)

প্রথম ষাণ্মাসিক

বাংলা সাহিত্যের পরিচয়-২

বাংলা



পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়া মানবিক বিদ্যা অনুষদ

কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

ড° উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, (অবসরপ্রাপ্ত), বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

ড° জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রাগজ্যোতিষ কলেজ

ড° কান্তারভূষণ নন্দী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এল.ও.কে.ডি মহাবিদ্যালয়

ড° সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠ্যবিষয়েৰ সমন্বয় রক্ষাকারী : **ড° সৈকত ৰাউত,** কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ড° মৃণাল জ্যোতি গোস্বামী, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যয়ন উপকরণ নির্মাণ গোষ্ঠীর সদস্য

অধ্যায়	লেখক
১	দীপঙ্কর সাহা, গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
২, ৭ ও ১১	ড° মধুমিতা সেনগুপ্ত, আর্য বিদ্যাপীঠ কলেজ
৩	ড° বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, করিমগঞ্জ মহাবিদ্যালয়
৪, ৫, ৯ ও ১৩	ড° দেবযানী দে, কটন বিশ্ববিদ্যালয়
৬	চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ডি.ডি.আর মহাবিদ্যালয়
৮	অশোক কুমার রায়, সন্দিকৈ গার্লস কলেজ
১২	অশোক কুমার রায়, সন্দিকৈ গার্লস কলেজ, সহযোগিতায়- সঞ্জীব দেবলস্কর, শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক, শিলচর
১০	ড° অঙ্কিতা মিশ্র, লামডিং কলেজ
১৪	ড° সৈকত রাউত, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে ১. পূরবী দাস, গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, ২. ঋতুপর্ণা পাল, গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্পাদনা : **জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত,** অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রাগজ্যোতিষ কলেজ

ড° সৈকত রাউত, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থন বিভাগের সম্পাদনা : **ড° সৈকত রাউত,** কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

This Self learning Material (SLM) of the Krishna Kanta Handique State Open University is made available under a Creative Commons Attribution-Non License (international) Commercial-Share Alike 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে পঞ্জীয়ক দ্বারা প্রকাশিত

মুখ্য কার্যালয় : পাটগাঁও, রাণী গেট, গুয়াহাটি-৭৮১০১৭

নগর ক্যাম্পাস : রাষ্ট্রীয় সড়কপথ-২৭, রেশম নগর, খানাপাড়া, গুয়াহাটি-৭৮১০২২·, www.kkhsou.in

পাঠ্য বিষয়ের পরিচয় : বাংলা সাহিত্যের পরিচয়-২

বর্তমান মডিউলটি CBCS দ্বারা প্রস্তাবিত NEP-2020 আদরা অনুযায়ী সাজানো একটি দ্বিবার্ষিক স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের প্রথম ষাণ্মাসিকের জন্য গৃহীত পাঠ্য বিষয়। এই পাঠ্য বিষয়ের শিরোনাম 'বাংলা সাহিত্যের পরিচয়-২', শিরোনামটি মডিউলের অধীন পাঠে কী কী আয়ত্ত করা যেতে পারে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। সমগ্র পাঠ্য বিষয়টি অধ্যয়ন করলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা অনুরাগীরা বাংলা সাহিত্যের (বিশেষত আধুনিক যুগের) বিশিষ্ট রূপ, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সামগ্রিক গতি-প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবেন। যুগসন্ধিরকাল ও তার সাহিত্য চেতনা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হবেন। সেই সঙ্গে এখানে আধুনিক যুগের বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদান ও প্রকরণকে নির্বাচন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তির কৌতূহল এবং পরীক্ষা-ভিত্তিক উদ্দেশ্যের সমস্ত দিককে আয়ত্ত করার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত এই সকল বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই স্ব-অধ্যয়নমূলক বইটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি দিক-নির্দেশক সেতুবন্ধক মাত্র। আশা করা যায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা পাঠ্য অন্তর্গত পাঠগুলি ভালোভাবে আয়ত্ত করে তাদের সৃজনশীলতা এবং শেখার মান প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন এবং তাঁরা স্ব-শিক্ষা অর্জনের পথে সফলভাবে এগিয়ে যেতে পারবেন।

এই মডিউলটিতে সর্বমোট ১৪টি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ের নাম 'যুগসন্ধি ও বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা'। এই পাঠে মূলত বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধিরকাল ও আধুনিকতার সূচনা পর্বটির বিষয়ে আলোচনা করে এই পর্বে আধুনিকতার সূচনাতে বিভিন্ন সাহিত্যিক, ছাপাখানা, নতুন শিক্ষার যে অবদান তারই নির্বাচিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যিক উপাদান হিসাবে বাংলা কাব্যসাহিত্যকে দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম অধ্যায় ও একাদশ অধ্যায়ে 'আধুনিক বাংলা কবিতা-'১/২/৩' শিরোনামে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। যেখানে বাংলার বিভিন্ন আধুনিক কবির কবি কৃতিত্ব আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে বাংলা সাময়িকপত্রের ভূমিকাকে 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সাময়িকপত্র' শিরোনামে আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টম অধ্যায় ও দ্বাদশ অধ্যায়ে বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। এই তিন অধ্যায়ে বাংলা গদ্য রচনাকার ও প্রাবন্ধিকদের সাহিত্য উপদানের উপর বিশদে আলোকপাত করা হয়েছে। ঠিক একইভাবে পঞ্চম, নবম, ত্রয়োদশে অধ্যায়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাটিকে ধরা হয়েছে। এখানে যেমন নাটকের পূর্বসূত্র, রঙ্গমঞ্চের বিষয়ে আলোচনা রয়েছে ঠিক তেমনি বিভিন্ন বিশিষ্ট নাট্যকারদের বিষয়েও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা রয়েছে। আমরা জানি বাংলা আধুনিকতার একটি সুফল হল কথাসাহিত্যের আবির্ভাব তাই, ষষ্ঠ, দশম ও চতুর্দশ অধ্যায়ে বাংলা কথাসাহিত্যের বিভিন্ন পর্বান্তর ও বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিকদের গল্প ও উপন্যাস নিয়ে সংবদ্ধ আলোচনা রয়েছে। এই অধ্যায়গুলোতে মূলত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বহু বিচিত্র প্রকরণগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই পাঠ্যবিষয়গুলো অধ্যয়ন করার সময়, শিক্ষার্থী মূল পাঠের নীচে আয়তকার বাক্সের মধ্যে পাঠের অতিরিক্ত কিছু বিষয় 'জেনে রাখা ভালো' শিরোনামে জানতে পারবেন। আবার, 'অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন'-এর মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশ্নাবলি শিক্ষার্থীর অধ্যয়নের অগ্রগতির স্ব-মূল্যায়নের সুবিধা দেবে। এই প্রশ্নাবলির উত্তর বা উত্তরের নির্দিষ্ট সংকেত 'অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত'-এ উল্লেখ করা হয়েছে। 'অতিরিক্ত পঠন' বিভাগে উল্লিখিত বইগুলোও এই অধ্যায়ে আলোচিত বিভিন্ন ধারণার বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য সহায়ক, একইসঙ্গে এই অধ্যায়টি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ঋণস্বীকারক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থী যদি এই বিষয় সম্পর্কে আরও জানতে চান তবে উল্লিখিত বইগুলো অধ্যয়ন করতে পারেন। কিছু নমুনা প্রশ্নও অধ্যায়ের শেষে 'আদর্শ প্রশ্নাবলি' হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

বিষয়সূচি

অধ্যায় ১ : যুগসন্ধি ও বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা

যুগসন্ধির পরিচয়, বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, কবি ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশন ব্যবস্থা, নতুন শিক্ষা, শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

অধ্যায় ২ : আধুনিক বাংলা কবিতা-১

মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন,বিহারীলাল চক্রবর্তী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়

অধ্যায় ৩ : বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সাময়িকপত্র

সাময়িকপত্র উদ্ভবের ইতিহাস, হিকিজ গেজেট, সংবাদপ্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, সবুজপত্র, গ্রামবার্তা প্রবেশিকা, বামাবোধিনী, কৃত্তিবাস

অধ্যায় ৪ : আধুনিক বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ-১

উইলিয়াম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যায় ৫ : আধুনিক বাংলা নাটক-১

বাংলা নাটকের পূর্বসূত্র, রঙ্গমঞ্চ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

অধ্যায় ৬ : আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য-১

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অধ্যায় ৭ : আধুনিক বাংলা কবিতা-২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুকান্ত ভট্টাচার্য

অধ্যায় ৮ : আধুনিক বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ-২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, বুদ্ধদেব বসু

অধ্যায় ৯ : আধুনিক বাংলা নাটক-২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিজন ভট্টাচার্য, মন্মথ রায়

অধ্যায় ১০ : আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য-২

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী

অধ্যায় ১১ : আধুনিক বাংলা কবিতা-৩

শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, রণজিৎ দাশ

অধ্যায় ১২ : আধুনিক বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ-৩

সৈয়দ মুজতবা আলী, শিবনারায়ণ রায়, সুজিৎ চৌধুরী, সুকুমারী ভট্টাচার্য

অধ্যায় ১৩ : আধুনিক বাংলা নাটক-৩

বাদল সরকার, উৎপল দত্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র

অধ্যায় ১৪ : আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য-৩

সুবোধ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবারুণ ভট্টাচার্য

অধ্যায় ১ : যুগসন্ধি ও বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা

বিন্যাস-ক্রম

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১.২ পরিচিতি
১.৩ যুগসন্ধির পরিচয়
১.৪ বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট
১.৫ কবি ঈশ্বরগুপ্ত
১.৬ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১.৭ প্রকাশন ব্যবস্থা
১.৮ নতুন শিক্ষা
১.৯ শ্রীরামপুর মিশন
১.১০ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ
১.১১ অধ্যায় সংক্ষেপ
১.১২ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১.১৩ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১.১৪ অতিরিক্ত পঠন
১.১৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধির পরিচয় এবং আধুনিকতার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানবেন।
- কবি ঈশ্বরগুপ্ত এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি-কৃতিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- প্রকাশন ব্যবস্থা ও নতুন শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত হবেন।
- শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সম্পর্কে জানবেন।

১.২ পরিচিতি

একসময় একমাত্র পদ্যই ছিল বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রকাশ-মাধ্যম। গদ্যের প্রচলন ছিল চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ লেখায়। মনে রাখতে হবে পোর্তুগিজ ও ইংরেজ খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতে বাংলা গদ্যের সূচনা। পোর্তুগিজ মিশনারি মানো-এল-দ্য-আস্‌সুম্পসাঁও ও ইংরেজ মিশনারি উইলিয়াম কেরীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এক্ষেত্রে বাংলা গদ্যের সূচনা পর্বে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, সেগুলি হল—

- বাইবেলের বঙ্গানুবাদকে ঘিরে জন্ম নেয় এক দুর্বোধ্য রীতির বাংলা গদ্য তথা 'সাহেবি বাংলা'।
- আরবি-ফারসি শব্দবহুল বাংলা গদ্য তথা 'আদালতি বাংলা'।
- সংস্কৃত পণ্ডিতদের লেখনীতে সৃষ্ট সংস্কৃত শব্দবহুল গদ্য তথা 'সাধুরীতির গদ্য'।
- মুখের ভাষা বা কথ্যভাষা অনুসরণে 'কথারীতি'বা 'চলিতরীতি'-র গদ্য।



জেনে রাখা ভালো

ম্যানুয়েল-দ্য-আস্‌সুম্পসাঁও বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' রচনা করেন। একই সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও শব্দকোষ বা অভিধান রচনার কৃতিত্বও তারই।

লক্ষ করার বিষয়, গদ্যসাহিত্যের আদিপর্বেই প্রথম দুটি ধারার বিলুপ্তি ঘটে। সাধু ও চলিতরীতি গদ্যসাহিত্যের প্রকাশ হয়ে দাঁড়ায়। কালক্রমে সাধুরীতির গদ্য প্রায় দেড়শো বছর ধরে অপ্রতিহত প্রাধান্য বিস্তার করে।

গদ্যসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল গল্পাদির অনুবাদ দিয়ে। আধুনিক নাট্যসাহিত্যেও সংলাপধর্মী গদ্য নির্মাণ লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যের বিকাশ হয় প্রধানত দু-ভাবে- কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধসাহিত্যে। কথাসাহিত্য হল গল্প ও উপন্যাস। প্রবন্ধ সাহিত্যের বিষয়-বৈচিত্র্য অনেক-ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য সমালোচনা ইত্যাদি। এছাড়া পত্রসাহিত্য, জীবনস্মৃতি, জীবনীমূলক রচনা, ভ্রমণকাহিনি, রোজনামচা, নক্‌শা প্রভৃতি প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

যুগসন্ধিক্ষণে বাংলা-সাহিত্যে বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কবি ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্তের মতো সাহিত্যিকদের পাশাপাশি প্রকাশন ব্যবস্থা, নতুন শিক্ষা, শ্রীরামপুর মিশন সবকিছুর ভূমিকা অতুলনীয়। তবে প্রাথমিক পর্বে সাধু গদ্যরীতিতে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন, তাঁরা হলেন— ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠী এবং তাঁর সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরবর্তী লেখকগোষ্ঠী।

১.৩ যুগসন্ধির পরিচয়

বাংলা সাহিত্য যুগ বৈশিষ্ট্যের নিরিখে প্রধান তিনটি যুগে বিভক্ত। আদি, মধ্য ও আধুনিক। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস যে-কোনো সাহিত্য যুগের নিয়ামক। স্বভাবতই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনায় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের ঘটনাপুঞ্জের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল ক্রিয়াশীল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রারম্ভিক কাল হিসাবে গণ্য করা হয়। তার আগে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির রণপ্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। ভারতের ভাগ্যাকাশে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে চিহ্নিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে

ইংরেজ রাজত্ব ভারতের বুকে কায়েম হয় শক্তপোক্ত ভিতের উপর। সেজন্য প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল অবসিত হয় চরম অরাজকতা, নৈরাজ্য, অত্যাচার-অবিচার, নিষ্ঠুর শাসন-শোষণের মাধ্যমে। ভারতের ইতিহাসে এই মহাসংকটময় অধ্যায়ের প্রভাব থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও মুক্তি পায়নি। এই ছিল বাংলা সাহিত্যের তমসাচ্ছন্ন যুগসন্ধি। তমসাচ্ছন্ন বলার অর্থ, এই পর্বে বাংলা সাহিত্য পুরোপুরি নিষ্ফলা না থাকলেও কোনো প্রতিভাবান যুগনায়কের আবির্ভাব সম্ভাবিত হয়নি। তবে আঁধার রাত্রির অবসানই তো নবারুণের উদয়কে ত্বরান্বিত করে। একইভাবে যুগসন্ধির অন্ধকারকে পেছনে ঠেলে আলোকোজ্জ্বল আধুনিক যুগ সূচিত হয় বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে। বিদেশি জাতির পদানত হওয়ায় এদেশবাসীর বৃহত্তর জীবনযাত্রায় বিশাল পরিবর্তন ঘটে। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। বিলাত থেকে আমদানিকৃত শিল্পজাত সম্পদের অবাধ বাণিজ্যের ফলে কুটিরশিল্পের উপর নির্ভরশীল দেশীয় শিল্প কাঠামোর মূলে পড়ে কুঠারাঘাত। ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ফাঁস এদেশবাসীর গলায় চেপে বসে। ভূমির উপর প্রজার স্বত্ব লোপ পেয়ে সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে একশ্রেণির জমিদারের উপর ভূমিস্বত্ব ন্যস্ত হয়।

কলকাতার মতো নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটে ঠিকই কিন্তু শিক্ষা-সংস্কৃতি নগরমুখী হয়ে পড়ে। মধ্যবিত্ত পরিচয়বাহী এক শ্রেণির চাকুরিজীবী মানুষ নব্যবাবুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এই ব্যাপকতর ওলট-পালট মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ ও ভাবনাচিন্তা থেকে আধুনিক মানসিকতায় উত্তরণের পথ গড়ে দেয়। এদেশ শাসনের প্রয়োজনে ও কিছুটা খ্রিশ্চান মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের স্বার্থে ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হয় কলকাতাসহ উল্লেখযোগ্য শহরে-নগরে। ইংরেজি শিক্ষার ফলে এদেশীয় শিক্ষিত মানুষ পশ্চিমি সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হন। জীবনধর্মী সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব নতুন যুগভাবনায় তাঁদের অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করে। মধ্যযুগীয় দেব-নির্ভর ভাবনাচিন্তা থেকে সরে এসে জীবনধর্মী মানবতাবাদে তাঁরা দীক্ষিত হন। সৃজনধর্মিতায় আসে নতুন ভাবের জোয়ার, যা নবগঠিত বিজ্ঞানের প্রভাব আধুনিক সমাজ ও জীবনযাত্রার সঙ্গে যোগ রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙালির চিন্তার নবজাগরণ ও বাংলা জগতে আসে নবজাগৃতির উত্তাল জোয়ার। তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে আধুনিক সাহিত্যে, চারু ও কারুকলায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায়, অধ্যাত্মচিন্তায়, এক কথায় জীবনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে। কালক্রমে এই নবজাগরণের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে সম্ভাবিত হয় আধুনিক পরিচয়বাহী নতুন যুগ।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধির পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১.৪ বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল বিভিন্ন বৈচিত্র্যে ভরপুর। একদিকে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে ১৭৯৩ সালের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বাংলার সমাজজীবনে

যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। অন্যদিকে গ্রাম বাংলার ভাঙনের ফলে বাংলায় এক নতুন জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ইংরেজ সরকার সুপরিকল্পিত ভাবে আমাদের পল্লীকেন্দ্রিক কুটিরশিল্পাশ্রয়ী অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেয়। এছাড়াও আরও অনেক পরিবর্তন লক্ষণীয়—

- গ্রাম্য সমাজের বিনিময়প্রথা প্রধান অর্থনীতি পরিবর্তিত হয়। গ্রাম্য সমাজের প্রাচীন ঐতিহ্য, রীতিনীতি, বদ্ধমূল ধ্যান-ধারণা, জাতিভেদ ও কুলবর্ণগত সংস্কার, ধর্ম ও শাস্ত্রগত সংস্কারে ভাঙন দেখা যায়।
- নতুন শহর ও নগরের বিকাশ ঘটে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। মধ্যস্বত্বভোগীরা শহুরে চাকুরিজীবীতে পরিণত হয়।
- রাস্তাঘাটের উন্নতি, যানবাহনের বিকাশ গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বহুদিনের বদ্ধমূল ভিতকে নাড়িয়ে দেয়। ফলত গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়।
- উনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণ লক্ষ করা যায় ধর্ম আন্দোলনে, সমাজ সংস্কারে, সাহিত্যে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে।
- ইংরেজি শিক্ষার ফলে পাশ্চাত্যভাব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বিকাশ লক্ষ করা যায়।
- জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশে সামাজিক বিবর্তন লক্ষ করা যায়।
- বৈদেশিক শোষণ রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- রাজস্ব ও করের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
- মুদ্রার প্রবর্তন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যাপকহারে কাগজী মুদ্রা ছাপানোর ফলে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়।
- ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে কৃষির ক্ষেত্রে প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হয়। খরা, বন্যা ইত্যাদি কৃষি ক্ষেত্রের উপর আঘাত হানায় বঙ্গে দরিদ্র অবস্থা প্রকাশ পায়।

১.৫ কবি ঈশ্বরগুপ্ত

যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক তথা দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের সাহিত্যগুরু, যিনি বাংলা কাব্য জগতে নতুন প্রাণ সঞ্চারের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলা কাব্য জগতে যখন 'গোধূলি আকাশের পতঙ্গের মত' কবিওয়ালারা কাব্যের আসর জমিয়ে রেখেছিলেন, সেই অবক্ষয়ের যুগে কবি-সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব বাংলা কাব্য জগতে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রথম সার্থক মুক্তি যদিও মধুসূদনের হাতে তবুও কবি ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কবিতায় নিয়ে এলেন এক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যা তাঁর পূর্বের কবিদের কাব্যে ছিল না। অনেক সমালোচক কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য করেছেন—

- 'বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান অনন্য সাধারণ, নতুন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুরাতন প্রবাহকে অব্যাহত রাখিয়াই তিনি নতুনের জন্য খাত খনন

করিয়া তাহাতে নব নব ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। .....কাব্য সাহিত্যে পুরাতন ধারার তিনি শেষ কবি এবং নতুন ধারার তিনি উদ্বোদ্ধা।' (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

- 'উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, সংবাদ প্রভাকরের 'প্রভাকর' ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) সে যুগের বাংলা কাব্যের প্রায় একমাত্র কবি ছিলেন।' (ভূদেব চৌধুরী)।
- 'গত শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত বাঙালী আমরা পরম উৎসাহে নতুন শিক্ষায় মেতেছিলুম, তখন সে উৎসাহ ছিল স্বাভাবিক, একমাত্র সোজা পথ। সমাজ ব্যবস্থায় মোড় ফেরার সময় তখন নতুন শিক্ষায় ছিল জীবিকার ভরসা এবং নতুন জীবনযাত্রার আশা। সে আশা-ভরসার চেহারা আজকে স্পষ্ট হয়েছে অনেক নৈরাশ্যের সংঘর্ষে। তাই আজকে আমাদের উত্তরাধিকার আবিষ্কার করতে হলে যাঁদের রচনাবলী বিচার করতে হবে, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিশেষ মর্যাদা।' (বিষ্ণু দে)
- 'মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর কবি, ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙালী কবি জন্মে না, জন্মিবার জো নাই, জন্মিয়া কাজ নাই। (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

১৮১২ খ্রিস্টাব্দে কাঁচড়া পাড়ায় ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম। পিতার নাম হরি নারায়ণ গুপ্ত, মাতা শ্রীমতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্র বিমাতার সংসারে বেশিদিন বাস করেননি, মায়ের মৃত্যুর অল্প দিন পরেই তিনি মামার বাড়িতে চলে যান। এঁদের বৈষয়িক অবস্থা ভাল ছিল না বলে সেখানেও তাঁকে দারিদ্র্যের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। এরপর তাঁর বিবাহও সুখকর হয়নি। তরুণ কবির পিতা আর্থিক সাশ্রয় এবং কৌলীন্যের মোহে একটি কৃষ্ণাঙ্গী রমণীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। পুত্রের তাতে ঘোর আপত্তি ছিল। ক্ষুব্ধ ঈশ্বরচন্দ্র সারাজীবন পত্নীর সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ রেখেছিলেন, অথচ তাঁর আর্থিক দায়িত্ব অস্বীকার করেননি কখনো। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের রুচির অভাবের কারণ সম্বন্ধে জানিয়েছেন—

- পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা।
- মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব।
- সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম শিক্ষা করি, তাঁহার পবিত্র সংসর্গের অভাব।
- সমাজের অত্যাচার এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ।

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, ভূমিকাংশ)

ঈশ্বর গুপ্তের রচনাবলী

১। 'কালীকীর্তন' (১২৪০ বঙ্গাব্দ/১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ),
২। 'ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনবৃত্তান্ত' (১২৬৩),
৩। 'প্রবোধ প্রভাকর' (১২৬৪ বঙ্গাব্দ),
৪। 'হিতপ্রভাকর' (১২৬৭ বঙ্গাব্দ),
৫। 'বোধেন্দুবিকাশ' (১২৭০ বঙ্গাব্দ)

এছাড়া কিছু কবিগানও তিনি রচনা করেছিলেন। পাশাপাশি 'সত্যনারায়ণের ব্রতকথা' নামে বাউল গানের প্যারোডিও তিনি রচনা করেছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্ত সাংবাদিক হিসাবেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি তাঁর সম্পাদনায় 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়। প্রথমে পত্রিকাটি সাপ্তাহিক, পরে সপ্তাহে তিনবার এবং শেষে তা প্রতিদিন প্রকাশিত হত। এটিই বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রথম দৈনিক পত্রিকা। এছাড়া ১৮৪৬ সালে ঈশ্বর গুপ্ত 'পাষণ্ড পীড়ন'এবং 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' (১৮৪৭) নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন।

সুকুমার সেন বিষয়বস্তু অনুসারে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন- পারমার্থিক-নৈতিক, সামাজিক এবং প্রেমরসাত্মক। গুপ্তকবির কবিতায় আধুনিকতার কয়েকটি লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন— সমাজচেতনা, যুক্তিপ্রধান মনোভাব, ইতিহাসচেতনা, কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধাচরণ, কবিতাকে সঙ্গীতধর্ম থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা, উনিশ শতকের নবজাগ্রত যুগচেতনাকে সমর্থন, মিশনারীদের অত্যাচারের প্রতিবাদ, কবিতার বিষয় নির্বাচন, স্বাদেশিকতা, এবং কবিগোষ্ঠী তৈরির প্রচেষ্টা।

স্বভাবতই ঈশ্বরগুপ্তের রচনায় আমরা বিভিন্ন দিক ফুটে উঠতে দেখি—

- 'লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল,
  তারাই এখন চড়বে ঘোড়া।
  ঠাটঠমকে চালাক চতুর
  সভ্য হবে থোড়া থোড়া।
  আর কি এরা এমন করে
  সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে?' (সমাজচেতনা)
- 'কাতর কিন্তু আমি, তোমার সন্তান।
  আমার জনক তুমি, সবার প্রধান।।
  বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান।
  একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কান।।' (যুক্তিপ্রধান মনোভাব)
- 'মিছে কেন কুল নিয়ে কর আঁটা-আঁটি।
  এ যে কুল কুল নয় সারমাত্র আঁটি।' (কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধাচরণ)
- 'কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়।
- 'আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল
  ব্রতধর্ম কোর্ত্তো সবে।
  একা 'বেথুন'এসে শেষ করেছে,
  আর কি তাদের তেমন পাবে।।
  যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে,
  কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
  তখন 'এ বি'শিখে বিবি সেজে
  বিলাতি বোল কবেই কবে।। (ইংরেজি শেখা মেয়েদের বিবিয়ানার প্রতি কটাক্ষ)

- 'অগাধ কিনা বিদ্যাসাগর তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।
  তাতে বিধবাদের "কুলতরী"
  অকূলেতে কূল পেলে না।' (বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে)
- 'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
  আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে।।'
  (নববর্ষ উৎসবে বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীদের প্রতি ব্যঙ্গ)

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকে বলেছেন, 'ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist।' এমনকি এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন— 'ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ, কেবল ঘোর ইয়ার্কি। যেখানে সম্মুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে এক কানমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন-কারণ আর কিছুই নয়, দুইজনে একটু হাসিবার জন্য। কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গভর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনান্ট গভর্ণর, কাউন্সিলের মেম্বর হইতে, মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়া নাই, এক একটি চড় চাপড় এক একটি বজ্র-যে মারে, তাহার রাগ নাই, কিন্তু যে খায়, তার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার পাত্রপাত্রি বিচার নাই।'



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। কবি ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য প্রতিভার পরিচয় দিন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১.৬ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা কাব্যজগতে ঈশ্বরগুপ্ত ও মধুসূদনের মধ্যে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, তিনি হলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)। গুরু ঈশ্বর গুপ্তের পত্রিকায় তথা 'সংবাদ প্রভাকর'-এ তাঁর কবি হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনি বাংলা ঐতিহাসিক কাব্যের সূত্রপাত করলেন। প্রসঙ্গত সুকুমার সেন যথার্থই মন্তব্য করেছেন—

'ইংরেজী কাহিনী-কাব্যের রোমান্স রসের যোগান দিয়া রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নবযুগের দিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখ ফিরাইলেন, অবান্তর কাল্পনিক পরিবেশে স্থূল প্রণয়লীলার স্থানে তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেশপ্রেমকে কাজের বিষয়রূপে গ্রহণ করিলেন।'

ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য রঙ্গলাল প্রথম জীবনে কবিগানের বাঁধনদার হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারায় ভাবিত হয়ে আধুনিক বাংলা কাব্যে ঐতিহাসিক কাহিনির মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রেমের আবেগকে সঞ্চার করে দিলেন। উনিশ শতকের মধ্যভাগে পরাধীনতার গ্লানিকে কেন্দ্র করে যে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন ঘটে, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেই যুগধর্মকে তাঁর কাব্যে রূপ দিয়েছেন। স্বদেশপ্রেম ও ইতিহাসের পটভূমিকায় বীর রসকে কেন্দ্র করে মানবচেতনাকে উদারতার ক্ষেত্রে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি বাংলা কাব্য জগতে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর নিজের সম্পাদনা 'সংবাদ-রসসাগর'-এ (১৮৫০-৫৩) অনেক রচনা প্রকাশ করার পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। এছাড়া তিনি 'এডুকেশন গেজেট'ও 'সাপ্তাহিক বার্তাবহ'-র সহ সম্পাদকও ছিলেন।

রঙ্গলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮)। এই আখ্যানকাব্যের বিষয়বস্তু টড-এর রাজস্থান (Annals and Antiquities of Rajasthan)-এর কাহিনি অবলম্বনে রচিত। আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ এবং জহরব্রতে আগুন জ্বালিয়ে পদ্মিনীর আহুতি দানের কাহিনি অবলম্বনে এই কাব্য রচিত। কাব্যের ভূমিকায় কবি এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

'পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়। বিশেষত ঐ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের তত্তাবৎ শ্রদ্ধাই নহে, বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালংকারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং বনদৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুতেতিহাস অবলম্বন পূর্বক রচিত করিলাম।'

এই কাহিনি পুরোপুরি ঐতিহাসিক নয়। রাণা ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর সৌন্দর্যই চিতোর ধ্বংসের যে কারণ সেকথাই রঙ্গলাল তাঁর গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। পদ্মিনী ও রাজপুত রমণীদের অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জনের কাহিনি অনেকখানি নিরুত্তাপ ও আবেগহীন হয়ে পড়েছে। বিশেষত ক্ষত্রিয়দের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছে—

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?'

কবি যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ মেলে এই কবিতায় টমাস ম্যুরের 'Glories of Brien the Brave' এবং 'From life without Freedom'-এর ছায়াপাত ঘটেছে।

বাংলা কাব্যে শৌর্য-বীর্যের মাধ্যমে রোমান্স সঞ্চারের কৃতিত্ব রঙ্গলালের অবশ্য কবির রচনারীতি ছিল প্রাচীনপন্থী। বীর রসের কাব্যেও সেই পুরাতন পয়ার ত্রিপদী। মালকাঁপ-একাবলী ছন্দের গতানুগতিকতাকে অবলম্বন করেছেন কবি। প্রকৃতিচিত্রণেও কবির কৃতিত্ব লক্ষণীয়। পদ্মিনী উপাখ্যানের আরম্ভ হয়েছে প্রকৃতি-বর্ণনার মাধ্যমে 'আহা এইরূপ শোভা অতি অপরূপ।' এবং উপাখ্যানের শেষে কবি লিখেছেন—

"ঘুমঘোর থাকিবে কি আর?
ভারতের ভাগ্যজোর দুঃখ বিভাবরী ভোর
ইংরাজের কৃপা বলে মানস উদয়াচলে,
জ্ঞান ভানু প্রভায় প্রচার।।"

মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য'প্রকাশিত হওয়ার পর রঙ্গলালের 'কর্মদেবী'কাব্য (১৮৬২) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের বিষয়বস্তুও রাজপুত কাহিনি থেকে নেওয়া এবং কাব্যটি চারটি সর্গে বিন্যস্ত। কাব্যটিতে নায়ক-নায়িকার আত্মত্যাগ ও সতীত্ব, মহিমা এবং নারী-

প্রেমের রোমান্টিক মাধুর্য চিত্রিত হয়েছে। সুকুমার সেন কাব্যটির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন— 'কর্মদেবী পদ্মিনী উপাখ্যান অপেক্ষা বেশি বর্ণনাময়। ভাষা পূর্বের মতোই তবে অলঙ্কারে মধুসূদনের অনুসরণ প্রচেষ্টা বেশ স্পষ্ট।'

রঙ্গলালের তৃতীয় কাব্য 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮)। রাজপুত নারীর শৌর্যগাথা ও নারীর সতীত্বরক্ষা কাব্যটির প্রতিপাদ্য বিষয়। কাব্যটিতে প্রতাপের শৌর্যবীর্য ও স্বদেশপ্রেম, শক্তি-সিংহের আতৃপ্রেম, পৃথ্বীরাজের দুর্বলতা স্পষ্ট রূপে চিত্রিত। 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯) রঙ্গলালের সর্বশেষ আখ্যান কাব্য। কাব্যটির বিষয় উড়িষ্যার ইতিহাসের এক রোমান্টিক কাহিনি। পুরুষোত্তম দাসের প্রাচীন উড়িষ্যা কাব্যকে তিনি অনুসরণ করেছেন। কাহিনি সাতটি সর্গে বিন্যস্ত, চতুর্থ সর্গ ছাড়া অন্য সর্গগুলিতে কবির কৃতিত্ব সমধিক। সুকুমার সেন এই কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন- 'কাঞ্চীকাবেরী'র বিষয় বেশ রোমান্টিক। তাহার উপর ভক্তিরসের প্রবাহ থাকায় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। ভাষা সরলতর এবং ছন্দপ্রবাহ সুললিত।'

আখ্যানকাব্য ছাড়া রঙ্গলাল সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের অনুবাদও (১৮৭২) করেছিলেন। এছাড়া তিনি টমাস গারনেলের 'The Battle of the Frogs and Mice' অবলম্বনে 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' (১৮৫৮) নামক রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক কাব্য রচনা করেন। এমনকি রঙ্গলাল সংস্কৃত থেকে হিতোপদেশপূর্ণ ২০টি শ্লোকের পয়ার ত্রিপদী ছন্দে অনুবাদ করে 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' নামক নীতিমূলক কবিতা রচনা করেন। সংস্কৃত, ইংরেজি বাদ দিয়ে ওড়িয়া সাহিত্যও কবির জানা ছিল। দীন কৃষ্ণদাসের 'রসকল্লোল'থেকে অনুবাদ করে 'বর্ষাযাপন'কবিতা রচনা করেছেন তিনি। এছাড়া রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পারসী কবি ওমর খয়্যামের কতকগুলি রুবাই বাংলা পয়ারে অনুবাদ করেছিলেন। রঙ্গলালের কাব্য উঁচুমানের না হলেও নানা কারণে তিনি বাংলা কাব্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

- বাংলা কাব্যে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের উত্তরসূরি এবং মধুসূদনের পূর্বসূরি।
- সুকুমার সেন তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে লিখেছেন— 'বাঙ্গালীর সাহিত্য-ইতিহাসে রঙ্গলালের মূল্য শুধু নতুন কবিতার নান্দী-পাঠক রূপেই নহে। প্রথম সাহিত্য সমালোচক রূপেও তাঁহার অগ্রগামী কৃতিত্ব স্মরণীয়।'
- 'পদ্মিনী উপাখ্যান' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্বদেশচেতনামূলক আখ্যান কাব্য।
- বাংলা কাব্যে দেশপ্রেমের উজ্জীবনে এবং দেশপ্রেমমূলক রোমান্স সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।
- সংস্কৃত, ইংরেজি, ওড়িয়া, ফারসি কবিতার অনুবাদেও তাঁর কৃতিত্ব ধরা পড়েছে।
- কাব্যপ্রকরণে পুরাতন রীতি গ্রহণ করলেও বিদেশী কবিদের তিনি অনুসরণ করে পাশ্চাত্য ভাবধারাকে কাব্যে আনয়ন করেন।
- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবির কৃতিত্ব সম্পর্কে লিখেছেন- 'তিনি গীতিউচ্ছ্বাসময় ভাষায়ও শৌর্যদীপ্ত ভঙ্গীতে এই কাব্যগুলি রচনা করিয়া বাংলা কাব্যের মোড় ফিরাইয়া দিলেন ও নতুন বিষয়ের সহিত অভিনব কাব্যরীতির সংযোগে যে গতানুগতিকতার গ্লানিমুক্ত কবিতা রচনা করা যায়, তাহা প্রমাণ করিলেন।'



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে যা জানেন, লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১.৭ প্রকাশন ব্যবস্থা

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠী ও স্কুল বুক সোসাইটির লেখা বই স্কুলকলেজের পাঠ্যপুস্তক হলেও যেহেতু বাংলা গদ্যে রচিত, সেহেতু বাংলা গদ্য মোটামুটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে ভাবপ্রকাশ করে। তারই উত্তরাধিকার নিয়ে বাংলা গদ্য কিছুটা রামমোহন রায়ের লেখনীতেও সাময়িকপত্রের অনেকাংশে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক ও অনুবাদধর্মী রচনায় সাহিত্য গুণান্বিত হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যচর্চার এই আধুনিকী করণে ছাপাখানা, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের প্রভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হ্যালহেড সাহেবের ব্যাকরণে যে সমস্ত বাংলা শব্দের ব্যবহার হয়েছিল, সেগুলি মুদ্রণের জন্য স্যার চার্লস উইলকিনস ছেনি দিয়ে কাঠ কেটে বাংলা হরফ তৈরি করেন। গ্রন্থটি হুগলিতে ছাপা হয়। উইলকিনস এদেশ ত্যাগ করার আগে বাংলা অক্ষর প্রস্তুতি পঞ্চানন কর্মকার-কে শিখিয়ে যান। শ্রীরামপুর মিশনারি স্থাপিত ছাপাখানায়ও কাঠের বাংলা অক্ষর ব্যবহার করা হয়। এই ছাপাখানার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবও ছিল—

- মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের আগে যে-কোনো গ্রন্থের অনুলিপি তৈরি করতে পারলে তবেই গ্রন্থটির প্রচার সম্ভব হত। হাতে লিখে অনুলিপি তৈরি করা ছিল যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ব্যাপার, তাই গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার সম্ভব ছিল না।
- ছাপাখানা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশের সহায়ক হওয়ায় সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশের পথ খুলে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বহুবিধ সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে ১৫৫৬ সালে গোয়ায় প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি স্থাপিত হয়। বাংলায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় ১৭৭৭ সালে। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালেদ ১৭৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি থেকে 'A Grammar of the Bengal Language'-গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যেখানে বাংলা হরফের প্রথম মুদ্রিত উপস্থিতি দেখা যায়। জেমস অগাস্টাস হিকি ১৭৮৯ সালে 'Bengal Gazette' নামে সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন।

বাংলা হরফ নির্মাণকারী তথা বাংলা ছাপাখানা ও মুদ্রণশিল্পের জনক হিসেবে যাঁকে আমরা জানি তিনি ব্রিটিশ সিভিলিয়ান স্যার চার্লস উইলকিন্স (১৭৫০-১৮৩৬)। ছেনি কেটে হরফ তৈরির কৌশল তিনি লন্ডনে থাকার সময়ই আয়ত্ত করেছিলেন। হরফ নির্মাণে তাঁর সহযোগী ছিলেন বাঙালি খোদাই শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার। হুগলির ত্রিবেণীর অধিবাসী পঞ্চানন একমাত্র বাঙালি, যিনি ঢালাই করা চলনশীল ধাতব হরফ তৈরি করার কৌশল তৈরি করতে পেরেছিলেন। পঞ্চাননের তৈরি অক্ষরেই ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিসের কোড মুদ্রিত হয়। ১৭৮৫ সালে জোনাথন ডানকানের 'ইম্পে কোড'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় তাঁর তৈরি হরফে। মূলত ডানকানের এই

গ্রন্থের মাধ্যমেই বাংলা গদ্য রচনার সূচনা হয়।

বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসের অবদান আলাদা করে বলতে হয়। উইলিয়াম কেরী, জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ডের মতো কিছু উৎসাহী ব্যক্তি ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারি ছাপাখানাটি প্রতিষ্ঠা করেন। ছাপাখানাটি থেকে ধর্মপুস্তকসহ বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য বই প্রকাশিত হয়েছে। ছাপাখানাটির সঙ্গে ইংরেজদের পাশাপাশি দুজন বাঙালির নাম (পঞ্চানন কর্মকার ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য) জড়িয়ে আছে। গঙ্গাকিশোর ছিলেন একাধারে মুদ্রণশিল্পী, পুস্তক ব্যবসায়ী, প্রকাশক এবং গ্রন্থকার। বাঙালি প্রকাশক হিসেবে তিনি প্রথম ইতিহাসে পরিচিত। গঙ্গাকিশোর কলকাতায় 'বাঙ্গালী প্রেস'নামের একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেট' তাঁরই ছাপখানা থেকে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়।

পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশেও পর্তুগিজ বণিকদের মাধ্যমে বাংলা প্রকাশনার সূচনা হয় ঢাকার ভাওয়াল পরগনায়। ১৮৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বার্ত্তাবহ যন্ত্র' ছাপাখানাটি থেকে প্রকাশিত হতো রংপুরের প্রথম সাময়িকপত্র 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ'। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন গুরুচরণ রায় নামের একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। রংপুরের পর ঢাকার ছোটো কাটরায় প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাটিকে বাংলার পুরনো প্রেস বলা যায়, যা পরে 'ঢাকা প্রেস' নামে পরিচিত হয়। এখান থেকে 'দ্য ঢাকা নিউজ' পত্রিকা প্রকাশিত হতো। তবে ১৮৫৯ সালে বাবুবাজারের 'বাঙ্গালা যন্ত্র'কেই ঢাকার পুরনো ছাপাখানার মর্যাদা দেওয়া হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা মালিক ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় যে মুদ্রণযন্ত্র ছিল, তা নিতান্তই ক্ষুদ্রাকৃতির। তখন বেশির ভাগ প্রকাশনা কলকাতা থেকে মুদ্রিত হতো। ক্রমে ঢাকায় নিজের প্রয়োজনে আধুনিক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সরকারি ফরম, গেজেট, নানা ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা ছাপার প্রয়োজন তো ছিলই, সেই সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক ও সংবাদপত্র মুদ্রণের বিপুল চাহিদা থাকার কারণে সরকারি ও বেসরকারি-উভয় ক্ষেত্রে দ্রুত মুদ্রণশিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে।

বর্তমানে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের মুদ্রণশিল্প প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যকে কম্পিউটার মুদ্রণকৌশল বিষয়ক নতুন কারিকুলাম প্রবর্তন করা হয়, যেখানে ইমেজ সেন্টার, ড্রাম স্ক্যানার, ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানার, লেজার প্রিন্টার, ইংক জেট প্রিন্টারসহ আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। কম্পিউটারে বাংলা অক্ষরবিন্যাসের জন্য কয়েকটি ভিন্ন ধরনের কি-বোর্ড আছে। ডিজিটাল প্রিন্টিংয়ে সরাসরি কম্পিউটার টু প্লেট (সিটিপি) প্রযুক্তি আসার ফলে পজিটিভ প্রসেসিং করে প্লেট তৈরির ঝামেলা দূর হয়েছে, খরচও কমেছে।

১.৮ নতুন শিক্ষা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন শিক্ষা বলতে মূলত অষ্টাদশ শতকের আধুনিকতার সূত্রপাত এবং উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রসঙ্গের কথা বোঝায়। বিদেশি জাতির পদানত হওয়ায় এদেশে মানুষের জীবনযাত্রায় বিশাল পরিবর্তন ঘটে এবং কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। প্রজাস্বত্ব লোপ পেয়ে সামন্ত্রতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জমিদারের উপর ভূমিস্বত্ব ন্যস্ত

হয়। কলকাতার মতো নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটলেও শিক্ষা-সংস্কৃতি নগরমুখী হয়ে পড়ে। এছাড়াও অনেক কিছুর ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ ও ভাবনাচিন্তা থেকে আধুনিক মানসিকতায় উত্তরণ ঘটে মানুষের—

- এদেশে শাসনের প্রয়োজনীয়তায় এবং ধর্ম প্রচারের স্বার্থে কলকাতা সহ উল্লেখযোগ্য শহরে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে।
- ইংরেজি শিক্ষার ফলে এদেশীয় শিক্ষিত মানুষ পশ্চিমী সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়।
- জীবনধর্মী সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব নতুন যুগ ভাবনায় ও সৃজনধর্মীতায় নতুন জোয়ার নিয়ে আসে।
- পয়ার-ত্রিপদীর প্রচলিত ধারা ছেড়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে আখ্যানকাব্য রচনা শুরু হয়।
- নতুন আঙ্গিকের সনেট বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুনত্ব নিয়ে আসে।

শুধু তাই নয়, শিক্ষা সম্পর্কে যখন দেশের দুরবস্থা, সেইসময় দেশের জনসাধারণ বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। এক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, কেরী সাহেব, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, হরপ্রসাদ রায়, চণ্ডীচরণ মুন্সী, প্রমুখের অবদান স্বীকার্য।

কেবল কলকাতাই নয়, শহর থেকে দূরে মফঃস্বলের নানা স্থানেও ইংরেজি শিক্ষার বিকাশ ঘটেছিল। গঙ্গা তীরবর্তী চুঁচুড়া শহরে রবার্ট মে (Robert May) নামে লন্ডন মিশনারি সোসাইটিভুক্ত খ্রিস্টীয় প্রচারক ১৮১৪ সালে একটি ইংরেজি স্কুল খোলেন। দু-এক বছরের মধ্যে সেই সকল স্কুলে প্রায় ৯৫১ জন বালক ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। জনশ্রুতি রয়েছে, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যে সেইসময় বিভিন্ন ইংরেজি স্কুল তৈরি হতে থাকে। এছাড়া হিন্দু কলেজও সেইসময় নতুন শিক্ষার প্রসারে অনেকটাই সহযোগিতা করেছিল।

১.৯ শ্রীরামপুর মিশন

বাংলা গদ্যের চর্চার ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে। প্রধানত বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্যই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান মিশনারীরা কলকাতার নিকটবর্তী হুগলির শ্রীরামপুরে এই মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার পর থেকে প্রতিদিনের কাজকর্মে এবং জীবিকার প্রয়োজনে শিক্ষার গুরুত্ব দ্রুতবেগে বাড়তে থাকে। ইংরেজরা শাসনকার্য পরিচালনার জন্য গদ্য চর্চা করতে থাকেন।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য প্রথমে বঙ্গদেশে আসেন উইলিয়াম কেরী ও টমাস। এরপর ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে কেরীকে সাহায্য করার জন্য এসেছিলেন ওয়ার্ড, বার্নসডন, গ্রান্ট ও মার্শম্যান প্রমুখ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা। কলকাতাকে প্রচার কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন বলেই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ও মার্চ মাসে প্রেসের কাজ আরম্ভ হয়। এই প্রেস থেকেই প্রথম মুদ্রিত হয় 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' (১৮০১), 'কাশীদাসী মহাভারত' (১৮০২)।

শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড এই তিনজনের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে বাংলা গদ্যচর্চার জন্য। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার পর কেরী ও তাঁর সহযোগীরা দেশীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। স্বভাবতই তাঁরা মনে করেছিলেন একদিকে রামায়ণ ও মহাভারত ছেপে প্রকাশ করলে ও অন্যদিকে দেশীয় ভাষায় বাইবেল লিখে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করলে তারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হবে। তাই শ্রীরামপুর মিশন থেকে বাংলা সহ প্রায় কুড়িটি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেছিলেন মিশনারীরা। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়েছিল। যে হিন্দুধর্ম ও সমাজ দীর্ঘকাল ধরে সুদৃঢ় ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বহু আঘাত সহ্য করেও তা টলেনি, তাকে দুটি টেস্টামেন্টের অনুবাদের দ্বারা যে বিচ্যুত করা যায় না তা বোধ হয় কেরী প্রভৃতিরা উপলব্ধি করতে পারেননি। তবুও বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিশেষত গদ্য ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে এঁদের এবং এই মিশনের দান স্বীকার করতেই হয়।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রচার পুস্তিকা—

- শ্রীরামপুর মিশন বাংলা গদ্যে প্রথম পাঠ্যপুস্তক ব্যাকরণ, রামায়ণ ও মহাভারত মুদ্রণ করে প্রকাশ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ, ব্যোপদেবের মুগ্ধবোধ, কোলব্রুকের সম্পাদনায় অমরকোষ প্রভৃতি। এছাড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত প্রকাশ করে মিশনারীরা বাংলা ও বাঙালির উপকার করেছিলেন।
- শ্রীরামপুর মিশন থেকে 'মঙ্গল সমাচার মতিউর' নামে Gospel of St. Mathews (১৮০০, ৭ই ফেব্রুয়ারী) মূল গ্রীক থেকে অনুদিত হয়। এরপর ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ বাইবেল 'ধর্মপুস্তক' নামে প্রকাশিত হয়। এসব কাজে মিশনারীদের সাহায্য করেন রামরাম বসু। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই প্রায় আশিটি পুস্তক রচিত হয় ও সাত লক্ষ কপি বিতরিত হয়।
- মার্শম্যান ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই রচনা করেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'দুটি খণ্ড (১৮৩১), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮) ইত্যাদি। এছাড়া শ্রীরামপুর প্রেস স্কুল বুক সোসাইটি থেকে মুদ্রিত হয় লসন, পিয়ার্স, ওয়েঙ্গার, কিথ, বাটন প্রমুখদের রচনা।

বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামপুর মিশনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট—

- শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মূলত ধর্মপ্রচারের জন্য এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা গদ্য রচনা করেছিলেন। তাই খ্রিস্টানদের প্রসঙ্গকে দেশবাসীদের বোধগম্য ও উপভোগ্য করে তোলার তাগিদে তাঁরা গদ্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের অন্তরের কৌতূহল ভাষার মৌল প্রবণতার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিল। তাঁদের এই চেষ্টাই পরবর্তী বাংলা গদ্যের মুক্তির সম্ভাবনাকে গতিদান করেছিল।
- পুরোনো বাংলা কাব্য, মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ফলে এবং ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়ার ফলে তা দেশীয় মানুষদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

- মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক যুগের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃত প্রভাবিত হতে পেরেছিল।
- বাঙালির মধ্যে পরোক্ষ আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগ করে দেবার ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা ছিল যথেষ্ট।
- গোপাল হালদার শ্রীরামপুরের মিশনের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রসঙ্গত বলেছেন- 'সত্যই যদি বাইবেল স্বচ্ছন্দ বাঙলায় অনূদিত হত তাহলে বাঙলা লেখকের ভাব-জগতের মধ্যে হয়ত যীশুর উক্ত কথা বা গল্প ও ধারণা এমন বেমানান ঠেকত না। কারণ, আরবদের 'আরব্য রজনী'র মত য়িহুদীদের ওল্ড টেস্টামেন্টও পৃথিবীর একখানা মহৎ গ্রন্থ, আর যীশুর কাহিনী সবল, সরল ও অপূর্ব ভাব-সম্পদ। সে রস খাঁটি বাঙলায় পরিবেশিত হলে সাহিত্য হত।'

১.১০ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

এদেশে সরকারি কাজে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের এদেশীয় ভাষা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা অন্যতম। বাংলা, মারাঠি ও সংস্কৃত ভাষাচর্চা ও অধ্যাপনার প্রধান দায়িত্ব বর্তায় শ্রীরামপুর খ্রিস্টান মিশনারির পরিচালক উইলিয়াম কেরীর উপর। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা মেটানোর জন্য উইলিয়াম কেরী ও তাঁর বাঙালি সহকর্মীরা লেখনী ধরেন।

মূলত খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই শ্রীরামপুর খ্রিস্টান মিশনের প্রতিষ্ঠা। উইলিয়াম কেরী ছিলেন শ্রীরামপুর মিশনের প্রধান। তিনি এদেশে আসেন ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর। এদেশে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আইনকানুন সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া দরকার। তাই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় লালবাজারের সন্নিকটে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা, মারাঠি ও সংস্কৃত ভাষার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন অধ্যাপক কেরী। বাংলা গদ্যের বিকাশে কেরীর লেখা দুটি বই 'কথোপকথন' (১৮০১) ও 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) বিখ্যাত।

হুগলির চুঁচুড়ায় রামরাম বসুর জন্ম। তিনি জন টমাসের বাংলা শিক্ষক ছিলেন। শ্রীরামপুর মিশনে যোগ দেন ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। এক বছর পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), 'লিপিমালা' (১৮০২) উল্লেখযোগ্য। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের জন্ম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ভদ্রকে। তিনি যৌবনে কলকাতায় চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন উইলিয়াম কেরীর অনুরোধে। কলেজের ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্য তিনি 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলি' (১৮০৮), 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮১৩) রচনা করেন। 'বত্রিশ সিংহাসন' সংস্কৃত ভাষায় রচিত

'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। 'হিতোপদেশ' অনুবাদ গ্রন্থ, পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি এই গ্রন্থে অনূদিত হয়েছে। 'রাজাবলি' ভারত ইতিহাসের ঘটনাবলি ও রাজাদের কাহিনি নিয়ে লেখা। বিষয়বস্তু ও ভাষা শৈলীর দিক থেকে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর লেখা 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্রং' ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র-চিত্রণ ছিল এই গ্রন্থের লক্ষ্য। রাজীবলোচনের গদ্য তখনকার ভাষার তুলনায় অনেকটাই সরল ও সহজবোধ্য ছিল। গোলোকনাথ শর্মা ছিলেন প্রধানত অনুবাদক। তাঁর অনূদিত গ্রন্থ 'হিতোপদেশ' (১৮০২), যা মৃত্যুঞ্জয়ের 'হিতোপদেশ' প্রকাশের আগে প্রকাশিত হয়। চণ্ডীচরণ মুনশি ছিলেন ফারসি ভাষার অধ্যাপক। তাঁর 'তোতা ইতিহাস' ফারসি ভাষায় লেখা 'তুতিনামা'-র বাংলা অনুবাদ। গ্রন্থটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। হরপ্রসাদ রায় ছিলেন বাংলা বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক। তাঁর 'পুরুষ পরীক্ষা' গ্রন্থটি ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে লেখকগোষ্ঠীর ভাষা অনেক ক্ষেত্রে ছিল সংস্কৃত পণ্ডিতি ভাষা। কর্তা, ক্রিয়ার দূরান্বয় দেখে বোঝা যায়, বাংলা গদ্যের তখন নিতান্ত শিশুদশা; ভাষা আড়ষ্ট। সাধুরীতিতে রচনার জন্য সংস্কৃতের আদর্শ প্রধানত অনুসৃত হয়েছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই সৃষ্টিসম্ভার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১.১১ অধ্যায় সংক্ষেপ

যুগসন্ধি হল একটি যুগের শেষ ও অপর একটি যুগের শুরুর দিক নির্দেশক। আধুনিকতা মূলত এই যুগসন্ধির আড়ালেই লুকিয়ে থাকে। আসলে একটি প্রচলিত ভাবনার বদলই তো আধুনিকতার লক্ষণসূত্র। বাংলা প্রকাশন ব্যবস্থার স্থাপন ও গদ্যের আবির্ভাব মধ্যযুগীয় বৃত্ত থেকে বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকতার পাদপ্রদীপে পৌঁছে দিতে বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা আবির্ভাবের এই পূর্বসূত্রগুলোকে ধরে তার বৈশিষ্ট্যকে সংবলিত আলোচনার আওতায় আনা হয়েছে।



১.১২ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টি পড়ে আমরা—

- যুগসন্ধির পরিচয় এবং বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানলাম।
- কবি ঈশ্বরগুপ্ত এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পেলাম।
- প্রকাশন ব্যবস্থা ও নতুন শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত হলাম।
- শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং তৎসঙ্গে সেখানকার লেখকদের সম্পর্কে জানলাম।



১.১৩ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। স্বভাবতই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনায় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের ঘটনাপুঞ্জের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল ক্রিয়াশীল।...আধুনিক যুগের পর্ববিভাগ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগকে প্রথমত দুটি প্রধান পর্বে ভাগ করা যা- ...ইংরেজ শাসনপর্বকে তিনটি উপপর্বে ভাগ করা যায়। —এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১.৩)

২। বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রথম সার্থক মুক্তি যদিও মধুসূদনের হাতে তবুও কবি ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কবিতায় নিয়ে এলেন এক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যা তাঁর পূর্বের কবিদের কাব্যে ছিল না। ...ঈশ্বর গুপ্তের রচনাবলী- ...সুকুমার সেন বিষয়বস্তু অনুসারে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন- পারমার্থিক-নৈতিক, সামাজিক এবং প্রেমরসাত্মক।...তাই বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকে বলেছেন, 'ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist' —এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১.৫)

৩। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা কাব্যজগতে ঈশ্বর গুপ্ত ও মধুসূদনের মধ্যে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, তিনি হলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)।...ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য রঙ্গলাল প্রথম জীবনে কবিগানের বাঁধনদার হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারায় ভাবিত হয়ে আধুনিক বাংলা কাব্যে ঐতিহাসিক কাহিনির মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রেমের আবেগকে সঞ্চার করে দিলেন।...রঙ্গলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮)। ...আখ্যানকাব্য ছাড়া রঙ্গলাল কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের অনুবাদও (১৮৭২) করেছিলেন। —এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১.৬)



১.১৪ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৪, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মে ২০১২); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ); কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (প্রথম প্রকাশ, ১৪০২, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪২৯); সাহিত্য প্রকরণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬), পুনর্মুদ্রণ, (২০১০-২০১১); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, একাদশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪); সাহিত্য টীকা; কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ



১.১৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। যুগসন্ধির পরিচয় দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে যা জানো লিখুন।

৩। প্রকাশন ব্যবস্থা ও নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচয় দিন।

৪। বাংলা গদ্য সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ২ : আধুনিক বাংলা কবিতা-১

অধ্যায় বিন্যাস

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

২.২ আধুনিক কবিতার সাধারণ পরিচয়

২.৩ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

- ২.৩.১ কবি পরিচয়
- ২.৩.২ কাব্য পরিচয়
- ২.৩.৩ মধুসূদনের কাব্যের বিশেষত্ব

২.৪ নবীনচন্দ্র সেন

- ২.৪.. কবি পরিচয়
- ২.৪.২ কাব্য পরিচয়
- ২.৪.৩ নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যবৈশিষ্ট্য

২.৫ বিহারীলাল চক্রবর্তী

- ২.৫.. কবি পরিচয়
- ২.৫.. কাব্য পরিচয়
- ২.৫.. বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যের বিশেষত্ব

২.৬ মানকুমারী বসু

- ২.৬.. কবি পরিচয়
- ২.৬.২ কাব্য পরিচয়
- ২.৬.৩ মানকুমারী বসুর কাব্যবৈশিষ্ট্য

২.৭ কামিনী রায়

- ২.৭.. কবি পরিচয়
- ২.৭.২ কাব্য পরিচয়
- ২.৭.৩ কামিনী রায়ের কবিতার বিশেষত্ব

২.৮ অধ্যায় সংক্ষেপ

২.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে কী শিখলাম

২.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

২.১১ অতিরিক্ত পঠন

২.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- আধুনিক কবিতার সাধারণ রূপরেখা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- উনিশ শতকের আধুনিক বাংলা কবিতার ধারা সম্পর্কে পরিচিত হবেন।
- উনিশ শতকের বাংলা কবিদের সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন।
- নির্বাচিত কবিদের কাব্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অবলম্বন করে অধ্যায়ের শেষাংশে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে পারবেন।

২.২ আধুনিক বাংলা কবিতার সাধারণ পরিচয়

সব রূপান্তরের পেছনে কিছু না কিছু কারণ থাকে। মধ্যযুগকে পেছনে ফেলে বাংলা কবিতার এই রূপান্তরের মূলে ছিল বাংলার নবজাগরণ। যা এসেছিল মূলত পাশ্চাত্যের নবজাগরণের হাত ধরেই। এছাড়া বাংলা কাব্যের রূপান্তরের পেছনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভূমিকাও কম নয়। পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) শুধু বাঙালির জীবন নয়, গোটা ভারতবর্ষের জীবন ও সাংস্কৃতিক চিন্তার যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল তারই ফলস্বরূপ উনিশ শতকের বাংলা কবিতার পালাবদল এবং নবজন্ম। যদিও অস্বীকার করার উপায় নেই যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবেই এর উৎপত্তি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— "আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় তাতে সন্দেহ নেই।" (বাংলা কাব্য পরিচয়: রবীন্দ্রনাথ)

উনিশ শতকে ইউরোপীয় প্রভাব তথা নানা পরিপার্শ্ব চেতনার ফলে বাংলা কবিতার যে নবসূচনা হলো, তার প্রথম পথিকৃৎ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁকে বলা হয় যুগসন্ধির কবি। পুরাতন এবং নতুন চিন্তার সূত্র স্থাপনে যাঁর কবিতা অনেকখানি কার্যকরী হয়েছিল। ঈশ্বরগুপ্তের পরবর্তী যে কবিরা উনিশ শতকের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক যুগোত্তীর্ণ আলো ফেলেছেন, বর্তমান অধ্যায়ে আপনারা সেই কবিতা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করবেন।

২.৩ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ব্যক্তিগত জীবনে যিনি বিভিন্ন সংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং কাব্যসাহিত্য সৃষ্টিতে পুরনো ধ্যান ধারণাকে ভেঙে নতুন শৈলী স্থাপন করেছিলেন, তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী এবং আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব এক সত্যিকারের বন্ধনমুক্তির আভাস।

২.৩.১ কবি পরিচয়

বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম। সেইসময়ের প্রভাবশালী ধনী জমিদার আইনজীবী রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন তাঁর পিতা। রাজনারায়ণের প্রথম পত্নী জাহ্নবী দেবীর একমাত্র সন্তান মধুসূদন। ছাত্র জীবনে নিজের গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার পর ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের তাঁর পরবর্তী

গঠন-পাঠন শুরু হয়। সেখানে উচ্চাকাঙ্খার বশবর্তী হয়ে তিনি খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং এই সময় থেকে মাইকেল মধুসূদন নামে পরিচিত হন। ফলস্বরূপ তাঁর পিতা তাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে মাদ্রাজে কিছুদিন কর্মজীবন এবং ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত ছাত্রী রেবেকা ম্যাকটিভিসের সঙ্গে সংসার জীবন কাটিয়ে পরবর্তীতে হেনরিয়েটা নামে মহিলার পাণিগ্রহণ করে বিদেশে চলে যান। সেখানে 'The Visions of the Past', 'The Captive Lady' ইত্যাদি কিছু ইংরেজি কবিতা, খণ্ডকাব্য রচনা করে সুনাম অর্জন না করতে পেরে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফিরে এসে বাংলা কবিতায় মনোনিবেশ করেন।

২.৩.২ কাব্য পরিচয়

মাইকেল মধুসূদন দত্ত উনিশ শতকের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার এবং প্রহসন রচয়িতা। উনিশ শতকের নবজাগরণের বিপুল আলোড়ন কালে নতুন কাব্য চেতনার আদর্শ ও গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব। বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রথম প্রবর্তক তিনি। পাশ্চাত্য আদর্শে মহাকাব্য, গীতিকাব্য, পত্রকাব্য প্রভৃতি রচনা করে বঙ্গভাষার ভাণ্ডারকে তিনি অনেক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন। বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনের সবচেয়ে বড় অবদান প্রথম মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা। শুধু তাই নয় তিনি প্রথম পত্রকাব্য প্রবর্তক, প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, সনেটকার, এমনকি প্রথম গীতিকবিতা রচনার কৃতিত্বেরও দাবিদার। ইংরেজি সাহিত্যে শেলী, বায়রণদের মতো যশোলাভের আশায় তিনি 'Captive Lady' এবং 'A Vision of the Past' কাব্য রচনা করেন। কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ না করায় তিনি পুনরায় বাংলা সাহিত্যে ফিরে আসেন এবং তার পরই রচনা করেন-

ক) তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)
খ) মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)
গ) ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১)
ঘ) বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২)
ঙ) চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)

২.৩.৩ কাব্য বৈশিষ্ট্য

মধুসূদন যে সময়ে জন্মেছিলেন সে সময়টা বুদ্ধিজীবী বাঙালি মানসের ঝড়-তুফানের কাল। প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষে সামাজিক বিপ্লবের সূচনা। ফলে যুগজীবনের চারটি বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল সেগুলি হল-(ক) মানবতাবাদ (খ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (গ) অতীতের পুনর্মূল্যায়ন এবং (ঘ) স্বাজাত্যপ্রীতি। মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। এই কাব্যটি মহাভারতের আদিপর্ব অবলম্বনে রচিত। এই কাব্যের মূল বিষয়, দুই দৈত্য ভ্রাতা সুন্দ ও উপসুন্দের প্রবল পরাক্রমে স্বর্গের দেবতারা স্বর্গচ্যুত হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। এই দেবতাদের রক্ষার্থেই দৈববাণী অনুযায়ী বিশ্বের সমস্ত বস্তু থেকে তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ

করে তিলোত্তমা সুন্দরী সৃষ্টি হন। এই তিলোত্তমাকে পাওয়ার বাসনায় দুই ভ্রাতা পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত হয়ে নিহত হয়। এই কাব্যের বিশেষত্ব —

ক) এই কাব্যের মধ্যেই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার লক্ষিত হয়।

খ) এই কাব্যের মাধ্যমেই প্রথম বাংলা আখ্যান কাব্যের ধারণা স্পষ্ট হয়।

গ) অসুর চরিত্রকে হৃদয়ের সহানুভূতি দিয়ে বিচার করার চেষ্টা এর আগে বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় না।

ঘ) পাশ্চাত্যের রোমান্টিক কাব্যের সঙ্গে আলোচ্য কাব্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।



জেনে রাখা ভালো

সাহিত্যিক মহাকাব্য হল কোনও একজন কবির সুউচ্চ কল্পনা ও ব্যতিক্রমী মননশক্তির দ্বারা নির্মিত। প্রাচীন মহাকাব্যের ধারানুসরণে একটি অখণ্ড, শিল্পমণ্ডিত রসমূর্তি, যাতে প্রতিবিম্বিত হয় জাতির চিন্তা-চেতনা-আরাধনা-সংকল্প ইত্যাদি। অতীত কাহিনির নতুন ও স্বকীয় নির্মাণ, রচনার দক্ষ কারিগরিতে, এই দ্বিতীয় ধরনের মহাকাব্যে যুগন্ধর কবি সমকালকে গ্রথিত করেন সর্বকালের সঙ্গে। কবির জীবন-জিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে ওঠে সাহিত্যিক মহাকাব্যে। ভার্জিলের ঈনিড, ট্যাসোর জেরুজালেম, ডেলিভার্ড, মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট, মধুসূদনের মেঘনাদবধ সাহিত্যিক মহাকাব্যের উত্তম নিদর্শন।

তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'মেঘনাদবধকাব্য' বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে বর্ণিত লক্ষণের হাতে রাবণ পুত্র মেঘনাদের মৃত্যুকে অবলম্বন করে ন'টি সর্গে রচিত হয়েছে এই কাব্যটি। কাব্যটি সমগ্র রামায়ণের মোট তিনদিন ও দু'রাত্রির ঘটনা নিয়ে লিখিত। এই কাব্যের বিশেষত্ব হলো—

ক) গ্রীক মহাকাব্যের আদর্শে কাব্যটি পরিকল্পিত হলেও এটি খাঁটি মহাকাব্য না হয়ে সাহিত্যিক মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে।

খ) কাব্যের কাহিনি বিন্যাস ও চরিত্র পরিকল্পনায় হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিলটনের অনুসরণ করলেও ভাষা-ভঙ্গিমার ক্ষেত্রে তিনি ব্যাস বাল্মীকিকেই গ্রহণ করেছেন।

গ) রাম-রাবণের তুলনায় রাবণ-ইন্দ্রজিৎকে নবযুগের দৃষ্টিতে এবং অধিকতর সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন।

ঘ) বীররসের কাব্য রচনায় কবি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও শেষ পর্যন্ত কাব্যটি করুণরসে পরিণতি লাভ করেছে। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' মধুসূদন রাধার হৃদয়ের আর্তিকে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। রাধার প্রেম বর্ণিত হলেও কাব্যটিতে বৈষ্ণব পদাবলির তেমন কোনো প্রভাব নেই। মধুসূদনের সৃষ্ট রাধাচরিত্র ধর্মতত্ত্বনিরপেক্ষ। বৈষ্ণব পদাবলির মতো কোনো তত্ত্ব আরোপের চেষ্টা তাতে নেই। বরং কৃষ্ণের আকর্ষণে সমাজ সংসার ছিন্ন করে যাওয়ার বাসনায় নারী স্বাধীনতার সন্ধান পাওয়া যায়। আবার এই পরকীয়া প্রেমে বাঙালি নারীর কুলমর্যাদা নষ্ট হবে ভেবে কবির কলমে রাধিকার উক্তি—

"তবে যে সিন্দুর বিন্দু দেখিছ ললাটে
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে।"

'ব্রজাঙ্গনা' কতগুলো ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি, যা গীতিকবিতার মর্যাদায় বাংলা সাহিত্যে বিশেষ আসন অধিকার করে আছে।

নারীহৃদয়ের বিরচিত কামনা বাসনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত 'বীরাঙ্গনা কাব্য।' বাংলা সাহিত্যে 'পত্রকাব্য' হিসেবে যার প্রথম স্বীকৃতি। ফরাসী বিপ্লবের 'লিবার্টি', 'ইকুয়ালিটি', 'ফ্রেটারনিটি' ত্রয়ী মহাবাণীকে হৃদয়ঙ্গম করে নারীচিত্তের বিজয় ঘোষণা করেছেন কবি এই কাব্যে। 'মেঘনাদবধ কাব্য'এ প্রমিলা চরিত্রে যে স্বাধীনচিত্তের আভাস আমরা পাই। প্রতিটি পত্রে নারী চরিত্র সংলাপের মধ্য দিয়ে কাব্যের নাটকীয় বৈশিষ্ট্য ও কাব্যটিকে নতুনত্ব দিয়েছে। 'নীলধ্বজের প্রতি জনা', 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী', 'সোমের প্রতি তারা' প্রভৃতি কাব্যে যেমন নারীর প্রণয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তেমনি হৃদয়ের বেদনা, ঈর্ষা, কামনা, বাসনাও প্রকাশিত হয়েছে।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মধুসূদনের আর একটি অনন্য সৃষ্টি। তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা'র প্রবর্তক। এই সংকলন গ্রন্থে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ক কবিতা সনেট রীতিতে আবদ্ধ হয়েছে। স্বদেশপ্রেম, ব্যক্তিগত জীবনের আশা-নিরাশা, নীতি, ধর্মতত্ত্ব কিংবা ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন কবিদের মহিমা কীর্তন প্রভৃতি বিষয়ক কবিতা স্থান পেয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। যেমন— বঙ্গভাষা, আশা, যক্ষ, সৃষ্টিকর্তা, সূর্য, কৃত্তিবাস, কালিদাস, ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

২.৪ নবীনচন্দ্র সেন

সমালোচক শশীভূষণ দাশগুপ্তের মতে 'এক অনিয়ন্ত্রিত কল্পনা এবং হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য' নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব হয়েছিল নবীনচন্দ্র সেনের। প্রাথমিক ভাবে মহাকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করলেও নবীনচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভা ছিল গীতিকবিতার। মধুসূদন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কিংবা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক হলেও নবীনচন্দ্রের প্রতিভা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বতন্ত্র। তিনি কোনো কবির মন্ত্রশিষ্য ছিলেন না। অত্যন্ত উচ্ছ্বাস এবং ভাবুক মন নিয়ে তিনি লিখে গেছেন কাব্য, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য প্রভৃতি রীতির কাব্য।

২.৪.১ কবি পরিচয়

১৮৪৭ সালের চট্টগ্রাম জেলার নওয়াপাড়া গ্রামে নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম। পিতার নাম গোপীমোহন সেন এবং মাতা রাজরাজেশ্বরী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন এই কবি। কলেজে পড়ার সময় থেকে তাঁর

কিছু কিছু কবিতা প্যারীচরণ সরকার সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষের সংস্পর্শে স্বদেশ চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হন।

২.৪.২ কাব্য পরিচয়

নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যগ্রন্থগুলি হলো-

'অবকাশরঞ্জিনী' (প্রথম ১৮৭১), দ্বিতীয়- ১৮৭৮), 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭), 'রঙ্গমতী' (১৮৮০), 'খ্রীষ্ট' (১৮৯১), 'অমিতাভ' (১৮৯৫), ' অমৃতাভ' (১৯০৯), 'ত্রয়ী' (রৈবতক ১৮৮৭, কুরুক্ষেত্র ১৮৯৩), প্রভাস (১৮৯৬)

নবীনচন্দ্রের প্রথম কাব্য 'অবকাশরঞ্জিনী'তে প্রথম ভাগে বাইশটি এবং দ্বিতীয় ভাগে তেতাল্লিশটি কবিতা আছে। এই কাব্যের বেশিরভাগ কবিতাই প্রেম, প্রকৃতি, গৃহজীবন প্রভৃতি বিষয় নিয়েই রচিত। নবীনচন্দ্র গীতিকবিতা দিয়েই তাঁর কাব্য জীবন শুরু করেছিলেন। 'অবকাশরঞ্জিনী'র বেশিরভাগ কবিতায় তাই রোমান্টিক প্রেমের বিষাদময় সুর ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর এই পর্যায়ের কোনো কোনো কবিতায় বিহারীলালের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যটি স্বদেশপ্রেমমূলক একটি আখ্যান কাব্য। পাঁচটি সর্গে রচিত এই কাব্যটিতে সিরাজদ্দৌলার ভাগ্য বিপর্যয় এবং পরাধীনতার বেদনার কথা তুলে ধরা হয়েছে। কবির স্বদেশের প্রতি প্রেম তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে এবং কাব্যটি বাঙালির মধ্যে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারেও যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পলাশীর ব্যর্থতা সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

"পাণিপথে সেই রবি গেলা অস্তাচলে
ভারতে উদয় নাহি হইল আবার
পঞ্চশতবর্ষ পরে দূর নীলাচলে
ঈষদে হাসিতে ছিল কটাক্ষ তাহার।"

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে 'ক্লিওপেট্রা' কাব্য প্রকাশিত হয়। এটি একটি রোমান্টিক কাব্য। এছাড়া 'রঙ্গমতী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে। এটিও একটি স্বদেশমূলক রোমান্টিক কাব্য।

নবীনচন্দ্রের কবি জীবনের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি তাঁর শেষকাব্য 'ত্রয়ী'। উনিশ শতক মহাকাব্যের ধারায় 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) এবং 'প্রভাস' (১৮৯৬)— এই তিনটি কাব্য মিলে নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী' কাব্য নামে পরিচিত। এই কাব্যটি রচিত হয়েছে মূলত কৃষ্ণের জীবনকথাকে অবলম্বন করে। কাব্যটি রচনা করতে সময় লেগেছিল চৌদ্দ বছর। প্রথম খণ্ডের মূল ঘটনা অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহ। দ্বিতীয় খণ্ডে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমিকায় অর্জুন-সুভদ্রার সন্তান অভিমন্যুর শোচনীয় মৃত্যু এবং তৃতীয় খণ্ডে যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া নবীনচন্দ্র মহাপুরুষের জীবন নিয়ে কয়েকটি জীবনীকাব্য রচনা করেছিলেন। যেমন— যীশু খ্রিস্টের জীবন নিয়ে 'খ্রীস্ট', বুদ্ধের জীবনকথা নিয়ে 'অমিতাভ' এবং চৈতন্য জীবনকাহিনী অবলম্বনে 'অমৃতাভ'। তাছাড়া 'ভগবদগীতা' ও 'মার্কেণ্ডেয় চণ্ডী'র অনুবাদও তিনি করেছেন।

২.৪.৩ কাব্য বৈশিষ্ট্য

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নবীনচন্দ্রের কবি স্বরূপের বিশ্লেষণ সম্পর্কে জানিয়েছেন— "আসলে তিনি ছিলেন রোমান্টিক ও লিরিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী; এই তিন খানি কাব্যের কোন কোন অংশে রোমান্টিক ও লিরিক বৈশিষ্ট্য বেশ চমৎকার ফুটেছে, কিন্তু মহাকাব্যের বিশাল রস ও বিস্ময় তাঁর কবিচরিত্রেও ছিল না। (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত) সমালোচক শশীভূষণ দাশগুপ্ত কবির কবিকৃতিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন— "সকল ত্রুটি বিচ্যুতি সকল অসংযম ও সাবধানতা সত্ত্বেও যে কবি নবীনচন্দ্র আমাদের নিকট এত বড় হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার আর একটা প্রধান কারণ তাঁহার সমগ্র কাব্যের একটা স্পন্দন" (বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, পৃ. ১৫৮)

নবীনচন্দ্রের কাব্যের বিশেষত্ব হলো—

ক) মধুসূদনের উত্তরসাধক রূপে সমকালীন জীবনের শৌর্য-বীর্যময় ভাবধারাকে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করে তিনি আখ্যান কাব্য ও মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। যদিও শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই প্রয়াস খুব বেশি সফল হয়নি। অতিরিক্ত ভাবালুতা মহাকাব্যের ভাব গাম্ভীর্যকে ঢেকে দিয়েছে।

খ) কবি হিসেবে নবীনচন্দ্র ছিলেন কোমল ও আবেগপ্রবণ। তাই তাঁর কবিপ্রতিভা মূলত গীতিকবিতার। এছাড়া দেশাত্মবোধ কবি নবীনচন্দ্রের কাব্যকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।

গ) নবীনচন্দ্র তাঁর কাব্যে রোমান্টিক প্রেমভাবনার সঙ্গে ইতিহাস পুরাণচেতনা ও নীতিবোধের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

ঘ) ভাষা-ছন্দ-অলংকার ও কাব্যরস সৃষ্টিতে কবি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

ঙ) উনিশ শতকের কবি নবীনচন্দ্র মানবধর্মকে সবার উপরে স্থান দিতে চেয়েছেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। নবীনচন্দ্র সেনের কাব্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

২.৫ বিহারীলাল চক্রবর্তী

বাংলা কবিতায় সার্থক রোমান্টিক গীতিকবিতার সূচনা বিহারীলাল'এর হাত ধরেই। যদিও বাংলা মহাকাব্যে গীতিকবিতার সুর বিদ্যমান ছিল। তবুও বিহারীলালকেই আমরা বাংলা আধুনিক গীতিকবিতার ধারার প্রথম পথিকৃৎ বলে ধরে নিতে পারি। গীতিকবিতা হচ্ছে কবিচিত্তের ভাবমূলক প্রকাশ। বাঙালি মানুষ তখন ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে চিরাচরিত সাহিত্যপ্রথার বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে গীতিকবিতার আশ্রয় খোঁজে। বিহারীলালের কবিতা সেই মুক্তির আশ্রয়; একটি নতুন ধারার উৎপত্তি।

২.৫.১ কবি পরিচয়

কলকাতার জোড়াবাগান অঞ্চলে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের উনিশে মে বিহারীলাল চক্রবর্তীর জন্ম। পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্তী। যিনি পৌরহিত্যের কাজ করতেন। কবি খুব অল্প বয়সে তাঁর মাকে হারান। কবি বিদ্যাসাগরের সহপাঠী এবং রেফারেন্স কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষক ছিলেন। সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। মাত্র উনিশ বছর বয়সে দশ বছর বয়সী অভয়াদেবীকে বিয়ে করেন। কিন্তু চার বছরের মধ্যে মৃত সন্তান প্রসব করে অভয়াদেবীর মৃত্যু হয়। এরপর দ্বিতীয় বিবাহ হয়, বউবাজারের নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা কাদম্বিনী দেবীর সনে। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের 'প্রিয়তমা' নামক সর্গে কবি তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রতি গভীর অনুরাগের কথা ব্যক্ত করেছেন । ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে মে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে কবি দেহত্যাগ করেন।

১.৫.২ কাব্য পরিচয়

বাংলা কাব্যের ধারায় মধুসূদন-হেমচন্দ্র-রঙ্গলাল-নবীনচন্দ্র যে রীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিহারীলাল তার সম্পূর্ণ বিপরীত পদ অনুসরণ করেন। বাইরের জগৎ কিংবা পুরাণকথা অবলম্বন করে কবিতা রচনা বাদ দিয়ে এক নতুন আত্মকেন্দ্রিক, অন্তর্মুখী, ভাব তন্ময়রূপী কবিতার জন্ম হল বিহারীলালের হাতে।

কাব্য সাহিত্যে বিহারীলালের প্রথম প্রকাশ 'বন্ধু বিয়োগ' ও 'প্রেম প্রবাহিনী' এ দুটি কাব্যের মাধ্যমে। চারটি সর্গে রচিত 'বন্ধু বিয়োগ' কাব্যটি কবির চার বন্ধু ও প্রথমা পত্নীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে লেখা। এই দুটো কাব্যে কবির অন্তর্গত অনুভূতি ফুটে উঠলেও সার্থক গীতিকবিতার লক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হয় না। আধুনিক গীতিকবিতার অভিনবত্বের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় কবির 'নিসর্গসন্দর্শন' ও 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে। 'নিসর্গসন্দর্শন' ধারাবাহিকভাবে 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাতটি সর্গে রচিত এই কাব্যের সর্গগুলি যথাক্রমে- 'চিন্তা', 'সমুদ্রদর্শন', 'বীরাঙ্গনা', 'নভোমন্ডল', 'ঝটিকার রজনী', 'ঝটিকা সম্ভোগ' এবং 'প্রভাত'। এই কাব্যগুলোতে প্রকৃতির নানা চিত্র কবির অনুভূতির সৌন্দর্যে ফুটে উঠেছে। 'বঙ্গসুন্দরী'তেও গীতিকবিতার বেদনাবিদ্ধ অনুভূতির প্রকাশ পূর্ণতা লাভ করেছে এভাবে—

সর্ব্বদাই হুহু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন।'

'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন' বিহারীলালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। 'সারদামঙ্গল' পাঁচ সর্গে বিভক্ত। সারদাকে কবি সমস্ত বিশ্বের মূল সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে বন্দনা করেছেন। সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই সারদা কবির মনে নানা রূপে ধরা দেন। কল্পনার বশে কবির সাথে তাঁর অনুরাগ অভিমান এবং বিরহ মিলনের লীলা সংঘটিত হয়। উষার বন্দনায় কবি সারদারই আবির্ভাব দেখতে পান—

'চরণ কমলে লেখা
আধ আধ রবি রেখা
সর্বাঙ্গে গোলাপ আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে'।

কখনো আবার এই সারদাকে কবি বুঝতে পারেন না। তাই দ্বিধা ও সংশয় নিয়ে কবির জিজ্ঞাসা—

'তবে কি সকলেই ভুল
নাহি কি প্রেমের মূল
বিচিত্র গগন ফুল কল্পনা লতার'।

'সারদামঙ্গলে' যে কবি সারদার সৌন্দর্য ও তার অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন 'সাধের আসনে' সেই কবি সবকিছু রহস্য মেনে নিয়ে সারদাকে অন্তরে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন।

" আকাশ পাতাল ভূমি সকলি কেবলই তুমি"

বিহারীলালের অন্যান্য কাব্য 'সংগীতশতক', 'মায়াদেবী', 'শরৎকাল', 'ধূমকেতু', 'দেবরাণী', 'বাউল বিংশতি', 'কবিতা ও সংগীত' প্রভৃতি।

২.৫.৩ কাব্য বৈশিষ্ট্য

ক) মহাকাব্য এবং আখ্যান কাব্যের পরে গীতিকবিতার প্রথম স্বাদ এনে দিয়েছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী।

খ) কবি নিজে ছিলেন সঙ্গীত প্রিয়। এই সঙ্গীত প্রিয়তাই তাঁর কাব্যে গীতিকবিতার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল।

গ) বিহারীলালের গীতিকাব্যের প্রধান উপাদান প্রেম ও প্রকৃতি। তাঁর কাব্যে বিশ্বের সৌন্দর্য ও রহস্যকে তিনি প্রাণময় করে তুলেছেন।

ঘ) সারা জীবনব্যাপী সারদারূপী এক রহস্যময়ী দেবীর আরাধনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাথে এখানে এই কবির মিল রয়েছে।

ঙ) কবি হিসেবে বিহারীলালের কৃতিত্ব এখানেই তিনি তাঁর অনুরাগীদের কাব্যবৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, অক্ষয় কুমার বড়াল, প্রিয়নাথ সেন, রামকৃষ্ণ রায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ কবিরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। বিহারীলালের কাব্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

২.৬ মানকুমারী বসু

মানকুমারী বসু উনিশ শতকের একজন খ্যাতনামা মহিলা কবি। সম্পর্কে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। উনিশ শতকের কাব্যসাধনায় মহিলা কবিদের অবদান অস্বীকার করা

যায় না। তাঁদের শৈল্পিক প্রয়াসকে কাব্যের ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা যায় না, কেননা নিজস্ব শিল্পবৈশিষ্ট্যে তাঁরা নিজেরা সুপ্রতিষ্ঠিত। তবুও মহিলা কবিদের রচনায় একটা স্বতন্ত্রতা আছে বলেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন--"তাঁহাদের সমস্ত কবিতায় একটা শান্ত, বিষণ্ণ, আত্মনিবেদনের সুর শোনা যায়। তাঁহাদের কবিতা তুলসী তলায় জ্বলা সন্ধ্যাদীপের সীমিত আলোকের ন্যায়, যিনি মানববুদ্ধির অগোচর, সংসারের সুখ দুঃখের বিধাতা তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভাবারতির স্নিগ্ধ, শান্ত অর্ঘ্য রচনা"। (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, দ্বিতীয় খণ্ড, আধুনিক যুগ, পৃ: ২১৫)

২.৬.১ কবি পরিচিতি

মাতুলালয় শ্রীধরপুরে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি কবির জন্ম। যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে তাঁর পৈতৃক নিবাস। উনিশ বছর বয়সে তিনি অকাল বিধবা হন। ইংরেজি ও সংস্কৃত দুটো ভাষাতেই কবির ছিল অগাধ জ্ঞান। অকাল বৈধব্য তাঁর কাব্যকে দিয়েছে এক বৈরাগ্য এবং সহজ সুরের আবেশ। প্রায় সাত বছর পর্যন্ত তিনি নিরন্তর সাহিত্য সাধনায় মগ্ন ছিলেন। ১৯৩৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ভুবনমোহিনী' স্বর্ণপদক ও ১৯৪১ সালে 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক পান।

২.৬.২ কাব্য পরিচয়

এক দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হলেও মানকুমারী বসু ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একাকী এবং নিঃসঙ্গ। তাই তাঁর কবিতায় জীবনের শোক ও বেদনার সুরটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বিষাদচেতনা যেহেতু গীতি কবিতার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাই মানকুমারীর কাব্যপ্রতিভা তাঁর অন্তর্মুখী বেদনা-বিষাদের সাথে মিলেমিশে তাঁর কাব্যকে এক অপূর্ব আশা দিয়েছে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মানকুমারীর প্রথম গ্রন্থ 'প্রিয়প্রসঙ্গ' প্রকাশিত হয়। মানকুমারী বসুর কাব্য- 'কুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৩), 'কনকাঞ্জলি' (১৮৯৬) , 'বীরকুমারবধ কাব্য' (১৯০৪), 'বিভূতি' (১৯২৪), 'সোনার সাথী' (১৯২৭) প্রভৃতি।

২.৬.৩ কাব্য বৈশিষ্ট্য

মানকুমারীর কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায়, ক্লাসিক যুগের কাব্যের আদর্শ থেকে তিনি খুব একটা সরে আসতে পারেননি। মধুসূদন-নবীনচন্দ্র-হেমচন্দ্রের প্রভাব তাঁর শিল্পী মনকে প্রভাবিত করেছিল। 'বীরকুমারবধ কাব্য' যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আবার অন্যদিকে আত্মগত ভাবপ্রকাশের উদাহরণ মেলে তাঁর 'কনকাকাঞ্জলি', 'কুসুমাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্যে, তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

২.৭ কামিনী রায়

উনিশ এবং বিশ শতকের বাংলা কবিতার ভুবনে যে সকল মহিলা কবিরা স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, কামিনী রায় তাঁদের মধ্যে এক উচ্চ আসন দখল করে আছেন। স্বাভাবিক কাব্যপ্রতিভা এবং উচ্চশিক্ষিত অভিজাত বংশে ব্রহ্ম আদর্শে লালন পালন তাঁর কাব্যকে এক স্বতন্ত্রবোধে উন্নীত করেছেন। ছাত্রজীবনেই বেথুন স্কুলে জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব দানে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সরলা দেবীচৌধুরানী তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন- "এদিকে স্কুলে উপর ক্লাসের কতকগুলি মেয়েদের নেতৃত্ব প্রভাবে আমার জাতীয়তার ভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে লাগলো। তাঁদের মধ্যে অন্যতম নেত্রী ছিলেন- কামিনী দিদি ও অবলা দিদি-কবি কামিনী রায় ও লেডি অবলা বসু।" (জীবনের ঝরা পাতা, রূপা প্রকাশনী, পৃ. ২৮)

২.৭.১ কবি পরিচিতি

বাখরগড় জেলার অন্তর্গত বাসন্ডা গ্রামে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ১২ অক্টোবর কামিনী রায়ের জন্ম। তিনি ছিলেন সে যুগের খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও ম্যাজিস্ট্রেট চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা এবং স্টেটুটারি সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের স্ত্রী। অত্যন্ত মেধাবী এই কবি ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বেথুন কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এছাড়া তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা, যিনি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত অনার্স সহ বিএ পাস করেন। পরবর্তীতে প্রথমে বেথুন স্কুলে এবং পরে কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'সরোজিনী বসু' স্বর্ণপদক লাভ করেন। এছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। নানা গৌরবের অধিকারী হয়েও স্বামী এবং পুত্রের অকাল মৃত্যু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে বিষাদময় করে তুলেছিল। তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'প্রার্থনা' মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত 'মেদিনী' পত্রিকায় স্থান পায়।

২.৭.২ কাব্যপরিচয়

কামিনী রায়ের মোট কাব্যগ্রন্থ ১৪টি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি যথাক্রমে— 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯), 'নির্মাল্য' (১৮৯১), 'পৌরাণিকী' (১৮৯৭), 'অশোকস্মৃতি' (প্রয়াত পুত্রের জীবনী, ১৯১৪), 'মাল্য ও নির্মাল্য' (১৯১৩), 'অশোকসঙ্গীত' (১৯১৪), দীপ ও ধূপ (১৯২৯) ইত্যাদি। এছাড়া নব্যভারত, প্রবাসী ও বিচিত্রায় তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। জীবনের শেষপ্রান্তে নির্বাচিত কবিতা সংগ্রহকালে নিজের কবিতা নিয়ে তিনি বলেছেন—

"যাহা আছে রেখে যাই গাহিতে সময় নাই
বুঝি না জমেছে গীত যত
কি যে তার দামী, কিবা খেলো কী যে শুধু কথা এলো
যতটুকু প্রাণহীন, ততটুকু বাঁচিবার মতো যেনো।"

ব্যক্তিগত জীবনের শোক এবং পারিবারিক ক্ষয়ক্ষতি তাঁর কাব্যাদর্শনকেই পাল্টে দিয়েছিল। তাই 'সুখ' কবিতাতেও বিষাদের সুর ধ্বনিত হয় এইভাবে—

"নাই কিরে সুখ ? নাই কিরে সুখ ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময় ?
যাতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
কেবলই কি নর জনম লয় ?"

আবার পরবর্তীকালে কাব্যের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিগত শোকদুঃখের সীমা উত্তীর্ণ করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়—

"আপনার লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

কামিনী রায়ের প্রেমের কবিতা নিতান্ত অল্প। তাতে আবেগের উত্তাপও কম, বরং বিষাদের ছায়াই বেশি। কবির দেশগৌরবমূলক কিছু কবিতা বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যেমন—

"যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর
দুঃখিনী জনমভূমি মা আমার, মা আমার।"



জেনে রাখা ভালো

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে 'মধুকবি' আখ্যা দেওয়া হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রজ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে 'ভোরের কবি' উপাধি দিয়েছিলেন।

কামিনী রায় ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মহিলা স্নাতক। তিনি একসময় 'জনৈক বঙ্গমহিলা' ছদ্মনামে লিখতেন।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের তিন মহাকবির হলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত-নবীনচন্দ্র সেন-হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২.৭.৩ কাব্য বৈশিষ্ট্য

মাত্র পনের বছর বয়সে 'আলো ও ছায়া' কাব্যের মাধ্যমে কামিনী রায়ের কবিজীবনের শুরু। কবি মানকুমারীর মতো অল্পবয়সে স্বামীর মৃত্যু কামিনী রায়কেও দুঃখ ও বেদনায় পীড়িত করেছিল। এই বেদনাই তাঁর কাব্যের মূল প্রেরণা ও উৎস। যদিও উচ্চশিক্ষা এবং মেধার গুণে গভীর জীবনবোধ তাঁর কবিতাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। ভাব ও ভাষাশৈলীর দিক থেকে কামিনী রায়ের কবিতা একান্ত ভাবেই নারীচিত্তের বৈশিষ্ট্যে রঞ্জিত। যেমন— 'অনল শুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে', 'প্রিয়তম বিচ্ছেদের আছে অবসান' ইত্যাদি বাচনভঙ্গিতে সেই পরিচয় রয়েছে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কামিনী রায়ের কবিতায় যুগসন্ধির যুগ্ম ভাবধারার স্বাক্ষর

আছে। কিন্তু প্রথম কাব্য 'আলো ও ছায়া'র কাব্য ভাবনায় তিনি হেমচন্দ্রের কাব্যসংস্কারকে অতিক্রম করতে পারেননি। কাব্যছন্দের দিক থেকেও তিনি হেমচন্দ্রের অনুসারী ছিলেন। তবুও সমকালীন মহিলা কবিদের মধ্যে কামিনী রায়ের কৃতিত্ব সর্বাধিক। প্রেম-প্রকৃতি-স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ে অতীতের দিক থেকেও কামিনী রায়ের কাব্য বাংলা সাহিত্যের অনন্য, অমূল্য সম্পদ।

২.৮ অধ্যায় সংক্ষেপ

- উনিশ শতকের আধুনিক বাংলা কবিতায় গতি নির্ধারিত হয়েছিল পাশ্চাত্য কবিতার হাত ধরেই।
- বাংলা কাব্যে কবি মধুসূদন প্রথম মহাকাব্য, পত্রকাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেট রীতির প্রবর্তক।
- নবীনচন্দ্র সেনের কবিতায় পুরাতন রীতি অনুসারে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য রচনার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। দেশপ্রেমিক কবি হিসেবে তাঁর কবিতায় স্বদেশপ্রেমের প্রভাবও লক্ষ করা যায়।
- কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীই প্রথম বাংলা কাব্যকে মহাকাব্যিক যুগ থেকে গীতিকবিতার মুক্ত-স্বাধীন স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন।
- মহিলা কবি হিসেবে মানকুমারী বসু ও কামিনী রায়ের কবিতা উনিশ শতকের গীতিকবিতার ধারাকে আরো প্রসারিত করেছে। রবীন্দ্রযুগের কবি হলেও কাব্যসাধনায় তাঁদের নিজস্বতা ছিল স্বকীয়। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের শোক-দুঃখ বাংলা কবিতায় বিষাদময় তা এক অনন্য স্বাদ এনে দিয়েছে।



২.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

১। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাথমিক পর্বের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারলাম।
২। বাংলার মহাকাব্যের ধারা সম্পর্কে অবিহিত হলাম।
৩। বাংলার মহিলা কবিদের কাব্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারা গেল।



২.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রথম প্রবর্তক তিনি।... রচনা করেন-... তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ... 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' মধুসূদন রাধার হৃদয়ের আর্তিকে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ... নারীহৃদয়ের বিরোচিত কামনা বাসনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত 'বীরাঙ্গনাকাব্য'। ... চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মধুসূদনের আর একটি অনন্য সৃষ্টি। —এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ২.৩ অংশ)

২। নবীনচন্দ্রের কবিজীবনের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি তাঁর শেষকাব্য 'ত্রয়ী'। ... প্রথম খণ্ডের মূল ঘটনা অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহ। —এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। দ্রষ্টব্য ২.৪.৩ অংশ

৩। কাব্য বৈশিষ্ট্য : (ক) মহাকাব্য এবং আখ্যানকাব্যের পরে গীতিকবিতার প্রথম স্বাদ এনে দিয়েছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। ... (খ) কবি হিসেবে বিহারীলালের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি তাঁর অনুরাগীদের তাঁর কাব্য বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ২.৫)



২.১১ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল; (১৪১৮ বঙ্গাব্দ) সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা, রত্নাবলী
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (২০১৭) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস;কলকাতা, প্রজ্ঞাবিকাশ
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮) বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা, কলকাতা, তুলসী প্রকাশন
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (২০১৬-২০১৭) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড



২.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। মধুসূদন দত্তের কাব্যবৈশিষ্ট্য নিরূপণ করুন।

২। নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার ধারায় কবি বিহারীলালের অবদান আলোচনা করুন।

৪। মানকুমারী বসুর কাব্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। কামিনী রায়ের কাব্য এবং কাব্যের বিশেষত্ব সম্পর্কে লিখুন।

.....

অধ্যায় ৩ : বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সাময়িকপত্র

বিন্যাস ক্রম

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৩.২ পরিচিতি
৩.৩ সাময়িক পত্র উদ্ভবের ইতিহাস
৩.৪ হিকিজ গেজেট পত্রিকা
৩.৫ সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা
৩.৬ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
৩.৭ বঙ্গদর্শন পত্রিকা
৩.৮ প্রবাসী পত্রিকা
৩.৯ সবুজপত্র পত্রিকা
৩.১০ গ্রামবার্তা প্রবেশিকা
৩.১১ বামাবোধিনী পত্রিকা
৩.১২ কৃত্তিবাস পত্রিকা
৩.১৩ অধ্যায় সংক্ষেপ
৩.১৪ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৩.১৫ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৩.১৬ অতিরিক্ত পঠন
৩.১৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়ে বাংলা সাময়িকপত্রের উদ্ভব ও বিকাশ কিভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করা যাবে। এছাড়াও অন্যান্য সাময়িকপত্র সম্পর্কে নানান তথ্য যেমন হিকিজ গেজেট, সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, সবুজপত্র, গ্রামবার্তা প্রবেশিকা, বামাবোধিনী, কৃত্তিবাস ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা বাংলা পত্রিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারবেন এবং তা থেকে অনেক ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

৩.২ পরিচিতি

খবরের কাগজ পড়ার প্রবণতা প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান। সেই সাময়িকপত্রগুলোতে সাহিত্যকদের কলাম পড়ার জন্য অথবা নানান গল্প, রম্যরচনা পড়ার জন্য প্রত্যেকেই ব্যাকুল। কিন্তু সাময়িকপত্রগুলো উদ্ভব হওয়ারও রয়েছে একটা ইতিহাস। তা যে কোনো বিষয় নিয়ে প্রকাশিত হতে পারে। সীমিত আকার না হয়ে তা বৃহত্তর পরিসরে প্রকাশ হতে পারে। উনিশ

শতকের শেষে বা বিশ শতকের প্রারম্ভে যখন বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ চলছিল তখন একদল সাহিত্যিকেরা তাঁদের লেখনীর দ্বারা নানান ধরনের গল্প, উপন্যাস ,কবিতা, ছোটোগল্প প্রভৃতি প্রকাশ করতে লাগলেন সেইসময়কার সাময়িকপত্রগুলোতে। সম্পাদকেরা তাঁদের প্রাত্যহিক, মাসিক পত্রিকাসমূহতে সেই লেখাগুলো প্রকাশ করতেন। ধীরে ধীরে সাহিত্যিকদের মধ্যে সেই লেখালেখির প্রবণতা আরও বাড়তে লাগল। যার দরুণ কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি নানান সাময়িকপত্রের উদ্ভব হয়। এছাড়াও আমাদের আলোচ্য পত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য- হিকিজ গেজেট, সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, সবুজপত্র, গ্রামবার্তা প্রবেশিকা, বামাবোধিনী, কৃত্তিবাস।

৩.৩ সাময়িক পত্রের উদ্ভবের ইতিহাস

সাময়িক পত্র এমন এক ধরনের প্রকাশনা যা যে কোনো বিষয় নিয়ে প্রকাশিত হতে পারে। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার বিশেষ কোনো পরিধি নেই। এটি একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে, যেখানে রম্যরচনা থেকে শুরু করে বিনোদনের খবর, রাজনীতি, পরিবেশ, পরিচর্যা, দেশীয় খবর, বৈদেশিক খবর, বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশ্বে সাময়িকপত্রের উদ্ভবের বিকাশ বহু পুরানো, তবে আধুনিক সাময়িকপত্রের ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আনুমানিক ১৮ শতকের শেষে বা ১৯ শতকের গোড়ার রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এক নতুন দিশা পেতে শুরু করে। এই সময়কালেই বাংলা ভাষার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে একটি নবজাগরণ ঘটে, যার ফলে বাংলা সাময়িক পত্রের উন্মেষ হয়। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকাকালীন বাংলা ভাষার সাহিত্য ও চিন্তাধারার মধ্যে এক নতুন ধরনের ভাবনা ও আলোচনার ব্যবস্থা তৈরি হয়। ইংরেজ শাসনকালে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এবং সামাজিক ব্যবস্থার জন্য যে সচেতনতার প্রয়োজন, সাময়িক পত্র সেক্ষেত্রে এক অন্যতম ভূমিকা পালন করে। এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান আচার ব্যবহার, ধর্মীয় নীতি, নারীদের অবস্থান, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে নানান আলোচনা শুরু হয়, যা পরবর্তী সময়ে সমাজে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে যথেষ্ট সহায়ক হয়। বাংলা সাময়িকপত্রগুলি শুধুমাত্র যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিকাশ ঘটেছে ঠিক তা নয়, বরং তা রাজনৈতিক পরিবর্তন, দেশপ্রেমের অনুভূতি, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়েও যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। সেই সময়ের লেখকেরাও বিশেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু সহ অন্যান্য লেখকেরাও তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে সমাজে গভীর পরিবর্তন আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

সাময়িক পত্রের উদ্ভব ও ইতিহাস মূলত এক দীর্ঘ পরিক্রমার ফলস্বরূপ। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যা সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সমাজের নানা দিক তুলে ধরার কাজ করে আসছে। বাংলা ভাষার সাময়িকপত্রের শুরুর দিকে, তখন তার ভূমিকা ছিল শুধু সংবাদ প্রচার করা, তবে সময়ের সাথে সাথে তা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাময়িক পত্রের উদ্ভব মূলত ১৭৮০ সালে ইংল্যাণ্ড ঘটে। ইংল্যাণ্ডের

প্রথম আধুনিক সাময়িক পত্র 'The Gentleman's Megazine' ১৭৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পত্রিকা শিল্পের সূচনা করেছিল। কিন্তু বাংলায় এই সাময়িক পত্রের পথচলা শুরু হয় প্রায় একশতাব্দী পর, যখন ১৮৩০ সালের দিকে দেশীয় ভাষায় সাময়িকপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম সাময়িক পত্র হিসাবে পরিচিত ছিল 'সমাচার দিগদর্শন' (১৮১৮) নামক পত্রিকা, যা সেইসময় ব্রিটিশ শাসকরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে প্রধানত সংবাদ ও সাময়িক বিষয়গুলো প্রকাশ পেত এবং তা পুরোপুরি ইংরেজি ভাষায় লিখিত। কিন্তু বাংলায় সাময়িক পত্রের প্রকৃত বিকাশ শুরু হয় সাধারণত ১৮৫৭ এর আশেপাশে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা সাময়িক পত্রের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। বিভিন্ন সাহিত্যিক, সংস্কৃতিবিদ এবং রাজনৈতিকবিদরা তাদের চিন্তা চেতনা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে সাময়িকপত্রের ব্যবহার করা শুরু করেন। 'দেশ' (১৮৭৯), 'প্রবাসী' (১৮৯২), 'মাসিক উদ্যান' (১৯০৩) এসব পত্রিকাও সংস্কৃতিক বিকাশে এবং সমাজের নানা ধরনের সমস্যা সমাধানের সহায়ক হিসাবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সাময়িক পত্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক পত্রিকা সেইসময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলির যথেষ্ট সমর্থন করত এবং তৎকালীন জনগণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নানান অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতো। সেই সময়কার পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নবযুগ' (১৯০৫), 'সার্চলাইট' (১৯০৭), 'প্রত্যাশা' (১৯১১) এবং 'যুগান্তর' (১৯০৬) ইত্যাদি অন্যতম। স্বাধীনতা পরবর্তী সাময়িক পত্রের ভূমিকা এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। ভারতীয় আন্দোলন শেষ হওয়ার পরও নানা ধরনের সমস্যা নিয়ে সাময়িক পত্রে নানান লেখালেখি শুরু হয়। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও সাময়িক পত্রের ইতিহাস একেবারে অব্যাহত। নানান বিষয়ের জন্য সাময়িক পত্র বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে পত্রিকার মূল কাজ হচ্ছে পাঠককে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেদের চিন্তা-চেতনা, নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন এবং সমাজের সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য তৈরি হয়। সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বহু পত্রিকা বিভিন্ন দিক থেকে সমাজের উন্নয়ন, সংস্কৃতির বিকাশ, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জাতীয় ঐক্যের কাজ করে আসছে। এতে প্রতিটি যুগের চিন্তাধারা এবং তৎকালীন সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে।

৩.৪ হিকিজ গেজেট পত্রিকা

আঠারো শতকের শেষভাগে ভারত যখন ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অধীনে ছিল, তখন মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা সাংবাদিকতার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধারা গড়ে ওঠেনি। সেইসময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে এক সংবাদপত্রের প্রকাশিত হয়, যা ছিল ভারতীয় প্রথম সংবাদপত্র, যার নাম ছিল 'হিকিজ বেঙ্গল গেজেট'। এটি ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র এবং ভারতীয় সাংবাদিকতার সূচনার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই প্রেক্ষাপটে ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি জেমস অগাস্টাস হিকি কর্তৃক প্রকাশিত হিকির বেঙ্গল গেজেট শুধু ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রই নয়, বরং ব্রিটিশ প্রশাসনের সমালোচনা ও মত প্রকাশের

স্বাধীনতার অন্যতম প্রাথমিক দৃষ্টান্ত গড়ে তুলেন। এই সংবাদপত্রটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল, যা মূলত কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। এটি ইংরেজি ভাষায় লেখা হলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এতে স্থানীয় ভাষার ব্যবহারেরও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। পত্রিকাটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরা এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

হিকির বেঙ্গল গেজেট বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় তার বিদ্রূপাত্মক ও সাহসী প্রতিবেদনের জন্য। যিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে স্বাধীনতার গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে হিকি সংবাদপত্রের মাধ্যমে তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রকাশ্যে আনতে থাকেন। বিশেষ করে, ওয়ারেন হেস্টিংসের স্ত্রীসহ ব্রিটিশ প্রশাসনের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে এই সংবাদপত্রটি। বিশেষ করে ওয়ারেন হেস্টিংস এবং তাঁর স্ত্রীর প্রতি লেখনী ছিল একেবারে তীব্র। তিনি সরকারী কর্মকর্তাদের আত্মসাৎ করা সম্পদের হিসাব প্রকাশ করতেন, যা সেই সময়ের ব্রিটিশ শাসকদের জন্য এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। ফলে প্রশাসনের বিরাগভাজন হন হিকি এবং তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়। শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত চাপের মুখে ১৭৮১ সালে হিকিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার মুদ্রণযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফলে মাত্র দেড় বছর পরেই সংবাদপত্রটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। যদিও এর আয়ুষ্কাল স্বল্প ছিল, তবে এটি ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করে যায়। হিকির সংবাদপত্র যে শুধুমাত্র যে ইউরোপীয় পাঠকদের মধ্যেই বিস্তার করেছিল, শুধু তা নয় এটি ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এটি প্রথমবারের মতো প্রমাণ করেছিল যে শাসকদের কার্যকলাপের সমালোচনা করা সম্ভব এবং সংবাদপত্রও জনগণের পক্ষে কথা বলতে পারে। যদিও হিকি নিজে ভারতীয় ছিলেন না, তবে তাঁর এই প্রচেষ্টা ভারতীয় সাংবাদিকতার ভিত্তি রচনা করেছিল।

হিকির বেঙ্গল গেজেট ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এটি কেবলমাত্র প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রই নয়, বরং এটি মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের প্রথম উদাহরণ। হিকির প্রচেষ্টা পরবর্তীতে ভারতে সংবাদপত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তার দেখানো পথ ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে পরবর্তীতে বিভিন্ন সংবাদপত্রের উত্থান ঘটে, যা সমাজ ও রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। হিকির গেজেট পত্রিকাটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৩.৫ সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর'। ১৮৩১ সালে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসাবে তার সূত্রপাত ঘটে এবং প্রায় আট বছর পর ১৮৩৯ সালে

এটি দৈনিক সংবাদপত্র রূপে প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র হিসাবে ভারতীয় সংবাদপত্র জগতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে যখন বাংলার বেশিরভাগ সংবাদপত্রই সাপ্তাহিক ভাবে প্রকাশিত হত, তখন প্রায় ১৮৩৯ সালে ঈশ্বরগুপ্ত এই দৈনিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। এটি শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশনরত পত্রিকা ছিল না, বরং এটি সমাজের নানা সমস্যার কথা সকলের সামনে তুলে ধরত। জনগণের মতামত গ্রহণের মাধ্যম হিসাবে পত্রিকাটি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করত।



জেনে রাখা ভালো

১) সমাচার দর্পণ : সমাচার দর্পণ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম ছাপানো সংবাদপত্র, যা ১৮১৮ সালের ২৩ মে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রকাশ করেন উইলিয়াম কেরী, আর সম্পাদক ছিলেন জোশুয়া মার্শম্যান। এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে শুরু হলেও পরবর্তীতে মাসিক আকারেও প্রকাশিত হয়।

এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে দেশ-বিদেশের সংবাদ জানানো। এতে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হতো। বিশেষত ব্রিটিশ শাসন, ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, কৃষকদের দুর্দশা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন আইন সংক্রান্ত বিষয় এতে গুরুত্ব পেত। বাংলার প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে এটি সংবাদ প্রচারের নতুন ধারা তৈরি করে। সমাচার দর্পণ তৎকালীন সমাজের নানা অসঙ্গতি যেমন সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবাদের অবস্থা, নারী শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করত। ফলে এটি বিতর্কের মুখে পড়ে এবং অনেক সময় ব্রিটিশ সরকার ও রক্ষণশীল সমাজের রোষানলে পড়ে। তবে এটি বাংলা সাংবাদিকতার ভিত্তি স্থাপন করে এবং পরবর্তী সংবাদপত্রগুলোর পথ প্রশস্ত করে। দীর্ঘদিন প্রকাশিত থাকার পর ১৮৩৬ সালে এটি বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু এর অবদান বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

সংবাদ প্রভাকরের ভাষারীতি ছিল অভিনব। আমরা জানি উনিশ শতকের শুরুর দিকে বাংলার সংবাদপত্রের ভাষা ছিল বেশ জটিল এবং সংস্কৃতঘেঁষা। কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকর' অনেক সহজ সরল ভাষায় সংবাদ পরিবেশন করত। তার ভাষা ছিল অত্যন্ত সাবলীল, যা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত এবং পাঠকের অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। এই ভাষাশৈলী পরবর্তী বাংলা সংবাদপত্রের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল যা বাংলা সাংবাদিকতার নতুন ভাষারীতি গঠনে সাহায্য করেছিল। সংবাদ প্রভাকর যে শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশনেই থেমে রয়েছে তেমন নয়, এটি বাংলা সাহিত্যের রীতি নীতি এবং তাঁর অগ্রগতিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ঈশ্বরগুপ্ত এই পত্রিকার মাধ্যমে বিশেষ সাহিত্যচর্চা ও নানা ধরনের কবিতা রচনায় এক নতুন দিক উন্মোচন করেছিলেন। তিনি তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কবিতার মাধ্যমে সেইসময়কার সমাজের দুর্নীতি ও অন্যায়ের কথা তুলে ধরেন। তাঁর নানাধরনের লেখা ও সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে এক

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং বাংলা সাহিত্যকে নতুন মাত্রা দান করে।

উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ছিল পরিবর্তনের দোরগোড়ায়। ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার তথা আধুনিক চিন্তাধারার বিকাশ এবং নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনার উত্থান সংবাদপত্রের গুরুত্ব অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। সংবাদ প্রভাকর এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংবাদ পেশ করত এবং পাঠকদের সমাজের প্রতি অনেকটা দায়িত্বশীল করে তুলত। ফলে এটি একটি সংবাদপত্র হিসাবেই সীমিত থাকেনি, সমাজের এক বিশ্বস্ত দলিল হয়ে উঠেছিল এবং সমাজের এক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যম হিসাবেও কাজ করেছিল। পরবর্তী বাংলা দৈনিক পত্রিকার জন্য সংবাদ প্রভাকর এক পূর্ণরূপ দলিল হয়ে উঠে। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে সংবাদ পত্রের অবদান অপরিসীম। এটি বাংলা ভাষার সংবাদপত্রকে শুধু দৈনিক রূপই দেয়নি, বরং সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের ধারণা স্থাপন করেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় সংবাদ প্রভাকর এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল, যা পরবর্তীতে বাংলা সাংবাদিকতাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে।

৩.৬ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

বাংলা সাময়িক পত্রের জগতে এক উল্লেখযোগ্য নাম 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির নবজাগরণের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা এই পত্রিকাটি। ১৮৪৩ সালের ৬ই অক্টোবর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'ব্রাহ্ম সমাজ যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত হয় এবং যে রূপেতে সর্ব্বোতকৃষ্ট পরম ধর্ম্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হয়, তাহার সাধন।' সভা প্রতিষ্ঠা হওয়ার ঠিক চার বছর পর অর্থাৎ ১৮৪৩ সালের ১৬ই আগষ্ট সমাজের মুখপাত্র হিসাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে পূর্বে পত্রিকাটি মূলত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্রিক ছিল। তবে ক্রমে এর আকার বিস্তৃত হয়ে সমাজ-সংস্কার, বিজ্ঞানচর্চা, সাহিত্য এবং শিক্ষা ও ইতিহাসের আলোচনায় প্রসারিত হয়। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন নতুন ধরনের আবিষ্কার এবং বিজ্ঞানের নানান বিষয়গুলিকে তিনি সহজ সরল বাংলায় প্রকাশ করতে সচেষ্ট হন। তার ফলস্বরূপ, বাংলার নবজাগরণে এই পত্রিকার ভূমিকা অপরিসীম।

এই পত্রিকার আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এটি নারীশিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক বিষয়ক আলোচনা করে। বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা, নারীশিক্ষার প্রসার, নানান সামাজিক অনাচার ইত্যাদি বিষয়ে নানা ধরনের লেখালেখি হয় এই পত্রিকায়। একদিকে বলা যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রতি এই পত্রিকার তীব্র সমর্থন ছিল। পত্রিকাটির অন্যতম বিশেষত্ব ছিল বাংলা ভাষার প্রচলন ও পরিশীলনের প্রচেষ্টা তাই তখনও বাংলা গদ্য ভাষা ছিল অপরিণত ও কাঠিন্যে ভরা। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সহজ ও সরল বোধগম্য বাংলা গদ্যের প্রচলনে ভূমিকা রাখে, যা পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' শুধুমাত্র ধর্মীয় বা সামাজিক বিষয়েই থেমে থাকেনি, বরং তা

বাংলা সাহিত্যের নানান দিক উন্মোচনে এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিত্বদের লেখনীতে এই পত্রিকার গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার প্রভাব বাংলা সাহিত্য ও সমাজে সুদূরপ্রসারী ছিল। এটি একদিকে যেমন নবজাগরণের ধারাকে মজবুত করেছিল, তেমনই বাংলা গদ্যের বিবর্তনে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল। ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ প্রচারের পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৩.৭ বঙ্গদর্শন পত্রিকা

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আরও একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হলো 'বঙ্গদর্শন'। পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক স্বনামধন্য জায়গা জুড়ে রয়েছে। ১৮৭২ সালে পত্রিকাটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় গদ্যের সাহিত্য সমালোচনা, উৎকর্ষ সাধন, সমকালীন সমাজব্যবস্থার মূল্যায়ন এবং নতুন সাহিত্যধারার প্রচার এই পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি এমন এক পত্রিকা যা বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য পত্রিকা এবং বাংলা সাহিত্যে এটি এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল।

প্রথমদিকে, বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সম্পাদনার কাজে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বাংলা গদ্যের নতুন রীতি এবং শৈলীকে এক অনন্য মাত্রায় পৌঁছে দেন। এর আগে বাংলা গদ্যের ভাষা মূলত ছিল কঠিন। বঙ্গদর্শনের হাত ধরে বাংলা গদ্য সহজ, সরল, সাবলীল ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বঙ্গদর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর সাহিত্য সমালোচনার ধারা। পত্রিকায় সমকালীন লেখকদের বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন, সমালোচনা ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে, যা বাংলা সাহিত্যচর্চাকে প্রভাবান্বিত করে। সমাজ ও রাজনীতির নানা দিক নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলিও হয়ে ওঠে জনপ্রিয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রক্ষণশীল সমাজচিন্তার প্রকাশ পত্রিকাটির নানান লেখায় পাওয়া যায়।

এই পত্রিকায় এক বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যার নাম 'বাঙালির চরিত্র' যা বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষের আচরণ নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করে। বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। বঙ্গদর্শনের পাতায় প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা', 'দুর্গেশনন্দিনী'ও 'আনন্দমঠ'-এর মতো সাহিত্যকর্ম, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছে। ১৮৭৬ সালে বঙ্গদর্শনের প্রথম পর্যায়ের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়, তবে ১৮৭৯ সালে নবকুমার বিদ্যারত্নের সম্পাদনায় পত্রিকাটি চালু হয় এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় লেখা প্রকাশিত করতে থাকে। পরবর্তী সময়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসুর মতো ব্যক্তিত্ব এই পত্রিকায় লেখালেখি করেন, যা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। 'বঙ্গদর্শন' শুধুমাত্র একটি সাহিত্য পত্রিকা

ছিল না, বরং তা ছিল বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের প্রতীক। বাংলা গদ্যের পরিশীলন, সাহিত্য সমালোচনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন, বাঙালির আত্মপরিচয় নির্মাণ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা গঠনে এই পত্রিকার ভূমিকা অপরিসীম। বাংলা গদ্যের বিবর্তন ও সাহিত্য আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে 'বঙ্গদর্শন' চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৩.৮ প্রবাসী পত্রিকা

বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারায় 'প্রবাসী' পত্রিকা এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। ১৯০১ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন এবং এর থেকেই এই মাসিক পত্রিকাটির যাত্রা শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এটি ছিল বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য পত্রিকা, যা সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাসচর্চায় গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথম থেকেই 'প্রবাসী' পত্রিকাটি ছিল উচ্চমানের সাহিত্য ও চিন্তাধারার প্রতিফলন স্বরূপ। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্যিক যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো অন্যান্য সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদেরাও এই পত্রিকায় নিয়মিত লেখা পাঠাতেন। বাংলা গদ্যকে আরও উন্নতমানের এবং পরিমার্জিত করার ক্ষেত্রে 'প্রবাসী' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কালজয়ী উপন্যাস 'গোরা', 'ঘরে বাইরে'। এছাড়াও শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা, প্রেমচন্দের গল্প এবং অন্যান্য সমসাময়িক লেখকদের সাহিত্যকর্ম এতে স্থান পেয়েছে। 'প্রবাসী' শুধু সাহিত্য পত্রিকা ছিল না, বরং তা ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ, অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে এই পত্রিকায় বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে এই পত্রিকা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' শুধু সাহিত্য ও রাজনীতির পত্রিকা হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি পত্রিকাটিতে বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি- প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ফলে এটি শিক্ষিত বাঙালির কাছে এক অনিবার্য পাঠ্য হয়ে ওঠে। 'প্রবাসী'পত্রিকায় নারীজাগরণ ও নারীদের অধিকার নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে লেখালেখি করা হতো। বেগম রোকেয়া, সরোজিনী নাইডুর মতো লেখিকারাও এতে লেখা প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে 'প্রবাসী' বাংলা সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা হিসেবে টিকে ছিল। তবে কালের পরিবর্তনে এর জনপ্রিয়তা কমতে থাকে এবং ১৯৫৪ সালে এটি বন্ধ হয়ে যায়। তবুও, বাংলা সাহিত্য ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে এই পত্রিকার অবদান আজও তুলনাহীন। এটি কেবল একটি সাহিত্যপত্রিকা ছিল না, বরং এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, যা বাঙালি জাতিসত্তার গঠনে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। 'প্রবাসী পত্রিকা' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৩.৯ সবুজপত্র পত্রিকা

'সবুজপত্র' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য পত্রিকা, যা বাংলা কাব্য ও সাহিত্য আন্দোলনের নতুন দিগ উন্মোচন করেছিল। ১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরী এই পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। এটি মূলত মাসিক সাহিত্যপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, খুব দ্রুত তা বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে ওঠে। সবুজপত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল 'পরিবর্তিত ভাষাচর্চা'ও 'চলিত



জেনে রাখা ভালো

কল্লোল পত্রিকা : গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, মনীন্দ্রলাল বসু, এবং সুনীতি দেবী তারা চার বন্ধু সহযোগে ফোর আর্টস ক্লাব নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। ১৯২১ সালের ৪ঠা জুন ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেকের এক একটি গল্প নিয়ে 'ঝড়ের দোলা' নামে একটি গল্পের বইও প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল পত্রিকা' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত এই পত্রিকা তৎকালীন বাংলা সাহিত্যকে এক নতুন দিশা দেখায়। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে যখন বাংলার সাহিত্যজগতে রবীন্দ্র-প্রভাব প্রবল ছিল, তখন কিছু তরুণ সাহিত্যিক বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে নতুন ধরনের সাহিত্যচর্চার জন্য একত্রিত হন। তাদের হাত ধরেই জন্ম নেয় "কল্লোল যুগ", যা বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ, তবে মূল চালিকা শক্তি ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, কাজী নজরুল ইসলাম, সতীশচন্দ্র সরকার, প্রদ্যোৎকুমার ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, জীবনানন্দ দাশ, মনোজ বসু প্রমুখ তরুণ সাহিত্যিক। কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্য ছিল সমাজের রক্ষণশীল অংশের কাছে আপত্তিকর, ফলে এটি নানা বিতর্কের মুখোমুখি হয়। বিশেষত নারী-স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নগরজীবনের বাস্তবতা তুলে ধরার কারণে তৎকালীন সমাজ এটিকে বিদ্রোহী সাহিত্য বলে চিহ্নিত করে। কল্লোল যুগের সাহিত্যের প্রভাব আজও বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, বিশেষত নাগরিক জীবনের বাস্তবচিত্র উপস্থাপনে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটায়।

গদ্যের' প্রচলন। সে সময় বাংলা সাহিত্যে সাধু ভাষার প্রচলন ছিল খুবই জোরদার, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষার গুরুত্ব অনুভব করেন এবং এই পত্রিকার মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ফলে এই পত্রিকাই বাংলা চলিত গদ্যের অন্যতম ভিত গড়ে তোলে। এই পত্রিকায়

প্রথমবারের মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চলিত ভাষায় কবিতা ও গদ্য প্রকাশ শুরু করেন। 'সবুজপত্র'ই ছিল রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের প্রথম প্রকাশের স্থল, যা বাংলা কবিতার আধুনিকতার ভিত্তি স্থাপন করে। রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি অন্যান্য সাহিত্যিকেরাও যেমন কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেখকরাও এতে নিয়মিত লেখা প্রকাশ করতেন।

'সবুজপত্র' শুধু ভাষা পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্য ও মানব মনের চিন্তাধারার প্রতীক হিসাবেও নতুন যুগের সূচনা করেছিল। এই পত্রিকা বাংলা কবিতায় এক নতুন ধারার প্রবর্তন করে, যেখানে রোমান্টিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং আধুনিকতারও প্রকাশ ঘটে। বিশেষ করে, এখানে প্রকাশিত কবিতা ও গদ্যে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, ব্যক্তির অনুভূতি এবং নতুন প্রগতিশীল চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। ১৯২০ সালে এই পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার আগেই এটি বাংলা সাহিত্যের ভাষা ও কাঠামোশৈলী বদলে দিয়েছিল। বাংলা চলিত গদ্যের বিকাশ, আধুনিক কবিতার সূচনা এবং সাহিত্য সমালোচনার নতুন পথ দেখানো প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে সবুজপত্রের অবদান বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৩.১০ গ্রামবার্তা প্রবেশিকা পত্রিকা

'গ্রামবার্তা প্রবেশিকা' উনিশ শতকের বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র, যা সমাজসংস্কার ও কৃষিভিত্তিক জাগরণের ক্ষেত্রে এক অপরিসীম ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮৬৩ সালে কৃষ্ণদাস পাল এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং ধীরে ধীরে পত্রিকাটির যাত্রা শুরু হয়। এটি ছিল একাধারে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার মাধ্যম, যা বিশেষ করে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের সমস্যা এবং জীবনযাত্রার উন্নয়ন তুলে ধরার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময়ের সংবাদপত্রগুলোর অধিকাংশই নগরকেন্দ্রিক ছিল, কিন্তু পত্রিকাটি ছিল গ্রামের মানুষের সোচ্চার কণ্ঠস্বরের প্রতীক। কৃষকদের সমস্যা, সামাজিক অন্যায়, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, নারীদের অধিকার ও ব্রিটিশ শাসনের শোষণের মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে পত্রিকাটিতে নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হতো। এটি ছিল বাংলার প্রথম সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে একটি, যা গ্রাম ও শহরের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছিল।

'গ্রামবার্তা প্রবেশিকা' পত্রিকাটি বাংলা ভাষার প্রচলন ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কৃষ্ণদাস পাল সহজ সরল বাংলা গদ্য ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে সংবাদ পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। এটি কেবল সমাজসংস্কারমূলক পত্রিকা ছিল না, বরং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল। 'গ্রামবার্তা প্রবেশিকা' বাংলার স্বদেশি আন্দোলন এবং নানা ধরনের সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। এই পত্রিকার লেখাগুলি তৎকালীন প্রশাসনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল, যা ব্রিটিশ শাসকদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। ফলে বিভিন্ন সময় সরকার পত্রিকাটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই সংবাদপত্রের প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে এটি বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন হয়ে রয়েছে। এটি শুধু একটি সংবাদপত্র ছিল না, বরং এক সামাজিক আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি, যা বাংলার গ্রামীণ সমাজের এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

৩.১১ বামাবোধিনী পত্রিকা

উনিশ শতকের বাংলার নারীশিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'। উমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৬৩ সালে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকার মূল লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ অনুসরণ করে নারীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, নারীর সামাজিক অবস্থান এবং নারীমুক্তির প্রসার। সেই সময়ে নারীরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন এবং সমাজে তাদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত দুর্বল। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' সেই নারীদের শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয় এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সরব হয়ে উঠে। এই পত্রিকায় নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বৈধব্য, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার ও গৃহস্থালির নানা বিষয়ে আলোচনা করা হতো।

ভাষার দিক থেকে এটি ছিল সহজ ও প্রাঞ্জল, যাতে সাধারণ নারী পাঠকেরা সহজেই তা বুঝতে পারেন। এটি ছিল এমন এক যুগে প্রকাশিত হয়, যখন নারীশিক্ষা নিয়ে সমাজে প্রবল বিরোধিতা চলছিল। কিন্তু 'বামাবোধিনী' সাহস এবং তীব্র প্রতিবাদের সঙ্গে নারীদের অধিকার নিয়ে সরব হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে শিক্ষিত নারীদের একটি পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করতে সক্ষম হয়। এই পত্রিকা বাংলার নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পরবর্তী সময়ে নারীশিক্ষা ও নারীশক্তিকরণের পথে বড় অবদান রাখে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারী-অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধিতে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' ছিল পথিকৃৎ। এটি শুধু একটি সাহিত্য পত্রিকা নয়, বরং বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনের এক মাইলফলক হয়ে থাকবে।

৩.১২ কৃত্তিবাস পত্রিকা

বাংলা কবিতার ইতিহাসে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা এক যুগান্তকারী প্রকাশনা, যা বাংলা আধুনিক কবিতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ১৯৫৩ সালে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে এই পত্রিকার পথচলা শুরু হয়। এটি ছিল এমন একটি সময়, যখন বাংলা কবিতার জগতে নতুন চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তখনও প্রবল, কিন্তু তরুণ কবিরা চেয়েছিলেন নতুন এক ভাষা, নতুন এক আঙ্গিক। সেই পরিবর্তনের অন্যতম মঞ্চ হয়ে ওঠে 'কৃত্তিবাস'। এই পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ছিল তরুণ কবিদের জন্য একটি স্বাধীন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, যেখানে তারা প্রচলিত ধারার বাইরে নতুন কবিতা রচনা ও প্রকাশ করতে পারেন। আধুনিক জীবনবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নাগরিক অভিজ্ঞতা, অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি-এসবের প্রতিফলন ঘটতে শুরু করে 'কৃত্তিবাস'-এর পাতায়। এটি ছিল শুধুমাত্র একটি কবিতা পত্রিকা নয়, বরং বাংলা সাহিত্যে এক নতুন আন্দোলনের সূচনা।

'কৃত্তিবাস'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন অগ্রগণ্য কবি ও লেখক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও এখানে লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, অরুণ মিত্র, সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরী, উত্তম দাশ-এর মতো বিশিষ্ট কবিরা। তাঁরা কবিতার প্রচলিত কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে নতুন এক ভাষা ও শৈলী তৈরি করেন, যা বাংলা কবিতাকে নতুন মাত্রা দেয়। বিশেষ করে, 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা বিট

আন্দোলনের কবিদের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়। আমেরিকার বিট জেনারেশনের কবিদের মতোই এই পত্রিকার লেখকরা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ, আত্মঅনুসন্ধান, বোহেমিয়ান জীবনধারা, প্রেম ও নগরজীবনের জটিলতা নিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেন। ফলে এটি কেবল কবিতার পত্রিকা নয়, একটি সংস্কৃতি, একটি সাহিত্য আন্দোলনের রূপ নেয়। 'কৃত্তিবাস' কেবল ষাটের দশকের কবিদের জন্যই নয়, পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের জন্যও অনুপ্রেরণার জায়গা হয়ে ওঠে। এখনো এই পত্রিকার গুরুত্ব অটুট, এবং এটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে বিবেচিত হয়। আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে 'কৃত্তিবাস'এক অবিস্মরণীয় নাম, যা বাংলা কবিতার বিকাশে চিরকাল প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে।

৩.১৩ অধ্যায় সংক্ষেপ

সাময়িক পত্র ছিল উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য বিকাশের অন্যতম অবলম্বন। মূলত তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মাতৃসুলভ লালনে বর্ধিত করে তুলেছিল বাংলার সাময়িক পত্রগুলো। আসলে সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি সৃজনশীল সাহিত্য পরিমণ্ডল নির্মাণের উদ্দেশ্যেই এই পত্রগুলোর সার্থক আবির্ভাব।



৩.১৪ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

১। সাময়িক পত্র উদ্ভবের ইতিহাস।

২। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের নাম সহ পত্রের সম্পাদকের নাম।

৩। সাময়িক পত্রের প্রকাশ সাল।

৪। সাময়িকপত্রগুলি প্রকাশের উদ্দেশ্য ও অবদান কী?



৩.১৫ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। 'হিকিজ বেঙ্গল গেজেট' হল ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র এবং ভারতীয় সাংবাদিকতার সূচনার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ...হিকির বেঙ্গল গেজেট বিশেষভাবে আলোচিত হয় তার বিদ্রূপাত্মক ও সাহসী প্রতিবেদনের জন্য। ...তবে তাঁর এই প্রচেষ্টা ভারতীয় সাংবাদিকতার ভিত্তি রচনা করেছিল। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য; ৩.৪)

২। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারায় 'প্রবাসী' পত্রিকা এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। ...এই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কালজয়ী উপন্যাস 'গোরা', 'ঘরে বাইরে'। ...রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' শুধু সাহিত্য ও রাজনীতির পত্রিকা হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি পত্রিকাটিতে বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব,

অর্থনীতি- প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য; ৩.৮)



৩.১৬ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-০৯
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (২০১৭); প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-০৯, আগস্ট
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা, কলকাতা, তুলসী প্রকাশন
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (২০১৬-২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৭৩
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ); বাংলা সাময়িক-পত্র; কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
- হক, শামসুল (১৯৮৪); বাংলা সামিয়ক-পত্র; কলকাতা : পুস্তক বিপণি



৩.১৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা সাহিত্যের সাময়িকপত্রের ইতিহাস সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২। গ্রামবার্তা প্রবেশিকা সাময়িকপত্রের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৩। সবুজপত্র পত্রিকার উদ্ভব কিভাবে হয় তা আলোচনা করুন।

৪। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অবদান আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ৪ : আধুনিক বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ-১

বিন্যাস ক্রম

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৪.২ পরিচিতি
৪.৩ উইলিয়াম কেরী
৪.৪ মৃত্যুয় বিদ্যালঙ্কার
৪.৫ রামমোহন রায়
৪.৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
৪.৭ অক্ষয়কুমার দত্ত
৪.৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪.৯ স্বামী বিবেকানন্দ
৪.১০ অধ্যায় সংক্ষেপ
৪.১১ অধ্যায়টি পাঠ করে কী শিখলাম
৪.১২ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৪.১৩ অতিরিক্ত পঠন
৪.১৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- বাংলা গদ্যের বিকাশে শ্রীরামপুর মিশনারী ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিখ্যাত ব্যক্তিদের অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বঙ্গীয় গদ্য রচয়িতাদের অবদান সম্পর্কে অবগত হবেন।
- বাংলা গদ্যের আধুনিক গতি প্রকৃতি বিষয় সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।

৪.২ পরিচিতি

আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ সূত্র হল বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ। মনে করা হয় কোচবিহার রাজের ঐতিহাসিক পত্র থেকে বাংলা গদ্যের সূত্রপাত। সে যাই হোক গদ্যের আর্বিভাবের পিছনে ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকারের কর্ম উদ্যোগে প্রবণতা বিশেষ ভাবে কাজ করেছিল। ফলত তৎকালীন বাংলা গদ্যে উনিশ শতকীয় রাজন্য শাসনের নিদর্শনের পাশাপাশি তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতে দেখা যায়।

৪.৩ উইলিয়াম কেরী

উইলিয়াম কেরী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য স্থান অধিকার করেন। একজন বিদেশী হয়েও তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে যেভাবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে কাজ করেছিলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত দুইটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা' বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

কেরীর গদ্যচর্চার প্রেক্ষাপট

১৮০০ সালে উইলিয়াম কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সে সময় বাংলা ছিল মূলত পদ্যভিত্তিক সাহিত্যের আধার। গদ্য ছিল বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত এবং সীমিত কিছু ধর্মীয় অনুবাদ ও আলেখ্য চিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেরীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলা গদ্যকে শিক্ষা, বোধ ও যুক্তির বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

'কথোপকথন' গ্রন্থের বিশিষ্টতা

সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'কথোপকথন'-এ সমকালীন বাঙালি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির জীবনযাত্রা, পারিবারিক অনুষ্ঠান, জমিদার-রাইয়তের সম্পর্ক, মহাজন ও খাতকের কথোপকথন, স্ত্রীসমাজের অবস্থা-সব কিছুই অত্যন্ত বাস্তবধর্মীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এমন বাস্তব ছবি কেবল কেরীর এই গ্রন্থেই পাওয়া যায়, যা দীনবন্ধু মিত্র ব্যতীত পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর কোনো লেখক তুলে ধরতে পারেননি।

ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য

ক) কেরী ভাষা নিয়ে দ্বন্দ্বে ছিলেন-আলাপী ভাষা না পণ্ডিতী ভাষা হবে আদর্শ, এ নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন।

খ) ভাষা চলিত নয়, তবে চলিত ও সাধু রীতির সংমিশ্রণ রয়েছে। যেমন: 'পারিব না, 'খাওয়াতে হবে', 'বেচিতে হবে' ইত্যাদি।

গ) প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারে ভাষা জীবন্ত হয়েছে। যেমন: 'মুই ফুকারদি তুই ঘুমাইছিস', 'আঙ্গ চুল ফুলিয়া কলাগাছ' ইত্যাদি।

ঘ) সংলাপ হালকা হলেও গদ্যের বাস্তবতা স্পষ্ট।

ঙ) কাঠামো সাধু রীতির হলেও ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম গাঙ্গেয় উপভাষার মতো সংকুচিত।

তাৎপর্য

ক) বাঙালি সমাজ ও পরিবারের তথ্য প্রথমবার গদ্যে প্রকাশ।

খ) বিষয় নির্বাচনের অভিনবত্ব।

গ) বাংলা গদ্যকে যুক্তি-চিন্তার বাহন হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।

ঘ) সমকালীন সমাজের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঙ) প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ এই গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

চ) সুকুমার সেন এই গ্রন্থকে বিদেশী শাসকদের সামাজিক পরিস্থিতি বোঝানোর প্রচেষ্টা বলে মনে করেছেন।

'ইতিহাসমালা' গ্রন্থের বিশিষ্টতা

১৮১২ সালে প্রকাশিত কেরীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ইতিহাসমালা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম গল্প সংকলন হিসেবে পরিচিত। যদিও এটি মৌলিক গল্প নয়, তবুও গল্পের আঙ্গিক ও রচনাশৈলীর দিক থেকে এর তাৎপর্য অপরিসীম।

উৎস ও বিষয়বস্তু

ক) গল্পগুলি অনুবাদ নির্ভর, সংগৃহীত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উপকথা থেকে।

খ) উৎস: বেতাল পঞ্চবিংশতি, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, ঈশপের গল্প, ফারসি ও হিন্দুস্থানী উপাখ্যান ইত্যাদি।

গ) ঐতিহাসিক চরিত্র যেমন— প্রতাপাদিত্য, আকবর-বীরবল, রূপ-সনাতন ইত্যাদিও গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে।

ঘ) গল্পগুলিতে আছে কাম, লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা, নৈতিকতা, সামাজিক অসঙ্গতি, দান-ধ্যান ও মানবীয় ত্রুটিবিচ্যুতি।

ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য

ক) ভাষা কোথাও কোথাও সংস্কৃত-গন্ধী (যেমন 'কিমর্থে', 'ধনোপার্জন)।

খ) অধিকাংশ ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।

গ) গদ্যের অন্বয় বা সিনট্যাক্স বিশ্লেষণ যোগ্য ও সুসংবদ্ধ।

তাৎপর্য

ক) ছোটগল্পের পূর্বাভাস এই গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

খ) বাঙালি লেখকদের অবদান সন্দেহাতীত।

গ) লোকজ উপাদানের ব্যবহার এই গ্রন্থকে ঐতিহ্যসম্পন্ন করে তোলে।

ঘ) বাংলা সাহিত্যের প্রথম আখ্যান সংকলন হিসেবেই এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ঙ) 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' বাংলা গদ্য রচনায় কতটা অগ্রসর হয়েছিল তার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই গ্রন্থ।

কৃতিত্ব ও মূল্যায়ন

উইলিয়াম কেরীর মতো একজন বিদেশী যে নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও ভালোবাসা নিয়ে বাংলা গদ্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। 'কথোপকথন' এবং 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থদ্বয় বাংলা গদ্যের মৌলিক রূপ গঠনে সহায়তা করেছে। যদিও কেরীর অনুবাদ ও সম্পাদনার নেপথ্যে বাংলার পণ্ডিতগণ যেমন— রামরাম বসু, তাঁরাও বিশেষ ভাবে অবদান রেখেছেন। ফাদার দ্যতিয়েন যেমন বলেছেন— "সংকলনটি কেরীর রচনা হলেও, বস্তুত রামরাম বসুই এটিকে ফিরিংগি ভাব থেকে রক্ষা করে এর বাঙালি বেশবাস দিয়েছিলেন।" উইলিয়াম কেরী বাংলা গদ্য সাহিত্যের পথিকৃৎ। ভাষারীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সমাজ-বাস্তবতার সংযোজন, এবং গল্পের মাধ্যমে নৈতিক উপদেশ প্রদান-এই সব কিছু মিলিয়ে তাঁর কীর্তি বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা' বাংলা গদ্যের বিকাশে ঐতিহাসিক ভিত্তি স্থাপন করে গেছে।

৪.৪ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২—১৮১৯)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ-পর্বে বাংলা গদ্যসাহিত্যের যে নবজাগরণ সূচিত হয়, তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারিগর ছিলেন পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি শুধু কলেজের একজন বিদ্বান শিক্ষক ছিলেন না, বরং বাংলা গদ্য রচনায় এক নবরূপের প্রবর্তক হিসেবেই অধিক চিহ্নিত হন। তাঁর রচনার ভাষাশৈলী, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং সময়ের চেয়ে অগ্রসর মনোভঙ্গি তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অসামান্য স্থান প্রদান করে।

জন্ম ও শিক্ষাজীবন

আনুমানিক ১৭৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দে রাঢ়ী শ্রেণির চট্টোপাধ্যায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পরিবারে মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম হয়। জন্মস্থান নিয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও ধারণা করা হয় তিনি মেদিনীপুর জেলায় (মতান্তরে উড়িষ্যার ভদ্রক, যা তখন মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রচর্চার মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে তিনি কলকাতায় এসে একটি চতুষ্পাঠী খুলে পাণ্ডিত্য বিস্তার করেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কর্মজীবন

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮০০ খ্রি.) সময় তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮০১ সালে মাসিক ২০০ টাকা বেতনে তিনি উইলিয়াম কেরির অধীনে কলেজের বাংলার প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এখানেই তিনি বাংলা গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং মোট পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলি হলো—

ক) বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)

খ) হিতোপদেশ (১৮০৮)

গ) রাজাবলি (১৮০৮)

ঘ) প্রবোধচন্দ্রিকা (রচনা ১৮১৩, মুদ্রণ ১৮৩৩)

ঙ) বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭, ছদ্মনামে প্রকাশিত)

ভাষাশিল্পে অবদান

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভাষাশৈলী বাংলা গদ্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও প্রথম দিকের রচনায় তাঁর ভাষায় সংস্কৃত নির্ভর জড়তা এবং কৃত্রিমতা লক্ষ্য করা যায়, পরবর্তীকালে তা অনেকটাই লঘু হয়ে যায় এবং একটি স্বচ্ছন্দ ও প্রাঞ্জল গদ্যরীতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষভাবে 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-তে যে গদ্যভঙ্গি দেখা যায়, তা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাধু ভাষার গঠনরীতির পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় প্রথমদিকেই সাধুভাষাকে কাঠামোবদ্ধ রূপে ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করেন এবং একইসঙ্গে গ্রাম্য চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে ভাষাকে বহুমাত্রিক করে তোলেন।

ভাষার বৈচিত্র্য ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য

তাঁর গদ্যরীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নীচে তুলে ধরা হলো—

- সংস্কৃত নির্ভর গুরুগম্ভীর ভাষাবন্ধ : প্রথম পর্বের রচনাগুলিতে সংস্কৃত পদপ্রয়োগ ও জটিল বাক্যরচনার প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন 'কোকিলকুলকলালাপ...' জাতীয় বাক্য

প্রবোধচন্দ্রিকা দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' অনুবাদের সময় লেখা হয়, যা হাস্যকর ও দুরূহ বলে সমালোচিত হয়েছে।

- পরিচ্ছন্ন সাধু গদ্যরীতি : পরবর্তী রচনায় তিনি স্পষ্ট, প্রাঞ্জল এবং মার্জিত সাধু গদ্য প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন, যা বিদ্যাসাগরের পূর্বাভাস দেয়।
- চলিত ও গ্রাম্য ভাষার সংমিশ্রণ : তিনি সাধুভাষার পাশাপাশি সহজ চলিত ভাষাও সাহসের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। বাস্তব জীবন ঘনিষ্ঠ এবং জীবনানুগ ভাষার প্রয়োগ তাঁর লেখাকে প্রাণবন্ত করেছে। যেমন— "মোরা চাষ করিব, ফসল পাবো; রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো..." (প্রবোধচন্দ্রিকা)
- নাটকীয়তা ও প্রাণবন্ত শৈলী : তাঁর গদ্যে নাটকীয়তার ছাপ স্পষ্ট। ভাষা দিয়ে চরিত্র, পরিস্থিতি ও আবেগকে জীবন্ত করে তোলার দক্ষতা তাঁর লেখায় অনুপম ভাবে ফুটে ওঠে।

ঐতিহাসিক মূল্যায়ন ও প্রভাব

যদিও মৃত্যুঞ্জয়ের কীর্তি পরবর্তী কালে রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের বিশাল প্রতিভার আড়ালে কিছুটা ঢাকা পড়ে যায়, তবুও তিনি বাংলা গদ্যের সূচনাপর্বে একজন অগ্রণী শিল্পী হিসেবে স্বীকৃত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেন— "তিনি সচেতন শিল্পীমন ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ লইয়া গদ্য নির্মিতির ভিত্তি রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন।" ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তিনি কেবল একজন পণ্ডিত ছিলেন না, তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ও ভাষাশৈলী সমকালীন সাহেব, পণ্ডিত ও মুনশিদের মধ্যেও এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগসূত্র। তিনিই প্রথম ভাষাকে বিষয় ও উদ্দেশ্যের উপযোগী করে তোলার সচেতন প্রয়াস করেন। তাঁর সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বহুবিধ ভাষারীতি প্রয়োগ এবং জীবনঘনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা গদ্যের পরিণত রূপে রূপান্তরের এক পূর্বসূরি অধ্যায় তৈরি করে। সাহিত্যিক ভাবে মৃত্যুঞ্জয় এক ব্যতিক্রমধর্মী পুরোধা ব্যক্তিত্ব, যাঁর অবদান বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সদ্যরীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৪.৫ রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

উনিশ শতকের রেনেসাঁর যুগে বাংলা গদ্য সাহিত্যের পথপ্রদর্শক রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। তিনি ছিলেন আধুনিক বাংলাদেশের নবজাগরণের অগ্রপথিক। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মতো বাংলা গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে রামমোহন গদ্য লেখা শুরু করেননি। তাছাড়া তিনি শুধু গদ্য লেখকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের আধুনিক চিন্তাধারার প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের

নির্মাণ কর্তা বলিয়া আমরা জানি। কি রাজনীতি কি সমাজনীতি, এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই।"

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩) এক প্রজ্ঞাবান পথপ্রদর্শক, যাঁর মাধ্যমে উনিশ শতকের বাংলা রেনেসাঁ তথা নবজাগরণের সূচনা ঘটে। তিনি শুধু সমাজ সংস্কারকই নন, ছিলেন একাধারে চিন্তাবিদ, ধর্মতাত্ত্বিক, ভাষাবিজ্ঞানী এবং বাংলা গদ্যের প্রাথমিক রূপকার। তাঁর সাহিত্যচর্চা, ভাষাচিন্তা ও সমাজ ভাবনা পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তাই তাঁকে বাংলার 'আধুনিকতার জনক' বললে অত্যুক্তি হয় না।

জীবন ও শিক্ষাজীবন

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে রামমোহনের জন্ম। পিতা রামকান্ত রায় ছিলেন একজন ঐতিহ্যবাহী কায়স্থ ব্রাহ্মণ, যাঁর অভিজাত পারিবারিক পরিবেশ রামমোহনের ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তিনি ছোটবেলা থেকেই ফারসি ও আরবি ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। পরে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষাও রপ্ত করেন। গুরু হরিহরানন্দ ও তীর্থস্বামীর কাছে বেদ, উপনিষদ ও তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দর্শনের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠে তাঁর চিন্তাধারার ভিত্তি। মাত্র ষোলো বছর বয়সে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে একটি পুস্তক রচনা করে তিনি তাঁর চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী মনোভাবের পরিচয় দেন। পরবর্তীতে সমাজে প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কলম ধরেন। তাঁর বিবাহ হয় ১৭৮৩ সালে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন নয়, তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন বৃহত্তর সমাজচিন্তায়।

সাহিত্যচর্চা ও গদ্যের সূচনা

রামমোহনের সাহিত্যচর্চা কোনো কাব্যিক অনুপ্রেরণা জনিত ছিল না, বরং সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন থেকেই তাঁর গদ্যরচনার সূচনা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গদ্য চর্চা চলা কালেও রামমোহনের গদ্য তার থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর রচনায় ছিল যুক্তির দৃঢ়তা, সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তার স্পষ্টতা এবং তর্কাত্মক ব্যাখ্যা শৈলী। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে তিনি প্রায় ত্রিশটিরও বেশি বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে বহু রচনাই ধর্ম, সমাজ ও নৈতিকতা বিষয়ক। এসব রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করা এবং যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা।

গদ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য ও রূপায়ণ

- রামমোহনের গদ্যভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিষয় নিষ্ঠতা, যুক্তিনির্ভরতা এবং সরলতা। তিনি একদিকে শাস্ত্রীয় অনুষঙ্গে পারদর্শী ছিলেন, অন্যদিকে আধুনিক যুক্তিবাদী মননের প্রতিনিধি। এই দুইয়ের সমন্বয় তাঁর গদ্যকে একটি স্বতন্ত্র স্বর দেয়।
- তাঁর গদ্য সহজবোধ্য হলেও কোথাও কোথাও ছেদচিহ্নের অভাবে আড়ষ্ট মনে হতে পারে। নিজেই স্বীকার করেছেন, "এই ভাষার গদ্যে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিংবা কাব্য রচিত হয় নাই" অর্থাৎ, বাংলা গদ্য এখনও পূর্ণতা পায়নি— এই উপলব্ধি থেকেই তিনি ভাষার বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

ধর্ম ও দর্শন 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' :

রামমোহনের ধর্মচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একেশ্বরবাদ, নিরাকার ঈশ্বর এবং অদ্বৈত দর্শনের প্রতি আনুগত্য। তিনি শঙ্করাচার্যের মতানুসারী ছিলেন, তবে তাঁর অদ্বৈতবাদ সমাজবিমুখ নয়। তিনি সংসারকে মায়া হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেননি, বরং যুক্তি ও কর্মমুখীনতার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের পথ দেখিয়েছেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার'-এই দুটি গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরের নিরাকার রূপের বিশ্লেষণ করেছেন এবং উপনিষদীয় ভাবনাকে বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, "যেখানে চিত্তের স্থৈর্য হয়, সেই স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক।" এই বক্তব্য আধুনিক ঈশ্বরচিন্তার এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

উপনিষদ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

রামমোহন উপনিষদের যে ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

- ঈশোপনিষদ (১৮১৬)
- কঠোপনিষদ (১৮১৭)
- মাণ্ডুক্যোপনিষদ (১৮১৭)
- মুণ্ডকোপনিষদ (১৮১৯)
- গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮)

উপনিষদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলেছেন, উপনিষদ এমন ব্রহ্মবিদ্যা যা সংসারের মোহ ধ্বংস করে 'সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যোপ নিষচ্ছব্দবাচ্যা, তৎপরাণাং সহেতো : সংসারস্বাত্যস্তাবসাদনাৎ'। কিন্তু রামমোহন কখনও সংসারকে মোহ বলে মনে করেননি। ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'কঠোপনিষদে'-র অনুবাদে রামমোহন বললেন, 'ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম হয়েন, ইহার কারণ দিয়েছেন, ব্রহ্মেতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচ গুণ নাই: অতএব তাঁহাকে শুনিতে, স্পর্শ করিতে, দেখিতে, আস্বাদন করিতে, আঘ্রাণ করিতে কেহ পারে না। রামমোহনের ব্রহ্মসংগীতেও এই ভাবধারা অনুসৃত হয়েছে। উপনিষদের অনেকগুলো ব্যাখ্যা নিয়ে যখন বিতর্ক দেখা গেছে, রামমোহন তখন শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন। 'মাণ্ডুক্যোপনিষদ'-এর ভূমিকায় জগতকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলে জানিয়েছেন, "এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।" রামমোহনের উপনিষদের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ ও রামানুজের বিশিষ্ট-দ্বৈতবাদের সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

প্রথম বাংলা গদ্য ব্যাকরণ গ্রন্থ

'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রামমোহনের মৃত্যুর পর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা গদ্য ব্যাকরণ গ্রন্থ 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। ইংরেজদের বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার জন্য ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন "Bengalee Grammar in English Language" রচনা করেছিলেন। তারপর বাংলাতে বাংলা ব্যাকরণ লেখা একান্ত জরুরী প্রয়োজন মনে করেছিলেন এবং সেই সময় 'স্কুল বুক সোসাইটি' রামমোহনকে বাংলা ব্যাকরণ লিখে দিতে

অনুরোধ জানালে তাতে তিনি সম্মতি জানান। রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন হ্যালহেড, কেরী প্রমুখের ইংরাজিতে লেখা বাংলা ব্যাকরণ থাকলেও বাংলায় লেখা বাঙালি ছাত্রদের জন্য বাংলা ব্যাকরণ একান্ত প্রয়োজন, কেননা তখন পর্যন্ত বাংলায় লেখা কোনো বাংলা ব্যাকরণ ছিল না।

গদ্যসাহিত্যের প্রেরণা

ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা রামমোহনের গদ্য সাহিত্যের প্রেরণা হয়েছে। একজন উচ্চাঙ্গের প্রাবন্ধিকের যে সব গুণ থাকা একান্ত জরুরী, রামমোহনের সেইসব গুণ ছিল। তিনি আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, উর্দু, হিব্রু, ইংরেজি, বাংলা-প্রভৃতি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। আর এর সঙ্গে ছিল তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও বিচার করার ক্ষমতা। গুরু হরিহরানন্দ, তীর্থস্বামীর সহযোগিতায় সংস্কৃতের মাধ্যমে আর্যশাস্ত্রের অনুশীলন করেছিলেন। বেদ-বেদান্ত-তন্ত্র বিষয়ে তিনি যেমন ছিলেন প্রাচীন আদর্শের সমর্থক, আবার শিক্ষা ও সমাজ দর্শনের ক্ষেত্রে ইংরেজের স্বাতন্ত্র্যবোধ তথা পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। 'ব্রাহ্মণসেবধি' ও 'সম্বাদ কৌমুদী' পরিচালনার সময় এই বিষয়টা রামমোহন বারবার জানিয়েছেন।

বৈশিষ্ট্য :

১। যুক্তি নির্ভরতা : ধর্ম ও সমাজ নিয়ে আলোচনায় তিনি যুক্তির ওপর জোর দেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতন রামমোহন গ্রন্থগুলো হল, 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬-১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), দুই খণ্ডে লেখা 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তক সম্বাদ (১৮১৮-১৯), 'চারি প্রশ্নের উত্তর' (১৮২২), 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' (১৮১৭)।

২। বোধগম্যতা : ছেদচিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে যে সে গদ্য আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল রামমোহন নিজে তা বুঝেছিলেন বলেই বেদান্ত গ্রন্থে জানিয়েছেন 'এ ভাষার গদ্যতে অদ্যাপি কোনও শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্জনে আইসে না, ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না।'

৩। সরলতা : ভাষায় অপ্রয়োজনীয় অলংকার পরিহার করেছেন।

৪। তর্কের অনুষঙ্গ : গদ্যকে বিতর্ক ও আলোচনার বাহন করেছেন। বাংলা গদ্যকে তিনি সর্বপ্রথম আলোচনা ও বিতর্কের বাহন করেছেন। তাঁর বিতর্কমূলক গদ্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম হল 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার' (১৮২৬), ইত্যাদি। গোপাল হালদার বলেছেন, "রামমোহনের ভাষার প্রধান গুণ-প্রথমত, বক্তব্যকে সরল করে বলার জন্যই রামমোহন লেখেন, শব্দ বা বাক্যের লেখা দেখবার ইচ্ছায় নয়। তাই তাঁর ভাষা প্রায়ই সরল, এমনকি, সময়ে সময়ে প্রাঞ্জল। দ্বিতীয়ত, তার্কিক রামমোহন বিপক্ষের বিরুদ্ধে কটুক্তি প্রয়োগ করেননি, এবং অপরের কটুক্তিকে স্থির ভাবে যুক্তিদ্বারা নিরসন করেছেন। এই আশ্চর্য সংযম তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রুচিবোধের প্রমাণ।"

৫। নির্ভরযোগ্য ব্যাকরণচর্চা : শব্দের ব্যবহার ও বাক্য গঠনে শৃঙ্খলা ছিল লক্ষণীয়।

৬। পাঠগম্যতা : সাধারণ পাঠকের বোঝার উপযোগী করে গদ্য নির্মাণের চেষ্টা করেছেন।

৭। কৃত্রিমতা বর্জন : সংস্কৃত শব্দ ও সন্ধি-সমাসের অতিরিক্ত ব্যবহার এড়িয়েছেন।

৮। তাঁর গদ্যভাষায় আকর্ষণীয়তার অভাব ছিল না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তাঁহার ভাষা শ্রুতিমধুর না হইলেও সময় দময় কর্কশ হইলেও ইহার শক্তি ও আকর্ষণীয়তা অনুভূত হয়।"

ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর গদ্যের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, "দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষায় লিখতেন, তাহাতে কোনও বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতিসহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু, সে লেখার শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ্য মিষ্টতা ছিল না।" ড. সুকুমার সেন বলেছেন, "তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষকে আগাইয়া যাইবার পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনিই আমাদের দেশের প্রথম লিঙ্গুয়িস্ট।.... বাঙলা গদ্যের তিনি জনক-এই অর্থে যে তিনিই প্রথম বাঙলা গদ্যে স্বীয় স্বাধীন চিন্তা লিপিবদ্ধ করেন....।" রামমোহনের গদ্য যুক্তির গদ্য, তর্ক-বিতর্কের গদ্য, তাই সর্বক্ষেত্রে সাবলীল হতে পারেনি। তবে ব্যাকরণ, সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন শিল্পী। ব্যাকরণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় শব্দে বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়, তাহাকে সেই দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়। তাঁর সমকালে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলি' (১৮০৮), গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক' (১৮২৩) ইত্যাদি গ্রন্থে ভাষার যে সাবলীলতা লক্ষ্য করা যায়, সেই সাবলীলতা রামমোহনের গদ্যে দেখা যায় না। এই হৃদয়াবেগ না থাকার জন্য তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদি পুরোহিত হলেও সার্থক শিল্পী হয়ে উঠতে পারেননি।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। রামমোহন রায়ের গদ্যরীতি বিষয়ে যা জানেন লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৪.৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ভূমিকা

উনিশ শতকের বাঙালি সমাজজীবনে এক অনন্য উজ্জ্বল নাম ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১)। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক, লেখক ও ভাষার নির্মাতা। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে তাঁর অবদান শুধু প্রাথমিক স্তরে নয়, বরং বাংলা গদ্য ভাষাকে শুদ্ধ, সরল ও প্রাঞ্জল করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাই ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের। বাংলা ভাষায় আধুনিক গদ্যচর্চার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন তিনি, যা বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এক মৌলিক পর্ব রচনা করে।

বাংলা গদ্যের প্রেক্ষাপট

ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে বাংলা গদ্য সাহিত্য ছিল অপ্রতিষ্ঠিত ও কৃত্রিম। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে রচিত অনুবাদমূলক গদ্য ছিল কাঠিন্যপূর্ণ ও পণ্ডিতবৃত্তির ভারে জর্জরিত। প্রচলিত গদ্যে পারস্য-আরবী শব্দপ্রাচুর্য, খিচুড়ি ঢং ও অতিরঞ্জিত অলংকার শোভা ছিল অধিক। সাধারণ পাঠকের কাছে এই ভাষা ছিল দুর্বোধ্য ও কৃত্রিম। এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের ভাষাকে সাধুতা ও সরলতার সংমিশ্রণে এক নতুন রূপ দেন।

ভাষা নির্মাণে বিদ্যাসাগরের অবদান

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে এক সাধু ও সুসংহত ভাষার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর ভাষা ছিল একাধারে সাবলীল, যুক্তিসংগত ও ব্যাকরণসম্মত। সংস্কৃতভাষার জ্ঞানসম্পন্ন হলেও তিনি অহেতুক জটিলতা ও দুর্বোধ্যতার পক্ষে ছিলেন না। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকসমূহ, যেমন—'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়', 'কথামালা', প্রভৃতি বই বাংলা ভাষার ভিত্তিকে মজবুত করে। এগুলোতে তিনি কাহিনি ভিত্তিক উপস্থাপন এবং ভাষার সুশৃঙ্খল ব্যবহার দ্বারা শিক্ষার্থীদের সহজভাবে জ্ঞান গ্রহণে সহায়তা করেন।

প্রথম বাংলা গদ্য অনুবাদ সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদান

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুবাদ সাহিত্য বাংলা গদ্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন, যেমন- 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'বেতাল পঞ্চবিংশতী', 'সিংহল-বিজয়', 'রাজা হরিশচন্দ্র' ইত্যাদি। তাঁর অনুবাদগুলিতে কৃত্রিমতা বা অতিরঞ্জিত অলংকারের ব্যবহার নেই; বরং সহজ ও সাবলীল ভাষার মাধ্যমে তিনি গল্পের আবেদন অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তুর প্রসার

বিদ্যাসাগরের রচনায় সমাজ ও নীতিবোধের এক গভীর সংবেদনশীলতা দেখা যায়। তাঁর রচনাসমূহে যেমন কাহিনি চিত্রণের মুন্সিয়ানা রয়েছে, তেমনি নৈতিক শিক্ষাও জড়িত থাকে। 'বর্ণপরিচয়'-এর গল্পগুলো যেমন শিশুদের জন্য উপযোগী ছিল, তেমনি সমাজ সংস্কারের বার্তা ছিল তাঁর অনুবাদ সাহিত্যেও। তিনি বাংলা গদ্যে জ্ঞানচর্চা, মননচর্চা এবং যুক্তিনির্ভর চিন্তার পথ সুগম করে তোলেন, যা বাংলার নবজাগরণ পর্বে একটি মৌলিক ও স্থায়ী ভূমিকা রেখেছিল।

সামাজিক প্রভাব ও শিক্ষার বিস্তার

বিদ্যাসাগরের ভাষার সাধু রূপ পরবর্তীকালে প্রশাসনিক, শিক্ষাব্যবস্থা ও আদালতেও স্থান পায়। তাঁর ভাষা ছিল শিক্ষিত সমাজের মানদণ্ড হয়ে ওঠা গদ্য। এ ছাড়া তাঁর প্রচেষ্টায় বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশেষ করে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য ভাষার চর্চাও সাধারণ মানুষের নাগালে আসে।

গ্রন্থ পরিচয়

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক যুগান্তকারী রূপকার। তিনি শুধু ভাষার রূপ নির্মাণ করেননি, বরং বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্তর্বস্তুতেও নতুন মাত্রা যোগ করেন। তাঁর সাধু ভাষার শৈলী, অনুবাদ সাহিত্যের মান, সমাজসংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষার

প্রসার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায় রচনা করেছে। বাংলা গদ্যের পিতৃসম ব্যক্তি হিসেবে বিদ্যাসাগরের নাম চিরস্মরণীয়। তাঁর সাহিত্যকর্ম প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত-(১) অনুবাদমূলক রচনা ও (২) মৌলিক রচনা।

অনুবাদমূলক রচনা

বিদ্যাসাগরের অনুবাদকর্ম বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। হিন্দি, সংস্কৃত এবং ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পুথি ও কাহিনি অনুবাদ করে তিনি শুধু বাংলার পাঠকদের কাছে বিচিত্র সাহিত্য ভাণ্ডার উন্মোচন করেননি, বরং বাংলা গদ্য ভাষাকেও পরিপক্ক, সরস এবং ভারবহনে সক্ষম করে তোলেন।

তাঁর অনুবাদকর্ম ছিল মূলত ভাবানুবাদ বা মর্মানুবাদ- অর্থাৎ তিনি কেবল শব্দগত অনুবাদ করতেন না, বরং মূল ভাব ও শৈলী অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলা পাঠকের উপযোগী ভাষায় রূপান্তর করতেন।

উল্লেখযোগ্য অনুবাদগ্রন্থসমূহ

১। বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)
২। শকুন্তলা
৩। সীতার বনবাস
৪। ভৃগুসংহিতা
৫। ভ্রান্তিবিলাস মূল ইংরেজি নাটক The Comedy of Errors অবলম্বনে)
৬। প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৯২)
৭। 'বাসুদেব চরিত' রচয়িতাকে কেন্দ্র করে মতভেদ থাকলেও, অন্যান্য অনুবাদ কর্মের বেলায় বিদ্যাসাগরের লেখকত্ব স্বীকৃত।

হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী' থেকে অনুবাদ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের সচ্ছন্দ গদ্যানুবাদ 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), ভবভূতির উত্তরচরিত এবং বাল্মীকির রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের আখ্যানের অনুসরণে 'সীতার বনবাস' (১৮৬০), শেক্সপীয়রের 'Comedy of Errors'-এর গল্পাংশের অনুবাদ 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯)। এছাড়াও তিনি কয়েকখানি পাঠ্যগ্রন্থেরও অনুবাদ করেছিলেন। মার্শম্যানের 'History of Bengal'-এর কয়েক অধ্যায় অবলম্বনে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮), চেম্বার্সের 'Biographies' ও 'Rudiments of Knowledge' অবলম্বনে যথাক্রমে 'জীবনচরিত' (১৮৪৯) ও 'বোধোদয়' (১৮৫১) এবং ঈশপের ফেবলস্ অবলম্বনে 'কথামালা' (১৮৫৬) রচনা করেন। এ অনুবাদগুলি যথার্থ মৌলিক গ্রন্থের মতো মর্যাদা পেয়েছে।

মৌলিক রচনা

বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনাগুলো মূলত যুক্তিনির্ভর, তর্কবিতর্কমূলক এবং সমাজ-সংস্কারমূলক প্রকৃতির। তিনি সমাজে প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, এবং অনৈতিক প্রথার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং যুক্তির ভিত্তিতে সমাজকে সচেতন করার প্রয়াস নেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর লেখনী ছিল

সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে। তাঁর যুক্তিবাদী ও মানবিক চিন্তা বাংলায় এক নবজাগরণের বীজ বপন করে এবং পরবর্তী সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে। তাঁর লেখার শক্তি ছিল যুক্তির জোর, ভাষার স্বচ্ছতা ও বক্তব্যের সাহসিকতায়, যা তাঁকে কেবল একজন ভাষাশিল্পী নয়, বরং একজন যুগপ্রবর্তক চিন্তাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

উল্লেখযোগ্য মৌলিক রচনাসমূহ

- বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে পুস্তক
- বিধবা বিবাহের পক্ষে মত
- সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবনা
- নারীশিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন
- প্রবোধ পুস্তিকা

তাঁর মৌলিক রচনায় যুক্তির জোর, ভাষার স্বচ্ছতা এবং বক্তব্যের দৃঢ়তা একত্রে কাজ করে। তৎকালীন সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এগুলি ছিল এক ধরনের সাহসী প্রতিবাদপত্র। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৯১) -বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার মৃত্যুতে রচিত। তা বাংলা গদ্যে লিখিত প্রথম শোককাব্য। ১৮৯১ সালে আত্মজীবনী লেখেন 'বিদ্যাসাগর চরিত' নামে, গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ ছিল। ১৮৫৩ সালে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থ লেখেন।

সমাজ সংস্কারমূলক রচনা

'বিধবাবিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫), 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (প্রথম-১৮৭১), (দ্বিতীয়-১৮৭৩) শীর্ষক পুস্তিকাগুলিতে তাঁর অভ্রান্ত যুক্তি, তথ্যের সমারোহ এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-এ তাঁর স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং এতে তাঁর যথার্থ প্রাবন্ধিকের প্রতিভা সুপ্রমাণিত হয়েছে।

লঘু রচনা

'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩)-কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য ছদ্মনামে রচিত বহু বিবাহ বিষয়ে তারানাথ তর্কবাচস্পতির প্রতিবাদের বেনামী উত্তর-প্রত্যুত্তর। 'ব্রজবিলাস' (১৮৫৫) গ্রন্থটি কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য ছদ্মনামে নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বিধবা-বিবাহ বিরোধী সংস্কৃত বক্তৃতার উত্তর। 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬) কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য ছদ্মনামে রচিত। এইসব রচনায় রঙ্গপ্রিয় বিদ্যাসাগরের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

শিক্ষামূলক রচনা

'বর্ণ পরিচয়' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ-১৮৫৫) ও 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা'। শিশুশিক্ষার ভিত্তি প্রস্তুত করতে এবং শিশু মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী তাদের পঠন-পাঠনের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়াসে এই গ্রন্থগুলির রচনা। 'বর্ণ পরিচয়'-এর দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন, "বালকদিগের সংযুক্ত বর্ণ পরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সংযুক্ত বর্ণের উদাহরণ স্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণ বিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে,

গুরু-শিষ্য উভয়পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক এবং শিক্ষা বিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।"

ভাষারীতি ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য

বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তার পরিচ্ছন্নতা, প্রাঞ্জলতা এবং ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো। তিনি বাংলা ভাষায় এমন এক সাধু গদ্যরীতি গড়ে তোলেন, যা দীর্ঘদিন ধরে প্রাতিষ্ঠানিক লেখালেখি, শিক্ষাপ্রণালী এবং প্রশাসনিক ভাষার মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর গদ্যে জটিলতা ছিল না, কিন্তু ছিল গাম্ভীর্য; শুষ্কতা ছিল না, কিন্তু ছিল যুক্তির দীপ্তি। ভাষা হয়ে উঠেছিল চিন্তার বাহন-সুন্দর, সুগঠিত ও দৃষ্টিনন্দন। বিদ্যাসাগরই প্রথম ভাষাকে বিষয়ানুগ এবং উদ্দেশ্য নির্ভর রূপে গড়ে তোলেন, যা পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের জন্য এক অনুসরণীয় আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর গদ্যে ছিল—

- ব্যাকরণসম্মত নির্মাণ,
- সরল অথচ পূর্ণ বাক্যবন্ধ,
- প্রাঞ্জলতা ও যুক্তিনিষ্ঠ ভঙ্গি,
- বিপুল শব্দভাণ্ডার ব্যবহারের দক্ষতা ইত্যাদি।

বাংলা গদ্য নির্মাণে বিদ্যাসাগরের অবদান

নিম্নে আলোচনা করা হলো—

১। বিদ্যাসাগরের হাতে সাহিত্যিক গদ্যের জন্ম।

২। তিনি ভারসাম্য রক্ষা করতে মধ্যপন্থা অনুসরণ করেছিলেন।

৩। অ্যাডিসন ইংরেজি সাহিত্যের গদ্যে যা করেছেন, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্য সেই কাজ করলেন। আতিশয্যহীন, বিশেষ কোনো একদিকের প্রবণতাহীন গদ্যই হচ্ছে তার গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৪। বঙ্কিমচন্দ্রের আগেই বিদ্যাসাগর বিষয়ের প্রয়োজন অনুসারে ভাষাকে জটিল ও সরল করেছিলেন।

৫। ভাষার মধ্যে অনতি লক্ষ্য ছন্দচেতনা এনেছেন। গদ্যে সুর, তাল, লয়, যতি ইত্যাদির প্রয়োগকুশলতায় গদ্যের মধ্যে প্রবহমানতা এনেছেন-যা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ছিল না।

৬। বিরতি ও যতি চিহ্ন দ্বারা শাসিত ও সংশোধিত করে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে বোধের ভাষাকে রসের পর্যায়ে উন্নীত করেন।

৭। গদ্যকে উপবাক্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে, বাক্যকে ভাবানুসারে অন্বয়ীভূত করে, ধ্বনি সামঞ্জস্য ও গতির মধ্যে অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত এনে, বাক্যের গতির মধ্যে পূর্ণতা এনে বাংলা গদ্যের সম্পূর্ণতা এনেছেন বিদ্যাসাগর।

৮। বাংলা ক্লজ এবং ফ্রেজ বাক্যাংশে প্রয়োগ করে ভাষার ব্যবহার যোগ্যতা সম্পাদন করেছেন তিনি।

৯। বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা জটিল বাক্যবন্ধ নির্মাণ করার সম্ভাবনাকে তিনি যেমন ব্যবহার করেছেন, আবার ভাষার সহজ স্বরূপও তার মধ্যে আনতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয়ের উত্তরসূরী।

১০। বাংলা গদ্যকে সংহত করার জন্য সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করলেও তিনি গদ্যকে প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত করেছেন ও অনেক পরিমাণে সরল করে দিয়েছেন।

১১। সংযুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার তাঁর গদ্যে বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে— যেমন, গমন করিলেন, শ্রবণ করিলেন ইত্যাদি।

১২। কমা ও সেমিকোলনের ব্যবহার বিদ্যাসাগরই প্রথম যথার্থ অধিকারীর ঢঙে করতে পেরেছিলেন।

১৩। ইংরেজি Sentence Structure বা বাক্য গঠনরীতি বিদ্যাসাগরের রচনায় প্রথম চোখে পড়ে।

১৪। ক্রিয়াপদের শেষে অনাবশ্যক 'ক'-এর ব্যবহার। যেমন-করিবেক, যাইবেক ইত্যাদি প্রচুর।

১৫। তিনি বাংলা গদ্যভাষাকে তর্কবিতর্কের ভারবহনক্ষম যেমন করেছিলেন তেমনি সরস অনুবাদের জন্য যে ভাষার প্রয়োজন সেই ভাষাও ব্যবহার করেছেন।

১৬। বিদ্যাসাগর শুধু সাধু গদ্যরীতির গদ্য রচনা করলেও কথ্য বাংলার প্রাণধর্মকে তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। যেমন 'ভ্রান্তিবিলাসে'র গদ্যভাষা অনেকটাই চলিত রীতির অনুসারী, যদিও কাঠামো সাধুরীতির। যেমন— "একথা শুনিয়া বিলাসিনী বলিলেন, বলিতে কি ভাই, তুমি যথার্থই পাগল হয়েছ, নতুবা এমন কথা কেমন করিয়া মুখে আনিলে।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের এক বলিষ্ঠ নির্মাতা। তাঁর অনুবাদে যেমন সাহিত্যের প্রসার ঘটেছে, তেমনি মৌলিক রচনায় যুক্তিবাদ ও মানবিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে। তিনি গদ্যকে শুধু সাহিত্যের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেননি, বরং সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার করেও তুলেছেন। তাঁর প্রভাব বাংলা গদ্যের পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের ওপর সুদূরপ্রসারী এবং চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে। বিদ্যাসাগর গল্প শোনানোর ভাষা দিয়েছেন 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল' এইসব গ্রন্থ রচনা করে। এই পুস্তিকা দুটির ভাষার মধ্যে শ্লেষ ও তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এই পুস্তিকাগুলি সম্বন্ধে বলেছিলেন: "এইরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে।" ভাষার নমুনা: "আমি পূর্ব্বে কখনও বিদ্যাসাগরকে দেখি নাই। একদিন ইচ্ছা হইল সকলে লোকটার এত প্রশংসা করে, অতএব, ইনি কীরূপ জানোয়ার, আজ একবার দেখিয়া আসিব।"



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। বাংলা গদ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৪.৭ অক্ষয়কুমার দত্ত

অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের পথিকৃৎ এবং বাঙালির মননে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদের বীজ রোপণকারী এক প্রগাঢ় চিন্তাবিদ। তিনি বাংলা গদ্যকে যেমন একটি সংহত, সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ রূপ দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর লেখনীতে যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আবেগমুক্ত চিন্তার পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের যুগসঙ্গী হিসেবে অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা ভাষা ও মননের ইতিহাসে একটি অনন্য স্থান অধিকার করেছেন। দুজনেই ভাষার শুদ্ধতা, চিন্তার স্পষ্টতা ও যুক্তির দৃঢ়তায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও অক্ষয়কুমার ছিলেন তুলনামূলক ভাবে আরও নিরাবেগ, অনুসন্ধিৎসু ও যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ধারক।

১৮৪৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র প্রকাশের মাধ্যমে গড়ে ওঠে একটি বিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন। এই পত্রিকা ছিল তাঁর চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রধান মাধ্যম, যার মাধ্যমে তিনি আবেগ তাড়িত সমাজকে যুক্তিনির্ভর চেতনার দিকে ধাবিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর রচনার মধ্যে ছিল একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর-যা আবেগ ও অন্ধবিশ্বাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে যুক্তি ও প্রমাণের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। ফলে, অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর সময়ের আবেগপ্রবণ সমাজের মধ্যে এক ব্যতিক্রমী চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত হন।

যদিও তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু হয়েছিল 'অনঙ্গমোহন' নামক একটি কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর চিন্তাশীল রূপ প্রকাশ পায় গদ্য রচনার মধ্য দিয়ে। সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর'-এ গুপ্ত কবির সহায়তায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর গদ্য লেখার মাধ্যমে তাঁর লেখক জীবনের সূচনা ঘটে। পরবর্তীতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ার পর, তাঁর চিন্তার গভীরতা ও লেখার পরিপক্কতা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। প্রথমদিকে তাঁর ভাষা ততটা সাবলীল না হলেও, তত্ত্ববোধিনী সভার মনীষীদের সংস্পর্শে এসে তাঁর ভাষা ও ভাবনার উভয় ক্ষেত্রেই এক নতুন মাত্রা যোগ হয়।

তবে এই বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশের সঙ্গে তাঁর চিন্তার যেমন মিল ছিল, তেমনি দ্বন্দ্বও ছিল। বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবধারার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির গভীর বিরোধ দেখা যায়। দেবেন্দ্রনাথ যেখানে বেদ-উপনিষদের প্রতি একপ্রকার ভক্তিনত মনোভাব পোষণ করতেন, অক্ষয়কুমার সেখানে ধর্ম ও জীবন দর্শনের বিশ্লেষণে যুক্তি ও বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁর মতে, যেহেতু বেদ ও উপনিষদ মানুষের রচিত, সেহেতু তা কখনোই অভ্রান্ত বা সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে না। দেবেন্দ্রনাথ নিজেই অকপটে স্বীকার করেছেন, "আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ।" এই কথাতেই অক্ষয়কুমারের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য এবং যুক্তিবাদী মননের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অক্ষয়কুমার দত্তের লেখার মূল উপজীব্য ছিল জ্ঞানানুরাগ, যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার নির্ভরতা। আবেগ নয়, যুক্তিই ছিল তাঁর ভাবনার চালিকাশক্তি। তিনি পাশ্চাত্য দর্শন, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে জীবন ও জগতের

ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর গদ্য ছিল চিন্তার স্বচ্ছতা ও বিশ্লেষণধর্মিতায় পূর্ণ, এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে যুক্তি, প্রমাণ ও নিখুঁত মননের দীপ্তি বিদ্যমান ছিল। বাংলা গদ্য সাহিত্যে অক্ষয়কুমার দত্ত শুধু একটি সাহিত্যিক ধারার নির্মাতা নন, বরং একটি জাতিকে আধুনিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পথে পরিচালনার পথপ্রদর্শক। তাঁর অবদান বাংলা ভাষাকে শুধু অলঙ্কারিক সাহিত্যরূপেই নয়, চিন্তনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, আবেগ নয়-যুক্তিই একটি জাতির অগ্রগতির মূল ভিত্তি। সার্বিকভাবে, অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন বাংলা গদ্যের একজন মৌলিক চিন্তাবিদ ও আধুনিক বাঙালি মননের অন্যতম নির্মাতা। তাঁর চিন্তা ও রচনায় যে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা ও মানবিক মননের স্বচ্ছ প্রতিফলন রয়েছে, তা আজও প্রাসঙ্গিক এবং অনুপ্রেরণাদায়ক।

অক্ষয়কুমারের গদ্যরচনা

'ভূগোল' (১৮৪১), পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬), 'চারুপাঠ'- তিনখণ্ড (১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৯), 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (প্রথম ভাগ ১৮৫১; দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩), 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬), 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (প্রথম ভাগ ১৮৭০; দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩)।

অক্ষয়কুমার দত্তের রচিত গ্রন্থাবলী মূলত বুদ্ধিনির্ভর এবং মননাশ্রয়ী। তিনি কিছু স্কুলপাঠ্য জাতীয় গ্রন্থ রচনা করে শিক্ষার্থীর মনে বুদ্ধি ও যুক্তির পারম্পর্যকে চিহ্নিত গদ্য ও প্রবন্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি যেহেতু তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক, নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, সেজন্য স্কুলপাঠ্য শ্রেণির পুস্তক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর 'ভূগোল' গ্রন্থটি তত্ত্ববোধিনী সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে রচিত এই গ্রন্থ রচনার সঙ্গে অক্ষয়কুমারের বিপুল জ্ঞানস্পৃহা, তথ্যানুসন্ধান ও বৈচিত্র্যানুসন্ধানী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থে বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন লেখক। বিজ্ঞানের গূঢ় বস্তুজ্ঞান ও তাত্ত্বিক জ্ঞানকে নতুনভাবে পরিবেশন করে, পরিভাষার প্রণালীবদ্ধ প্রকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে গ্রন্থটিকে সজ্জিত করেছেন। বিজ্ঞানের বস্তুতন্ময় দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করেছেন। বিজ্ঞানের অনুসরণে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্তনকেই অক্ষয়কুমার যথার্থ ধর্ম বলে মনে করেছিলেন। অক্ষয়কুমারের ধর্মানুভবের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক মননের স্বরূপ ছিল উল্লেখ্য।

'ধর্মনীতি' গ্রন্থটি রচনায় জর্জ কুম্বেরের 'Moral Philosophy' নামক গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তবে কুম্বেরের বস্তুতন্ময় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ এবং মধ্যযুগীয় বিশ্বাসকে তিনি একইসঙ্গে গ্রহণ করেননি। প্রাকৃতিক বিধান-ই যে ভগবত ভক্তির ভিত্তি-তা তিনি এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন। 'চারুপাঠ' গ্রন্থের তিন খণ্ডে স্বপ্নদর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ এবং স্বদেশানুরাগ প্রকাশের উপযোগী কিছু প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থটি জর্জ কুম্বের-এর 'The Constitution of Man Considered in Relation to Eternal Objects' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। প্রকৃতির সঙ্গে বাহ্যজগতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিয়ে জর্জ কুম্বেরের বক্তব্য অক্ষয়কুমার যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন। তাই গ্রন্থটিতে লেখকের মৌলিকতা যথেষ্ট। কেননা তিনি তাঁর রচনায়

মূল গ্রন্থ বহির্ভূত বহু উদাহরণ ও নির্দেশ দিয়েছেন, যা এদেশীয় জনগণের পক্ষে স্বাভাবিক ও কল্যাণকর। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে মদ্যপানের অবৈধতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া ধর্ম ও সামাজিক নিয়ম পালনের ফল, নানা প্রাকৃতিক নিয়মের সমবেত কার্য, ব্যক্তির পক্ষে তার ফলাফল প্রভৃতি আলোচনা করেছেন।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা। উইলসনের 'Essays and lectures on the Religion of the Hindus' অবলম্বনে রচিত হলেও লেখক এতে অনেক নতুন বিষয় যোগ করেছেন। এটি বাঙালির গবেষণামূলক সাহিত্যের এক প্রধান নিদর্শন। সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন— "বিষয় গৌরবে ও লিপিকুশলতায় সত্যই তা 'Masterpiece" (বাংলা সাহিত্যে গদ্য, পৃষ্ঠা-৭৮)। এই গ্রন্থে লেখকের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, সত্যনিষ্ঠা, বিচারভঙ্গি, অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান এবং গভীর স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের দুটি উপক্রমণিকা মৌলিক প্রবন্ধের পরিচয় বহন করে। এতে আপেক্ষিক শব্দবিদ্যা, প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে বৈদিক ধর্মের প্রচলন, বৈদিক ধর্মের পর হিন্দু সম্প্রদায়ে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রসার, বিভিন্ন ধর্মের উপাসনা প্রণালী স্থান পেয়েছে। ভাষার নমুনা-"ল্যাটিন ও গ্রীক, কেলটিক ও টিউটোনিক, লেটিক ও স্লেবোনিক, হিন্দু ও পারসিক ইত্যাদি বংশীয় বিভিন্ন জাতি একটি মূল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই পরম মনোহর মহত্তম তত্ত্বটি য়ুরোপীয়দিগের শব্দ বিদ্যানুশীলনের, বিশেষতঃ সংস্কৃতচর্চার ফল।"

অক্ষয়কুমারের গদ্যের বৈশিষ্ট্য :

- ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা গদ্যকে দিয়েছিলেন মাধুর্য ও শিল্পসুষমা-ভাবীকালের সার্থক সাহিত্যকর্মের যা বাহন। অক্ষয় কুমার দত্ত দিলেন যুক্তি বিচার সমৃদ্ধ ভারবহনের ক্ষমতা -যে দুর্লভ শক্তিবলে বাংলা গদ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন হতে পারে সহজে। সে ভাষা কেবল ঋজু নয়, মসৃণ এবং সাবলীলও। (ভূদেব চৌধুরী)
- তিনি ইউরোপীয় ভাবপ্রচারের মিশনারী। তথ্যনিষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচার তিনিই প্রথম বাংলায় আরম্ভ করেন। তাঁর যুক্তিবাদে ও আলোচনায় দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্মধর্মকে অনেকটা যুক্তিবাদী করে তোলে। তাই তার গদ্যও যুক্তিধর্মী।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, "তিনিই বাঙালীর সর্বপ্রথম নীতি শিক্ষক"। শুধু বিষয় মাহাত্ম্য, গবেষণা প্রয়াস ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছাড়াও অক্ষয়কুমার এদিক থেকেও স্মরণীয়। বাংলা গদ্যে বহুবিধ কঠিন তথ্যের ও ভাবের প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছেন দক্ষ লেখক রূপেই। প্রকৃতপক্ষে গদ্যের যা প্রথম উপযোগিতা তা হচ্ছে সাধারণ কাজ চালানো। "গদ্য হচ্ছে age of reason-এর স্বভাষা। সেই 'কাজের কথায় গদ্য' ও যুক্তির আশ্রয় গদ্যভাষায় রচনার প্রথম চেষ্টা করেন অক্ষয়কুমার"। (গোপাল হালদার)
- অনেকে তার গদ্যে সরলতার অভাব লক্ষ করেছেন, সত্যই তার গদ্যের ভাষা বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের ভাষা, তবে বাংলা গদ্যে তিনি যে সৃজনী শক্তির দিকটি প্রকাশ করেছেন তার মূল্য কম নয়।

কৃতিত্ব : প্রাবন্ধিক হিসাবে অক্ষয়কুমারের কৃতিত্ব হল

ক) অক্ষয়কুমারের সময় থেকেই প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

খ) তাঁর সময় থেকেই প্রবন্ধ বাদ-প্রতিবাদের পথ ত্যাগ করে একোক্তিমূলক প্রবন্ধরীতির সূত্রপাত।

গ) পূর্ববর্তী লেখকদের গদ্যভাষা ও রীতিতে যে অনাবশ্যক সমাসবাহুল্য ও জড়তাদোষ দেখা যায় তা অক্ষয়কুমারের গদ্যে নেই।

ঘ) বিশুদ্ধ গদ্য যে বুদ্ধিপ্রধান তা অক্ষয়কুমার প্রথম দেখালেন। তাঁর এই ধারা পরবর্তীকালের প্রাবন্ধিকদের প্রভাবিত করেছে।

৪.৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সাধারণত উপন্যাসের জনক হিসেবে উচ্চারিত হয়। তবে তাঁর সাহিত্য প্রতিভা শুধুমাত্র উপন্যাস-রচনার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না- তিনি ছিলেন বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যেরও এক উজ্জ্বল পথিকৃৎ। সাহিত্যরসের মাধুর্য ও যুক্তিনিষ্ঠ মননের সংমিশ্রণে তিনি যে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা উনিশ শতকের বাঙালির বৌদ্ধিক জগতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটিয়েছিল। তিনি ছিলেন এক সত্যিকারের 'সব্যসাচী'-এক হাতে রোমান্টিক উপন্যাস, অন্য হাতে সমাজমনস্ক প্রবন্ধসাহিত্য রচনায় সমান পারদর্শী।

অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রকে স্কটের সঙ্গে তুলনা করে তাঁকে 'বাংলার স্কট' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই তুলনা সীমিত, কারণ স্কট যেখানে ইতিহাস ভিত্তিক রোমান্টিক উপন্যাসেই সীমাবদ্ধ ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য তার চেয়ে অনেক বিস্তৃত-তিনি সাহিত্যের পরিসর অতিক্রম করে সমাজ, ধর্ম ও দর্শনের জটিল স্তরেও প্রবেশ করেছেন। তাঁর লেখনী শুধু কল্পনার রসে নয়, বরং তীক্ষ্ণ যুক্তি ও বাস্তবতার ভিত্তিতে গঠিত চিন্তার আলোড়নে বাংলাভাষী সমাজকে নাড়া দিয়ে তুলেছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির আত্ম-অনুসন্ধান ও বৌদ্ধিক নবজাগরণের যে পর্ব শুরু হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সেই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধসম্ভার কেবল সময়ের দর্পণই নয়, বরং তা ছিল বাঙালির আত্মবোধ, ঐতিহ্যচেতনা ও আত্মসম্মানবোধ গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাঁর প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে এক উচ্চপর্যায়ের মননশীলতা, যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ এবং চিন্তার স্বাধীনতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ শুধু চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করেনি; তিনি তাঁর চিন্তার বলয়ে একদল মননশীল বুদ্ধিজীবীরও সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন, যাঁরা তাঁর প্রভাব অনুসরণ করে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। সে কারণে তাঁকে কেবল একজন সফল সাহিত্যিক নয়, বরং তৎকালীন বাঙালি সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্যে আগমন যে সবসময় এমন গভীরতা নিয়ে ঘটেছিল, তা নয়। তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভে, বিশেষ করে বাল্যকালে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবে যে কৃত্রিম ভাষায় তিনি কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, সেগুলো বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর দিক থেকে তেমন গুরুত্বের দাবি রাখে না। বাংলা প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁর প্রকৃত

উৎসাহ জাগে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণের পর। যদিও ১৮৭১ সালে ইংরেজি 'The Calcutta Review'-এ 'Bengali Literature' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেন, মূলত ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার পর থেকেই তিনি প্রবন্ধকে একটি দার্শনিক ও চিন্তাশীল শিল্পরূপে গড়ে তোলার প্রয়াস শুরু করেন।

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগ্রন্থের সংখ্যা অল্প নয়— 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'প্রবন্ধপুস্তক' (১৮৭৯), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ ১৮৮৭), 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (২য়-১৮৯২), 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ('প্রচারে' ১২৯২ ও ১২৯৫ সালে মুদ্রিত)। এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রবন্ধেও বঙ্কিম-প্রতিভা কত ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, ধর্মকথা, দর্শন, শিল্পতত্ত্ব, শাস্ত্রগ্রন্থ- এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেননি। এই প্রবন্ধগুলিতে তাঁর যুক্তি-আশ্রয়ী সিদ্ধান্ত, মননশীলতার পরিচয় এবং সাহিত্যগুণ পাওয়া যাবে প্রচুর পরিমাণে। নানা তত্ত্বকথা ও তথ্যকে তিনি প্রবন্ধের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কোনো আলোচনাই নীরস তথ্যবিবৃতি মাত্র হয়নি। কোনো কোনো গ্রন্থে হালকা-চালে আখ্যানের ঢঙে তিনি গুরুতর কথা আলোচনা করেছেন। যেমন— 'লোকরহস্য'। এতে সমাজ, শিক্ষা-দীক্ষা ও চারিত্র নীতির অসংগতি কৌতুক রসের মধ্য দিয়ে চমৎকার ফোটানো হয়েছে। ফলে গুরুতর তত্ত্বকথা সরস ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানের কথাও যে কত পরিচ্ছন্ন ও সাহিত্য-গুণান্বিত হতে পারে তা তাঁর 'বিজ্ঞান-রহস্য' না পড়লে বোঝা যাবে না। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'কমলাকান্ত' সম্পর্কে দু-এক কথা বলা সমীচীন।

কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামে এক কাল্পনিক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রসন্ন গোয়ালিনীর দধিদুগ্ধে প্রতিপালিত হয়ে এবং নসীরামবাবুর দেওয়া আফিং বটিকা উদরস্থ করে মাঝে মাঝে দিব্য-দৃষ্টি লাভ করতেন এবং তারই ঝোঁকে অদ্ভুত কথা বলতেন। ইংরেজ সাহিত্যিক ও সমালোচক ডি-কুইন্সির (১৭৮৫- ১৮৫৯) 'Confessions of an English Opium Eater'-এর অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনা করেন। অবশ্য দু-জনের মধ্যে মন ও মেজাজের দিক দিয়ে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশি। ডি-কুইন্সি ব্যক্তিগত জীবনে অসুখ সারাবার জন্য আফিং ধরেন এবং ভয়ানক ভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তারপর যখন দেখলেন এত বেশি নেশাগ্রস্ত হলে মৃত্যুও হতে পারে, তখন তিনি নেশার হাত থেকে মুক্তি পান। কমলাকান্তের ধরনধারণ এরকমের নয়। তিনি নেশা করলেও জগৎ ও সংসার সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত, সকলের প্রতিই তাঁর একটা নিঃস্পৃহ ঔদার্যের দৃষ্টি আছে। মানুষ ও সমাজের নানাপ্রকার অন্যায়, ত্রুটি ও অসংগতিকে তিনি উদার হাস্যের দ্বারা সহ্য করেন। এইজন্য এ-গ্রন্থের রচনারীতি বিচিত্র, কমলাকান্ত চরিত্র বিচিত্র, এর রসের আবেদনও বিচিত্র। ডি-কুইন্সির সঙ্গে তাঁর রচনার বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নিতান্তই অল্প। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করতেন। কারণ এতেই তিনি ছদ্মবেশের অন্তরালে নিজের মনের কথা খোলাখুলি বলতে পেরেছেন।

বুদ্ধিপ্রধান বিশুদ্ধ প্রবন্ধসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব অসাধারণ। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, সশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির চিত্তবিকাশের ভার নিয়েছিলেন, দেশনেতা বঙ্কিমচন্দ্র বলিষ্ঠ সংকেতে সমগ্র দেশকে নিজের চিন্তাবলয়ের অভিমুখে টেনে নিয়ে গেছেন। তাঁর 'বিবিধ-প্রবন্ধ'-এ সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজ বিষয়ে সে সমস্ত প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে, এখনও তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধটি একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম, য়ুরোপের সাম্যবাদ, যাকে য়ুরোপের অধিকাংশ সমাজনেতা জুজুর মতো ভয় করতেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাগ্রহ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যের আর একটা বড়ো উপাদান, আমাদের পৌরাণিক ঐতিহ্যকে যুক্তির মারফতে বৈজ্ঞানিক বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে দেখা। এ বিষয়ে 'কৃষ্ণচরিত্র' একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ। এত দিন ধরে ভক্তি ও অধ্যাত্ম চেতনার সাহায্যে কৃষ্ণকে অনুধ্যান করতে ভারতীয় মন অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তির দ্বারা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং অনৈসর্গিক ও অলৌকিকতাকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে বৃহৎ মানবতার আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণকে স্থাপন করেছেন-এ আদর্শ তিনি অষ্টাদশ-উনিশ শতকের নব্য-মানবতাবাদী (Neo-humanist) য়ুরোপের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

সার্বিক ভাবে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এমন এক মনীষী, যিনি বাঙালির আত্মসচেতনতা গঠনে, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে এবং যুক্তিনির্ভর চিন্তাধারার প্রসারে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ আজও পাঠককে চিন্তার গভীরতায় নিমজ্জিত করে, যুক্তির দীপ্তিতে আলোকিত করে, এবং সাহিত্যিক শৈলীতে মোহিত করে তোলে। তিনি ছিলেন কেবল একজন প্রাবন্ধিক নন, বরং বাঙালির আধুনিক মননের অন্যতম নির্মাতা।

৪.৯ বাংলা গদ্য সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ সাধারণত আমাদের কাছে এক আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক, সন্ন্যাসী, দেশপ্রেমিক এবং মানবসেবার বার্তাবাহক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু সাহিত্যচর্চার পরিসরে তিনি ছিলেন এক ব্যতিক্রমী, বলিষ্ঠ ও গভীর চেতনা সম্পন্ন প্রাবন্ধিক। উনিশ শতকের অন্তিম লগ্নে বাংলা গদ্য সাহিত্যে যাঁরা আধুনিকতার নব দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন, স্বামীজী ছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য। হুতোমপ্যাঁচার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপভরা চপল চলিত গদ্যের যে পথ, তা তিনি ব্যবহার করেন ভিন্ন উদ্দেশ্যে— সেই ভাষাকেই পরিণত, বোধগম্য এবং ভাবপ্রকাশের জন্য উপযোগী রূপে রূপান্তরিত করেন। বাংলা গদ্যকে তিনি নিয়ে যান যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণে এক অভূতপূর্ব উচ্চতায়।

গদ্য রচনায় বিবেকানন্দ : আবেগ, যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ

স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যিক পথচলা শুরু হয় মূলত পত্র সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, যদিও তাঁর অধিকাংশ রচনার ভাষা ইংরেজি। তবে তাঁর বাংলা রচনাগুলিও ছিল ভাব ও ভাষার এক স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২), 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫), 'পরিব্রাজক' (১৯০৫),

'ভাবনার কথা' (১৯০৭), এবং 'পত্রাবলী'- এই গ্রন্থগুলোর মধ্য দিয়ে স্বামীজী তুলে ধরেছেন বাংলা গদ্য সাহিত্যে তাঁর চিন্তা, বোধ, অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক দূরদৃষ্টি।

বিশেষত 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে দেখা যায়, তিনি সাধু ভাষায় লিখলেও কোথাও জড়তা নেই-আছে বক্তব্যের ঋজুতা ও মেধার দীপ্তি। অপরদিকে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বা 'পরিব্রাজক'-এ তিনি চলিত ভাষা প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন, সাধারণ মানুষের জন্য যে কোনো গভীর ভাবও সরল ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব। এমনকি, তাঁর অনেক লেখায় দেখা যায় সাহিত্যের উপস্থাপন ভঙ্গি কখনো চিত্রময়, কখনো কাব্যিক- যেমনটা দেখা যায় এই চিত্রধর্মী বর্ণনায়— "সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার তার নীচে ঝোপ ঝোপ তার নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলচে।" এই বাক্যে ভাষা হয়ে উঠেছে রূপ-রস-গন্ধের মিশ্রণে এক শিল্পসুষমামণ্ডিত অভিব্যক্তি।

ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিপ্লব

স্বামীজীর ভাষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্পষ্ট এবং সাহসী। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাহিত্যিক বা দার্শনিক ভাষা মানে দুর্বোধ্যতা নয়, বরং মানুষের অনুভূতির সপ্রতিভ প্রকাশ। তিনি চলিত গদ্যের পক্ষে জোরালো ভাবে দাঁড়ান। তাঁর মতে, ভাষার জড়তা, কৃত্রিমতা মানেই জাতির অবনতির লক্ষণ। এজন্যই তিনি সংস্কৃত-গন্ধী, সমাসবদ্ধ সাধু ভাষাকে 'মরার লক্ষণ' বলে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর ভাষা প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য হলো- চলিত ও সাধু গদ্যের পারস্পরিক সঙ্গত সংমিশ্রণ, প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষার রূপান্তর এবং শ্রেণি-নির্বিশেষে সর্বজনগৃহীত রূপে ভাষাকে তৈরি করা।

স্বদেশ, সমাজ ও সাম্যের ভাবনায় গদ্যের ব্যবহার

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এক বিপ্লবী দেশপ্রেমিক, যাঁর গদ্য-রচনার মূল সুর ছিল 'মানুষের মুক্তি'। তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে দার্শনিক তত্ত্বের বাহক, আবার সাধারণ মানুষের জাগরণে এক মন্ত্রোচ্চারণ। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে তিনি বিশ্ব সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনায় সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থার গভীর বিশ্লেষণ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর একটি ব্যঙ্গাত্মক, তীক্ষ্ণ অথচ গভীর পর্যবেক্ষণপূর্ণ ভাষ্য- "একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেলে, আর একজন কিনলে, যে চাষ করলে সে পেলে ঘোড়ার ডিম..." এই ভাষায় কৌতুকের আড়ালে একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শোষণ ও বণ্টনের বৈষম্যকে তিনি অত্যন্ত সরল কিন্তু তীক্ষ্ণ ভাবে প্রকাশ করেছেন। এমন সাহসী দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর প্রবন্ধকে কেবল আধ্যাত্মিক ভাষণ না বানিয়ে বাস্তব সমাজজীবনের অনিবার্য আয়না করে তুলেছে।

সমাজবোধ ও শ্রেণিসচেতনা

বিবেকানন্দের ভাবনা কেবল ধ্যানে মগ্ন আত্মার মুক্তি নয়, বরং বাস্তব সমাজের নিপীড়িত মানুষের মুক্তি। তাঁর গদ্যের প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে যেন ধ্বনিত হয় এই আহ্বান- "তোমরা শূন্যে

বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুঠির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাস থেকে, বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" এই ভাষা শুধু উচ্চারণ নয়, এক বিপ্লবের ডাক। এই ভাষায় আছে দরিদ্র, চণ্ডাল, মুচি, মেথর, জেলে, জোয়ানের প্রতি এক সহানুভূতিশীল সমাজ সচেতনা, যা তখনকার অনেক বুদ্ধিজীবীর লেখায় অনুপস্থিত। তিনি কেবল আধ্যাত্মিকতাই নয়, বরং ভাষাকে করেছিলেন এক বাস্তববাদী হাতিয়ার-জাতি গঠনের, মানুষ গঠনের।

ভাষায় ভাবের বিস্তার : মনন ও আবেগের সহাবস্থান

স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যের আরেক বৈশিষ্ট্য হল এর দ্বৈততা-একদিকে মননশীলতা ও যুক্তিবোধ, অপরদিকে হৃদয়বিদারক আবেগ ও কল্পনার আবেশ। কখনো তাঁর গদ্য লৌহদৃঢ় যুক্তিবর্তী, আবার কখনো কল্পনাপ্রবণ কবির মতো। এ কারণেই তাঁর লেখায় আমরা দেখি একই সঙ্গে বক্তার ও ঋষির, চিন্তকের ও প্রেমিকের, তত্ত্বজ্ঞ ও কথকতার সহাবস্থান। তিনি যখন বলেন- "ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত... বল-মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" এক্ষেত্রে তাঁর ভাষা হয়ে ওঠে জাতি পুনর্গঠনের ধ্বনি।

সার্বিক বিচারে স্বামী বিবেকানন্দের প্রবন্ধ শুধু সাহিত্য নয়, তা ছিল আত্মবিশ্লেষণ, জাতি চিন্তা ও মানবতার অগ্নি স্নান। বাংলা গদ্য সাহিত্যে তিনি যে পরিবর্তন এনেছিলেন তা শুধুমাত্র ভাষার পরিবর্তন নয়, ছিল চেতনার রূপান্তর। হুতোমের হাত ধরে শুরু হওয়া চলিত গদ্যের যে রূপরেখা, বিবেকানন্দ তাকে দিলেন আধ্যাত্মিক দীপ্তি, বিপ্লবী মেজাজ ও মানবিক শুদ্ধতা। তাঁর প্রবন্ধে মেলে একাধারে চিন্তাশীল দ্রষ্টার গভীরতা, দেশপ্রেমিকের তেজ এবং আধ্যাত্মিক মনীষার স্পর্শ। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি যিনি নির্মাণ করেছিলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ-প্রাবন্ধিক হিসেবে যাঁর অবদান বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৪.১০ অধ্যায় সংক্ষেপ

বাংলা গদ্য হল আধুনিকতার দিক নির্দেশকের পাশাপাশি বাংলার সমাজ সংস্কৃতির অন্যতম বার্তাবাহক। উনিশ শতকের বাংলা গদ্যকারদের গদ্যের বিভিন্ন বিষয়ে সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছিল। আমরা জানি গদ্যের ভাষা হল মানুষের মুখের ভাষা ফলত এই ভাষাতে উনিশ শতকের যাপনের ভিন্নরূপ ভিন্ন ভিন্ন গদ্যকারদের সহজাত শিল্পী প্রবৃত্তি দ্বারা প্রকাশ পেয়েছিল। ধর্ম, দর্শন, প্রেম, তিতিক্ষা, ভাষা, শিল্প, শিক্ষা বহু রঙিন অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত।



৪.১১ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- এই অধ্যায়ে আমরা উইলিয়াম কেরীর গদ্যরচনার বিষয়ে জানতে পেরেছি।
- মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্যরীতি সম্পর্কে জানতে পেরেছি।
- রামমোহন রায়ের, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের গদ্যরীতি সম্পর্কে বিশদ ধারণা পেয়েছি।



৪.১২ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যে যে সাধু ছাঁদ বেঁধে দিয়েছিলেন, তার আগেই মৃত্যু সে ধরনের গদ্যরীতি অনেকটা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। ... মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরীতির বিশ্লেষণ করলে আমরা তার মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করি ...গদ্যরীতির মধ্যে নাটকীয় শৈলীপ্রয়োগ করে তিনি বলিষ্ঠ প্রাণচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৪.৪ অংশ)

২। রাজা রামমোহন রায়ের গদ্যভাষার বৈশিষ্ট্য: (১) ছেদচিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় অনেকক্ষেত্রে যে সে গদ্য আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল ...বাংলা গদ্যকে তিনি তর্ক-বিতর্কের অনিবার্যবাহন করে তুলেছেন। ...তিনি বাংলা গদ্য সংস্কৃত সন্ধি ও সমাসের ব্যাপক ব্যবহার করেননি। ... (৯) তিনি ইংরেজি বাক্যের গঠন রীতি অনুসরণ করে বাংলায় এবং, দিয়ে বাক্য শুরু করেছেন। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৪.৫ অংশ)

৩। বাংলা গদ্যরীতিতে বিদ্যাসাগরের দান সূত্রাকারে সাজানো যায়, বিদ্যাসাগরের হাতে সাহিত্যিক গদ্যের জন্ম। ... (৫) ভাষার মধ্যে অনতিলক্ষ্য ছন্দচেতনা এনেছেন।... (৭) গদ্যকে উপবাক্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে, বাক্যকে ভাবানুসারে অন্বয়ীভূত করে, ধ্বনি সামঞ্জস্য ও গতির মধ্যে অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত এনে, বাক্যের গতির মধ্যে পূর্ণতা এনে বাংলা গদ্যের সম্পূর্ণতা এনেছেন বিদ্যাসাগর।-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৪.৬ অংশ)



৪.১৩ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্স
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (২০১৭); প্রজ্ঞাবিকাশ; কলকাতা : আগস্ট
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা; কলকাতা : তুলসী প্রকাশন

- চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল (১৪১৮ বঙ্গাব্দ); সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্যপ্রসঙ্গ; কলকাতা: রত্নাবলী।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (২০১৬-২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড



৪.১৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা গদ্যের উদ্ভবের ইতিহাসে উইলিয়াম কেরির অবদান উল্লেখ করুন।

২। বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অবদান আলোচনা করুন।

৩। বাংলা গদ্যসাহিত্যে রামমোহন রায়ের অবদান আলোচনা করুন।

৪। বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা করুন।

৫। বাংলা গদ্য সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ অবদান উল্লেখ করুন।

.....

অধ্যায় ৫ : আধুনিক বাংলা নাটক-১

বিন্যাস ক্রম

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৫.২ পরিচিতি

৫.৩ বাংলা নাটকের পূর্বসূত্র

- ৫.৩.১ রঙ্গমঞ্চ
- ৫.৩.২ বিদেশি রঙ্গালয়
- ৫.৩.৩ শখের নাট্যশালা

৫.৪ রামনারায়ণ তর্করত্ন

- ৫.৪.১ বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে রামনারায়ণ তর্করত্নের ভূমিকা

৫.৫ মধুসূদন দত্ত

- ৫.৫.১ মধুসূদন দত্তের নাটকের শ্রেণিবিভাগ
- ৫.৫.২ মধুসূদন দত্তের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
  - ৫.৫.২.১ পৌরাণিক নাটক
  - ৫.৫.২.২ ঐতিহাসিক নাটক
  - ৫.৫.৩.৩ প্রহসন
- ৫.৫.৩ নাট্য সাহিত্যে মধুসূদন এর গুরুত্ব

৫.৬ দীনবন্ধু মিত্র

- ৫.৬.১ দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের শ্রেণিবিভাগ
- ৫.৬.২ সামাজিক নাটক
- ৫.৬.৩ রোমান্টিক নাটক
- ৫.৬.৪ কমেডি নাটক
- ৫.৬.৫ নাট্য সাহিত্যে দীনবন্ধুর গুরুত্ব

৫.৭ অমৃতলাল বসু

- ৫.৭.১ অমৃতলাল বসুর নাটকের শ্রেণিবিভাগ
- ৫.৭.২ নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
- ৫.৭.৩ নাট্যগুরুত্ব

৫.৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

- ৫.৮.১ নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গুরুত্ব

৫.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ

৫.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

৫.১১ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৫.১২ অতিরিক্ত পঠন

৫.১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

বাংলা সাহিত্যে নাটক সৃষ্টির পূর্বে বাংলার সমাজে যাত্রা, পাঁচালি, কবির গান ইত্যাদির মাধ্যমেই নাট্যরসের স্বাদ পেতেন। কিন্তু পরবর্তীতে ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালির মধ্যে নাটক লেখা ও অভিনয়ের সূত্রপাত হয়। ইংরেজদের আমোদ প্রমোদের জন্য অভিনীত বিভিন্ন প্লের আয়োজনে যুক্ত হয়ে কলকাতার সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবারগুলিও নিজ গৃহে নাট্যশালা তৈরি করতে শুরু করেন। পরবর্তীতে হেরাসিম লেবেদফ 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামে কলকাতায় একটি রঙ্গমঞ্চ তৈরি করেন। এভাবেই ধীরে ধীরে বাঙালি সমাজে নাটক অভিনয় হতে শুরু হয় এবং নাট্যকারেরা বাংলা নাটক লেখার অনুপ্রেরণা পান। আলোচ্য অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানতে পারব—

ক। বাংলা নাটক সৃষ্টির ইতিহাস।

খ। কলকাতায় শ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস।

গ। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট নাট্যকারদের কৃতিত্ব।

৫.২ পরিচিতি

অনুমান করা হয়ে থাকে সংগীতের সমন্বয়ে প্রদর্শিত মৃত্যুই ক্রমে ক্রমে নাটকের অভিনয়ে পরিণতি লাভ করেছে। প্রাচীন ভারতের নাট্যচর্চার প্রভূত উদাহরণ রয়েছে। প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন সংস্কৃত ও প্রাকৃত নাটকের দক্ষতার সঙ্গে অভিনয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু এই নাটক অভিনয় শুধুমাত্র সমাজের সম্ভ্রান্ত মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলত সাধারণ জনগণ নানান লৌকিক দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে লোকাভিনয়ে নিযুক্ত হত। এর হাত ধরেই বাঙালিদের মধ্যে যাত্রাভিনয় ও কবিগান ইত্যাদির প্রাবল্য দেখা দেয়। কিন্তু এই যাত্রাভিনয় ও কবিগান ইত্যাদি বাংলা নাটকের সৃষ্টিতে পরোক্ষ প্রভাব ফেলেনি। বাংলা নাটকের সৃষ্টির মূলে মূলত কার্যকরী হয়েছিল ইংরেজদের ইংরেজি নাট্যাভিনয়। ফলস্বরূপ হেরাসিম লেবেদেফ এর হাত ধরে বাংলায় বেলগাছিয়া নাট্যশালা, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ইত্যাদি গড়ে ওঠে। স্বভাবতই মঞ্চের তাগিদ এবং জনগণের বাংলা নাটক প্রীতির জন্য নাট্যকারেরা কলম ধরতে শুরু করেন।

৫.৩ বাংলা নাটকের পূর্বসূত্র

ইংরেজদের নাট্যচর্চা বাংলা নাটক রচনার ভিত প্রস্তুত করেছিল। এই ক্ষেত্রে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি হেরাসিম লেবেদফ। তিনি বাংলা ভাষা শিখে বাঙালি কুশীলব ও দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে প্রথম নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক কর্মটি তিনি সমাপ্ত করেছিলেন নিজের সৃষ্টি করা 'বেঙ্গলি থিয়েটারে' । ১৭৯৫ সালে কলকাতার এই 'বেঙ্গলি থিয়েটার'-এ 'Disguise' (১৭৯৫) এবং 'Love is the Best Doctor' (১৭৯৬) নামে দুটি ফরাসি নাটকের বাংলা অনুবাদ করে অভিনয় করান। 'Disguise' নাটকটির বাংলা অনুবাদ করা হয়েছিল 'কাল্পনিক সংবদল' নামে। নাটকটির অভিনয় দর্শক মহলে প্রভূত সাড়া

ফেলেছিল। 'কাল্পনিক সংবদল' নাটকটি বাংলা ভাষায় অভিনীত প্রথম নাটক হলেও নাটকটি যথার্থ নাটকের মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। নাটকটির ভাষা, চরিত্র-চিত্রণ যথোপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি। তবে সার্থক নাটক না হলেও বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম অভিনীত নাটক হিসেবে এই নাটকটিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয়।



জেনে রাখা ভালো

প্রাক্ মধুসূদন পর্বের উল্লেখযোগ্য নাট্যকারেরা হলেন নন্দকুমার রায়, তারাচরণ শিকদার, যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, উমেশচন্দ্র মিত্র এবং রামনারায়ণ তর্করত্ন।

প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক তারাচরণ শিকদার কর্তৃক ১৮৫২ সালে রচিত 'ভদ্রার্জুন'। এ নাটকের মূল বিষয় অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণের কাহিনি। মহাভারত থেকে কাহিনি সংগ্রহ করা হলেও বাঙালি সমাজের বাস্তব পরিবেশ এতে অঙ্কিত হয়েছে। এটি বাঙালি কর্তৃক এবং বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কমেডি নাটক। ১৮৫২ সালে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত রচিত 'কীর্তিবিলাস' বাংলা ভাষার প্রথম বিয়োগান্তক বা ট্র্যাজেডি নাটক। সপত্নীপুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচারের কাহিনি অবলম্বনে এটি রচিত। বিভিন্ন চরিত্রের মৃত্যুর মাধ্যমে ট্রাজেডির রূপায়ণ এ নাটকের বৈশিষ্ট্য। বাংলা নাটকের উদ্ভবপর্বে হরচন্দ্র ঘোষ অনুবাদমূলক নাটক রচনার জন্য খ্যাতিলাভ করেন। শেক্সপীয়রের নাটক প্রথম বাংলায় অনুবাদ করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' নাটকের অনুবাদ করেন 'ভানুমতির চিত্তবিলাস' (১৮৫৩) নামে, 'রোমিও জুলিয়েট' নাটক অবলম্বনে 'চারুমুখ চিত্তহারা' (১৮৬৪) অনুবাদ করেন। এছাড়াও তিনি 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮) নামে মহাভারতের দুর্যোধনের উরুভঙ্গ এবং অন্ধ রাজার যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়ার কাহিনিকে নিয়ে লেখেন এবং 'রজত গিরিনন্দিনী' (১৮৭৪) নাটক বার্মী আখ্যায়িকা অবলম্বনে লেখা ইংরাজি নাটকের অনুবাদ। এছাড়াও নন্দকুমার রায় (১৮৫৫) খ্রিস্টাব্দে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের অনুবাদ করেন 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নামে। এভাবে বিদেশীয়দের প্রচেষ্টায় ও স্বদেশীয়দের আগ্রহে বাংলা নাটকের পথচলা শুরু হয়, যা পরবর্তীতে রামনারায়ণ তর্করত্ন হয়ে মধুসূদন দত্তের হাতে স্বরূপে বিকশিত হয়।

৫.৩.১ রঙ্গমঞ্চ

নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্য রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে যথোপযোগী অভিনয়। বলা হয়ে থাকে নাটক একটি প্রায়োগিক শিল্প। নাটক মঞ্চে অভিনয় করবার জন্য উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চ, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সংগীত, দৃশ্যসজ্জা এবং সর্বোপরি দর্শকের অবদান অনস্বীকার্য। পুরোপুরি একটি মঞ্চ ব্যবস্থা নাটক রচনাকে সার্থক করে তোলে। উনিশ শতকের প্রথম দিকেই বাংলার বুকে নানান বিদেশি রঙ্গালয়ে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন নাটকের অভিনয় দেখে বাঙালি জাতি নাট্যচর্চার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। সে সময়ে হেরাসিন লেবেদফের হাত ধরে প্রথম বাঙালি নাটক অভিনয়ের সুযোগ পায়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে দেশি-বিদেশি নানান নাট্যশালা বাংলার বুকে তৈরি হয়েছে।

৫.৩.২ বিদেশি রঙ্গালয়

- ওল্ড প্লে হাউস : 'ওল্ড প্লে হাউজ' কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজদের প্রথম নাট্যশালা। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় এটি গড়ে ওঠে। লালবাজার ষ্ট্রিটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেন্ড এণ্ড্রুজ গির্জার বিপরীত পাশে এটি তৈরি হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নবাব সিরাজদৌলার কলকাতা আক্রমণের সময়ে এই রঙ্গালয়টি ধ্বংস হয়ে যায়।
- দি নিউ প্লে হাউস : জর্জ উইলিয়ামস ১৭৭৫ এ থিয়েটারটি প্রতিষ্ঠা করেন। রাইটার্স বিল্ডিং এর পেছন দিকে এই রঙ্গালয়টি অবস্থিত। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত অভিনেতা প্রযোজক ডেভিড গ্যারিকের সাহায্য ও উপদেশে এই প্লে হাউজের মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। এই থিয়েটার বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন যেমন রবিনসন ব্যান্ডেল, মিসেস হরিটো প্রভৃতি।
- এথেনিয়াম থিয়েটার : মিস্টার মরিস ১৮১২ সালে 'এথেনিয়াম থিয়েটার' উদ্বোধন করেন। ১৮ নং সার্কুলার রোডে এই থিয়েটারটি তৈরি হয়েছিল। থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হবার পরে দর্শক মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। এখানে অভিনীত সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট'।
- চৌরঙ্গী থিয়েটার : 'এমেচার ড্রামাটিক সোসাইটি' কর্তৃক ১৮১৩ সালে এই থিয়েটারটি তৈরি হয়। 'এমেচার ড্রামাটিক সোসাইটি'র সদস্যরা এই থিয়েটারে নাটক দেখতে আসতেন। এখানে বেশি চাঙ্গের নাট্যাভিনয় দেখতে পাওয়া যেত এবং উচ্চমানের নাট্য শিল্পীরা সমবেত হতেন। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে দ্বারকানাথ ঠাকুর এই থিয়েটারের পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন পরবর্তীতে মালিকানাও পেয়েছিলেন। আধুনিক বাঙালির নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এই থিয়েটার বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
- সাঁসুসি থিয়েটার :স্টোকলারও মিসেস লীচ ১৮৪৯ সালে এ থিয়েটারটি উদ্বোধন করেন। চৌরঙ্গী থিয়েটার পুড়ে যাওয়ার স্বল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এই থিয়েটারটি চালু হয়। উদ্বোধনের রাত্রিতে 'ইউ কান্ট ম্যারি ইউর গ্র্যান্ডমাদার' নাটক এবং দুটি প্রহসন অভিনীত হয়েছিল।
- বেঙ্গলি থিয়েটার : বঙ্গীয় নাট্যশালার জনক হেরাসিম লেবেদেফ 'বেঙ্গলি থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। অনূদিত বাংলা নাটক 'কাল্পনিক সংবদল' পাশ্চাত্য রীতিতে তৈরি হয়, এই প্রথম নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকের অভিনয়ে দৃশ্যসজ্জার ক্ষেত্রে বাঙালির সমাজ সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এছাড়াও বাঙালি অভিনেতা অভিনেত্রীরা এখানে অভিনয়ের সুযোগ পান। এই প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হবার পর বাঙালি নাট্যকারেরা বাংলা ভাষায় নাটক লিখতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।
- অন্যান্য বিদেশী থিয়েটার : কলকাতায় আরো বেশ কিছু বিদেশী থিয়েটার তৈরি হয়েছিল যেগুলির অবদান বাংলা নাট্য চর্চার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন— হোয়েলার প্লেস থিয়েটার, দমদম থিয়েটার, বৈঠকখানা থিয়েটার, জুভেনাইল থিয়েটার, দি অ্যামেচার ড্রামাটিক সোসাইটি প্রভৃতি।

৫.৩.৩ শখের নাট্যশালা

ইংরেজদের নাট্যাভিনয় মঞ্চ ব্যবস্থাপনা বাঙালি শিক্ষিত যুবক যুবতীর মনে খুব গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আমোদ-প্রমোদের খাতিরে কলকাতার অভিজাত ধনী বাঙালিরা একাধিক নাট্যশালা তৈরি করেছিলেন। সেগুলি নিম্নরূপ—

- হিন্দু থিয়েটার : প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বাঙালি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে এই থিয়েটারের শুভারম্ভ হয়েছিল।
- নবীন বসুর নাট্যশালা : নবীনচন্দ্র বসু তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে ১৮৩৫ সালে একটি রঙ্গমঞ্চ তৈরি করেছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারের অনুপ্রেরণাতেই তিনি নাট্যশালা তৈরি করার পরিকল্পনা করেন। এই নাট্যশালায় 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় হয়েছিল এবং তা খুব জনপ্রিয় হয়।
- ওরিয়েন্টাল থিয়েটার : নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৩ সালে এই থিয়েটারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এতে অভিনয় করেছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দে, দীননাথ ঘোষ প্রমুখব্যাক্তিরা।
- সাতু বাবুর বাড়ির নাট্যশালা : কলকাতার আশুতোষ দেবের বাড়িতে এই নাট্যশালা তৈরি হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের সরস্বতী পূজার দিন এই রঙ্গালয়ের উদ্বোধন হয়। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এখানে ইংরেজি নাটকের অভিনয় পুরোপুরি বন্ধ করা হয় এবং শুধুমাত্র বাংলা নাটকের অভিনয়ের ধারা প্রবর্তিত হয়।
- বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ : কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে এই রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় ভট্টনারায়ণের লেখা 'বেণীসংহার' বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন, এখানে সেই অনূদিত নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়েছিল। এই রঙ্গমঞ্চের খাতিরে কালীপ্রসন্ন সিংহ নাটক লিখতে শুরু করেন। এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পাশাপাশি অভিনয় শেখারও ব্যবস্থা ছিল।
- বেলগাছিয়া নাট্যশালা : পাইকপাড়ায় প্রতাপচন্দ্র সিংহ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে ১৮৫৮ সালে 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' তৈরি হয়। বেলগাছিয়ার একটি বাগানবাড়িতে এই স্থায়ী রঙ্গমঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই নাট্যশালার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। এই বেলগাছিয়া নাট্যশালাতেই 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় হয়েছিল। 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে মাইকেল মধুসূদন দত্ত আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি নাটক রচনায় অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্যই মধুসূদন দত্ত রচনা করেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। এই নাট্যশালার পরোক্ষ প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে নাট্যকার মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটে।
- অন্যান্য শখের নাট্যশালা : এছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু নাট্যশালা বাংলা নাট্যচর্চার অগ্রগতির পাথেয় হয়ে উঠেছিল সেগুলি হল— জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, মেট্রোপলিটন থিয়েটার, পাথুরিঘাটা বঙ্গ নাট্যালয় ইত্যাদি। এর পরবর্তীতে বাংলায় বেশকিছু সাধারণ

রঙ্গালয়ের সূত্রপাত ঘটে। এই রঙ্গালয়গুলির মাধ্যমে নাটক বৃহত্তর বাঙালির কাছে পৌঁছে যায় সেগুলি যথাক্রমে- ন্যাশনাল থিয়েটার, বেঙ্গলথিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার ইত্যাদি।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। বাংলায় প্রতিষ্ঠিত দেশি ও বিদেশি নাট্যশালা সম্পর্কে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৫.৪ রামনারায়ণ তর্করত্ন

রামনারায়ণ তর্করত্নের নাট্যচর্চার বিভিন্ন দিক নিম্নরূপ আলোচিত হলো।

৫.৪.১ বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে রামনারায়ণ তর্করত্নের ভূমিকা

বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে রামনারায়ণ তর্করত্নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি বেশ কিছু নাটক রচনা করেছেন বিশেষ করে সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ ও প্রহসন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বেলগাছিয়ায় তাঁর অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে মধুসূদন নাটক রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রামনারায়ণ নাটক লিখলেও মূলত হাস্যরসের নাটকে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি মৌলিক নাটক হল— 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), 'নবনাটক' (১৮৫৬), 'স্বপ্নধন' (১৮৭৩)। এছাড়াও বেশ কিছু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেছিলেন, সেগুলি হল— 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' (১৮৬০), 'মালতীমাধব' (১৮৬৭) ইত্যাদি। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি যথাক্রমে— 'রুক্মিণী হরণ' (১৮৭১), 'কংস বধ' (১৮৭৫), 'ধর্ম বিজয়' (১৮৭৫) প্রভৃতি। তবে কৌলিন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের কুফল দেখানোর উদ্দেশ্যে রচিত হাস্যরসের নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' জন্যই তিনি অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' এর জন্য নাট্যকারকে নানান সামাজিক বিশৃঙ্খলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এই নাটকের অভিনয় দেখে কুলীনের দল নাট্যকারের ওপর চড়াও হয়েছিলেন। এমনকি বিভিন্ন জায়গায় এই নাটক অভিনয় বন্ধ করারও চেষ্টা হয়েছিল। প্রহসন রচনায় রামনারায়ণের কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। তাঁর রচিত প্রহসনগুলি হল— 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (১৮৬৫), 'চক্ষুদান' (১৮৬৯), 'উভয় সংকট' (১৮৬৯) ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন এবং বাংলা নাটকের ভিত্তি প্রস্তুত করবার ক্ষেত্রে রামনারায়ণ তর্করত্নের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে রামনারায়ণ তর্করত্নের ভূমিকা আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)



জেনে রাখা ভালো

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে রামজয় বসাকের বাড়ির নাট্যশালায়। ১৮৫৮তে এই নাটকের অভিনয় হয় গদাধর শেঠের বাড়ির নাট্যশালায়। তাছাড়া এই একই বছর চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ির নাট্যশালায় এই নাটকের অভিনয় হয়।

৫.৫ মধুসূদন দত্ত

মধুসূদন দত্তের পূর্বে বাংলা নাটকের প্রস্তুতিপর্ব চললেও বাংলা নাটক যথার্থ রূপ ধারণ করেছে মধুসূদন দত্তের হাত ধরে। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখার পর তিনি বাংলা নাটকের দুর্দশা মোচনের উদ্দেশ্যে নাটক লেখায় হাত দেন এবং তিনি উচ্চাঙ্গের বেশ কিছু নাটক রচনা করেন। তাই বলা যেতে পারে বাংলা নাটকের যথার্থ প্রতিষ্ঠা মধুসূদনের হাত ধরেই।

৫.৫.১ মধুসূদন দত্তের নাটকের শ্রেণীবিভাগ

মধুসূদনের নাটক গুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

- পৌরাণিক নাটক— 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) 'মায়াকানন' (১৮৭৪)
- ঐতিহাসিক নাটক— 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)
- প্রহসন নাটক— 'একে কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়েরোঁ' (১৮৬০)

৫.৫.২ মধুসূদন দত্তের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৫.৫.২.১ পৌরাণিক নাটক

বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনিকে অবলম্বন করে মধুসূদন দত্ত 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী'র মতো উচ্চাঙ্গের নাটক রচনা করেছেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী'র অভিনয় দেখে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং যথার্থ নাটক লিখতে প্রয়াসী হন, তারই ফলশ্রুতি 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। মধুসূদন দত্ত মহাভারতের আদিপর্বের আখ্যান অবলম্বনে পাঁচ অঙ্কে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করেছেন। মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-পুরুর কাহিনিকে অবলম্বন করে তিনি এই নাটকটি রচনা করেছেন। নাটকটিতে শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বের অবসানের চিত্র ফুটে উঠেছে। সংস্কৃত ভাষারীতি এবং সংস্কৃত নাটকের নায়িকার কোমল লালিত ভাব এই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। নাটকটিতে চরিত্রের স্বাতন্ত্রতা, ভাষারীতি যথার্থ না হলেও প্রথম নাটক হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে।

মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী'। এই নাটকটি পৌরাণিক কাহিনিকে অবলম্বন করে লেখা হয়েছে, তবে ভারতীয় পুরাণ কাহিনিকে নয়। গ্রিক পৌরাণিক কাহিনি 'অ্যাপেল অফ ডিসকর্ড' থেকে নানান উপাদান সংগ্রহ করে এই নাটকের কাহিনি বুনন করা হয়েছে। তবে

নাটকটিতে ভারতীয় পুরাণের ছায়া লক্ষ করা যায়। নাটকটির মূল চরিত্র কুবেরের পত্নী মুরজা, রতি ও শচী। চরিত্রগুলির অনুপ্রেরণা নাট্যকার গ্রিক পুরাণ থেকে পেলেও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভারতীয় ধরনের করে তুলেছেন। এই নাটকটির ভাষা নাটকীয় এবং বিভিন্ন স্থানে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। পুরাণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও 'পদ্মাবতী'তে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

পদ্মাবতীর পর মহাভারতের উপাখ্যান নিয়ে সুভদ্রা নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন মধুসূদন কিন্তু রোগ শয্যায় থাকার দরুন তিনি নাটকটি শেষ করতে পারেননি। পরবর্তীতে এই কাহিনি ১৮৭৪এ 'মায়াকানন' নামে প্রকাশিত হয়।

৫.৫.২.২ ঐতিহাসিক নাটক

মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়, এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। কর্নেল টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan'-এর কাহিনি থেকে নাট্যকার নাটকটির উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কর্নেল টডের এই কাহিনির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজস্থানের ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তিমূলক রাজপুত জাতির বীরত্বের কাহিনি এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটিতে রানা ভীম সিংহের কন্যা কৃষ্ণা— রাজ্যের কল্যাণে পিতাকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেন। রচনা, গ্রন্থনা, ঘটনা, সংলাপ সমস্ত দিক থেকে মধুসূদন এখানে নাট্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। রানা ভীম সিং এর ট্র্যাজিক ব্যর্থতা ও কৃষ্ণকুমারীর করুণ রসের আখ্যান নাট্যকার দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

৫.৫.২.৩ প্রহসন

মধুসূদন প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক নাটক যেমন রচনা করেছেন তেমনি সার্থক প্রহসন রচয়িতা হিসেবেও তিনি কৃতিত্বের দাবিদার। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মধুসূদনের দুটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা?', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' পাশ্চাত্য সভ্যতা ইয়ং বেঙ্গল নাগরিক জীবনকে ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছে। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপন ও নানান দোষকে ব্যঙ্গ করে 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসন লেখা হয়েছে। অতিরিক্ত মদ্যপান এবং নানান যথেচ্ছাচার একটি যুবক সম্প্রদায়কে কীভাবে পতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তারই করুণ ছবি দেখা যায় 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনটিতে। 'একেই কি বলে সভ্যতা?'র মতো ঘরের ও সমাজ জীবনের এক গভীর সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁ' প্রহসনে। গ্রাম্য বাংলার বৃদ্ধের অনাচার কুৎসিততাকে ব্যঙ্গের চাবুকে আঘাত করেছেন মধুসূদন দত্ত। নাটকটিতে গ্রাম্য কথ্য ভাষা ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫.৫.৩ নাট্য সাহিত্যে মধুসূদন এর গুরুত্ব

- মধুসূদন পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে বাংলা নাটক রচনার দিক নির্ণয় করেছেন।
- মধুসূদনের নাটকগুলিতে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণ যেমন আছে তেমনি নাটকীয় দ্বন্দ্ব সংঘাত খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

- সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রকে মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ধনদাসের মধ্য দিয়ে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।
- মধুসূদন তাঁর প্রহসনগুলিতে দক্ষতার সঙ্গে স্বাভাবিক কথ্য ভাষার প্রয়োগ করেছেন।

৫.৬ দীনবন্ধু মিত্র

মধুসূদনের পর বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা প্রহসনে সামাজিক নানান অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন পাশাপাশি দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাটক রচনায় এই সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন।

৫.৬.১ নাটকের শ্রেণিবিভাগ

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে—

- সামাজিক নাটক— 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)
- রোমান্টিক নাটক— 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩)
- কমেডি নাটক— 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'জামাই বারিক' (১৮৭২)

৫.৬.২ সামাজিক নাটক

দীনবন্ধু মিত্রের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ নাটক 'নীলদর্পণ' এই নাটকটি দীনবন্ধু মিত্রকে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। ইংরেজ নীলকররা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে বাংলার চাষীদের ওপর কি নিদারুণ অত্যাচার চালিয়েছে তার করুণ ছবি এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। এই নাটকের অন্যতম চরিত্র গুলো হল নবীন মাধব, গোলকচন্দ্র বসু, ক্ষেত্রমনি, সাধুচরণ, রাইচরণ প্রমুখ। নাটকে নবীন মাধবের পরিবারের মধ্য দিয়ে কৃষক সমাজের করুণ ট্র্যাজেডির চিত্র ফুটে ওঠে। এই নাটকটি নীল চাষীদের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছিল এবং সেকালের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। সর্বোপরি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই নাটকটির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৫.৬.৩ রোমান্টিক নাটক

দীনবন্ধু মিত্র সমাজের গভীর সমস্যা নিয়ে নাটক লেখার পর রোমান্টিক নাটক লেখায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তার স্বাক্ষর বহন করে 'নবীন তপস্বিনী','লীলাবতী' ও 'কমলে কামিনী নাটক'। নাটকটির চরিত্রগুলি হল রমণীমোহন, বিজয়, কামিনী, তপস্বিনী প্রমুখ। এক রাজপরিবারের প্রণয় কাহিনিকে অবলম্বন করে এই নাটকটি রচনা করা হয়েছে এই নাটকটিতে হাস্যরসের পাশাপাশি লাভ করেছে বিজয় ও কামিনীর রোমান্টিক মিলন। 'লীলাবতী' নাটকটি একটি মিলনান্তক নাটক। জমিদার হরিবিলাসের পুত্র অরবিন্দ ও তার দুই কন্যা তারা ও লীলাবতীকে

কেন্দ্র করে কাহিনিটি তৈরি হয়েছে। সার্থক মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকটির সমাপ্তি ঘটে। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা শেষ নাটক 'কমলেকামিনী'। (১৮৭১) খ্রিস্টাব্দে ডাক বিভাগের কর্মী হয়ে তিনি যে মণিপুর ও কাছাড় পরিভ্রমণ করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতার ফসল হল 'কমলেকামিনী নাটক'। মনিপুরের সেনাপতি শিখণ্ডী বাহন নাটকের নায়ক ও ব্রহ্মরাজের কন্যা রণকল্যাণকে কেন্দ্র করে এই নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে। মণিপুরী সমাজের চিত্র অঙ্কনে পাশাপাশি দীনবন্ধু মিত্র খুব সুচারু রূপে বাঙালি জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

৫.৬.৪ কমেডি

কমেডি নাটক রচনায় দীনবন্ধু মিত্র দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও 'সধবার একাদশী' কমেডি দুটোতে মধুসূদনের প্রহসনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নাটকটি দুটি রচিত। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটকটিতে সামাজিক মানুষের ন্যায়-নীতি আচার-আচরণকে কষাঘাতে বিদ্ধ করা হয়েছে। কুলীন রাজীব লোচন বুড়ো বয়সে স্ত্রীকে হারিয়ে পুনরায় বিবাহের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। তার দুই কন্যা রাসমণি ও গৌরমনি বিধবা, এমত পরিস্থিতিতে রাজীবলোচন যুবক সেজে বিয়ে করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন। সমাজের এই অসঙ্গতিকে দীনবন্ধু মিত্র ব্যঙ্গের ছলে বিদ্ধ করেছেন।

দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকটি সামাজিক কমেডির অন্তর্ভুক্ত। সমকালের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের শিক্ষাভিমান চরিত্র বিকৃতি ফুটে উঠেছে 'সধবার একাদশী' নাটকটিতে। নাটকের মূল চরিত্র হল অটল, নিমচাঁদ, কুমুদিনী প্রমূখ। অটলের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বারবনিতা কাঞ্চনকে অটল রক্ষিতা হিসেবে রেখে দেয়। নিমচাঁদ অটলের মতো যুবকেরা মদ্যপানে আসক্ত হয়ে নানা উৎশৃঙ্খল খামখেয়ালিপনায় লিপ্ত হয়েছে। নাটকটিতে সমাজের একশ্রেণির যুবকদের পতনের ছবি যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি প্রথম থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের একটি সার্থক প্রহসন হল 'জামাই বারিক'। 'জামাই বারিক' প্রহসনে কলকাতার ধনী পরিবারের ঘরজামাই পোষাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। নাটকের মূল চরিত্র অভয় ব্যক্তিত্ববান পুরুষ চরিত্র হলেও অভয়ের বন্ধু পদ্মলোচন ছিল ব্যক্তিত্বহীন। স্ত্রীর অত্যাচার সে সহ্য করেছে কিন্তু প্রতিবাদ করেনি। শ্বশুর বাড়িতে পরাধীন থাকা জামাইয়ের অন্তর বেদনা নাট্যকার হাস্যরসের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

৫.৬.৫ নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর গুরুত্ব

- দীনবন্ধু নাটকে একদিকে ট্রাজেডির অশ্রু ও কমেডির হাস্যরস প্রাধান্য পেয়েছে।
- দীনবন্ধু মিত্রের নাটক রঙ্গালয়গুলির অস্তিত্ব রক্ষার্থে সহায়তা করেছিল।
- জগৎ ও জীবনের তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে সুচারু রূপে ফুটে উঠেছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে দীনবন্ধু মিত্রের ভূমিকা আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৫.৭ অমৃতলাল বসু

অমৃতলাল বসু ছিলেন গিরিশচন্দ্রের ভাবশিষ্য। গিরিশচন্দ্রের মতো ইনিও ছিলেন নট নাট্যকার ও রঙ্গমঞ্চ পরিচালক। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে অমৃতলাল দীর্ঘদিন কাটালেও নাট্যরচনার বিষয় নির্বাচনে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে অমৃতলালের গুরুতর পার্থক্য ছিল। গিরিশচন্দ্র মূলত উৎসাহ দেখিয়েছেন ভক্তিরস ও পুরাণরস সঞ্চারে; অমৃতলাল উৎসাহ দেখিয়েছেন ব্যঙ্গরস সঞ্চারে। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক রচনায় শ্রেষ্ঠ। অমৃতলাল পৌরাণিক নাটক রচনায় ব্যর্থ। গিরিশচন্দ্র প্রহসন জাতীয় নাটক রচনায় ব্যর্থ, অমৃতলাল প্রহসন জাতীয় নাটক রচনায় সার্থক। সমাজকে দেখার ব্যাপারে দু'জনের জীবন দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল।

৫.৭.১ নাটকের শ্রেণিবিভাগ

অমৃতলালের নাটকগুলিকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—

ক) সামাজিক নাটক: 'হীরকচূর্ণ' (১৮৭৫), 'তরুবালা' (১৮৯১), 'বিমাতা', 'আদর্শবন্ধু', 'খাসদখল (১৯১২), 'নবযৌবন' (১৯১৪)। সামাজিক অসঙ্গতি নিয়ে নাটকগুলি লেখা।

খ) ব্যঙ্গবিদ্রূপ মূলক প্রহসন: 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪), 'বাবু' (১৮৯৪), 'বৌমা' (১৮৯৭) 'গ্রাম্যবিভ্রাট' (১৮৯৮), 'সাবাশ আটাশ' (১৯০০) ইত্যাদি। এই শ্রেণির নাটক রচনায় তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বাঙালি সমাজের অসঙ্গতির দিকটিই এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে।

গ) পৌরাণিক নাটক: 'হরিশচন্দ্র' (১৮৯৯), 'যাজ্ঞসেনী' (১৯২৮) ইত্যাদি। এই শ্রেণির নাটক রচনায় অমৃতলাল সার্থক হতে পারেনি।

ঘ) পাশ্চাত্য রীতির প্রহসন: 'চোরের ওপর বাটপাড়ি' (১৮৭৬), 'চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে' (১৮৮৬), 'তাজ্জব ব্যাপার' (১৮৯০), 'কৃপণের ধন' (১৯০০), 'ব্যাপিকা বিদায়' (১৯২৬) ইত্যাদি।

৫.৭.২ নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

- চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে: 'Cox and Box' ও 'Box and cox' নামে দু'টি ইংরেজি প্রহসন অবলম্বন করে 'চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে' (১৮৮৬) রচনা করেন। বরের থেকে কনের বত্রিশ বছর তিন মাসের বড়ো উপাদানের মধ্যেই আছে হাস্যরস। প্রহসনটি একটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ।
- বিবাহ-বিভ্রাট: 'বিবাহ-বিভ্রাট' (১৮৮৪) প্রহসনে পণপ্রথার বিরুদ্ধচারণ করেছেন। এখানে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা বিরোধিতা করা হয়েছে। বরের বাবা গোপীনাথ প্রচার করেছে 'ভিক্ষার ঝুলি আছে, গলায় দেবার দড়ি আছে-সেও ভালো, কিন্তু কেউ যেন ছেলেমেয়ের

বিয়ে দিয়ে টাকা রোজগারের চেষ্টা না করে...।(২/৪)

- বৌমা: 'বৌমা' (১৮৯৭) প্রহসনে ব্রাহ্মসমাজের ভাই-বোনের সম্পর্ক, স্ত্রী শিক্ষার সমালোচনা করা হয়েছে। বৌমা, হিড়িম্বা, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি চরিত্র প্রহসনের উপযুক্ত। নাট্যকার এটিকে 'নক্সা' বলে অভিহিত করেছেন।
- খাসদখল: 'খাসদখল' (১৯১২) প্রহসনটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল একসময়। এই প্রহসনের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলো হল লোকেনবাবু, মোক্ষদা গিরিবালা ইত্যাদি। সমকালের শিক্ষিতা স্ত্রীর প্রতিনিধি মোক্ষদা। 'খাসদখল' সমকালীন জীবনেরই ছবি। প্রহসনের পনেরটি সঙ্গীতই শিল্প-তাৎপর্য লাভ করেছে।

৫.৭.৩ নাট্যগুরুত্ব

বাঙালি চরিত্রের অসংগতি, সাহেব বাঙালি, ফিরিঙ্গি ভাবাপন্ন শিক্ষিতা বাঙালি নারী, পুত্রের বিবাহে পণলোভী বাঙালি, ভোটদ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত বাঙালি, চাকুরি লোভী ও আত্মসম্মান ত্যাগী বাঙালি, ভণ্ড দেশহিতৈষী বাঙালি, উপাধিলোলুপ বাঙালি, বকধার্মিক বাঙালি ইত্যাদি আদর্শভ্রষ্ট নকল নবিস বাঙালিকে আত্মস্থ কবিরার সাধনাকেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

৫.৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমসাময়িককালে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের রূপ ও রীতিকে অবলম্বন করে ইতিহাস, দেশাত্মবোধ ও সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে নাটক লেখেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)। তাঁর নাটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো হল-

ক) ইতিহাস আশ্রয়ী নাটক লেখার প্রবণতা।

খ) দেশপ্রেমের আবেগকে নাটকে সঞ্চারিত করার ক্ষমতা।

গ) সমাজ-জীবনকে ব্যঙ্গ করে প্রহসনমূলক নাটক লেখার প্রয়াস।

ঘ) নাটকে অনুবাদের পুরানো ঐতিহ্যকে বজায় রাখার চেষ্টা।

ঙ) প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শকে অনুসরণ করা।

বিভিন্ন ধরনের নাটক: স্ত্রী স্বাধীনতাকে ব্যঙ্গ করে তিনি তাঁর প্রথম প্রহসনমূলক নাটক 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২) লেখেন। এই নাটকে ত্রুটি থাকলেও 'অলীকবাবু' (১৮৭৭) তাঁর লেখা প্রথম সার্থক প্রহসন যা স্বচ্ছভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ফরাসি প্রহসনকার মলিয়রের লঘু হাস্যাত্মক নাটককে কেন্দ্র করে তিনি লেখেন 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৯০২)। তাঁর 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬) এবং 'এমন কর্ম আর করব না' (১৮৭৭) প্রহসন দুটি জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অনুবাদমূলক নাটকগুলির মধ্যে বিখ্যাত হল 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' (১৮৯৯), 'উত্তররচিত' (১৯০০), 'মালতী মাধব' (১৯০১), 'রত্নাবলী' (১৯০০), 'মৃচ্ছকটিক' (১৯০১), 'মুদ্রারাক্ষস' (১৯০১),

'বিক্রমোর্বশী' (১৯০১) ইত্যাদি। তিনি সিকন্দর ও পুরুর সংগ্রামকে বিষয় করে 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণকে কেন্দ্র করে 'সরোজিনী' সেলিম ও অশ্রুমতীর প্রেম ও রাজপুতদের বীরত্বকে কেন্দ্র করে 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯), দেশপ্রেমের আবেগকে কেন্দ্র করে 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) নাটক রচনা করেন। এগুলা তাঁর মৌলিক নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রহসন 'অলীকবাবু', 'শ্রেষ্ঠ অনুবাদমূলক নাটক হল 'উত্তরচরিত' এবং শ্রেষ্ঠ মৌলিক নাটক হল 'অশ্রুমতী'।

৫.৮.১ নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গুরুত্ব

বাংলা নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গুরুত্ব অপরিসীম।

১। জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক রচনা করে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন।

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'বাংলা নাটক রচনার মধ্যযুগে বাস্তব জগৎ ও প্রত্যক্ষ জীবন পরিত্যাগ করিয়া ইহার মধ্যে যে আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার একজন প্রথম পূজারি।'

৩। উনিশ শতকের তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

৪। তিনি বলেছেন, 'হিন্দু মেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইতো কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উন্মোচিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনি কীর্তন করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।'

৫.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ

বাংলা নাটকের পূর্বসূত্র থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে রঙ্গমঞ্চ, বিদেশি নাট্যশালার মধ্য দিয়ে নাটকের ধারার অগ্রগতি চলতে থাকে। এরপর সংস্কৃত নাটক, অনুবাদ নাটকের মধ্যে দিয়ে মৌলিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটকের বিকাশ ঘটতে থাকে। নাট্যব্যক্তিত্বের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসুর অবদান এবং তাঁদের রচনার বিবরণ এবং নাট্যসাহিত্যে তাঁদের গুরুত্বের বিবরণ অধ্যায়টিতে বর্ণিত হয়েছে।



৫.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টিতে আমরা বাংলা নাটকের পূর্বসূত্র সম্পর্কে জানতে পারি।

- এই অধ্যায়টিতে বাংলা নাটকের অগ্রগতির পশ্চাতে যেসব নাট্যশালার গুরুত্ব রয়েছে তার ইতিহাস জানতে পারি।
- বাংলা নাটকের অগ্রগতির ক্ষেত্রে যেসব নাট্যকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ তাঁদের সম্পর্কে জানতে পারি।

৫.১১ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। উনিশ শতকের প্রথম দিকেই বাংলার বুকে নানান বিদেশি রঙ্গালয়ে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন নাটকের অভিনয় দেখে বাঙালি নাট্যচর্চার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। ...বিদেশী রঙ্গালয়: ওল্ড প্লে হাউস: ... দি নিউ হাউস... শখের নাট্যশালা: ...হিন্দু থিয়েটার... বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ ... এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৫.৩.১, ৫.৩.২ ও ৫.৩.৩ অংশ)

২। বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে রামনারায়ণ তর্করত্নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি বেশ কিছু নাটক রচনা করেছেন বিশেষ করে সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ ও প্রহসন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ...বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব এর পূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন এবং বাংলা নাটকের ভিত্তি প্রস্তুত করবার ক্ষেত্রে রামনারায়ণ তর্করত্নের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৫.৪.১ অংশ)

৩। মধুসূদনের পর বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র।... দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে... দীনবন্ধু মিত্রের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ নাটক 'নীলদর্পণ' এই নাটকটি দীনবন্ধু মিত্রকে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। ... দীনবন্ধু মিত্র সমাজের গভীর সমস্যা নিয়ে নাটক লেখার পর রোমান্টিক নাটক লেখায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন ...কমেডি নাটক রচনায় দীনবন্ধু মিত্র দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।... এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৫.৬ অংশ)

৫.১২ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- ঘোষ, অজিতকুমার (১৩৬২ বাংলা); বাংলা নাটকের ইতিহাস; কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টারস অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
- চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল; (১৪১৮ বঙ্গাব্দ) সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা: রত্নাবলী
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (আগস্ট, ২০১৭): কলকাতা-০৯ প্রজ্ঞাবিকাশ,
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮) বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা, কলকাতা: তুলসী প্রকাশন
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (২০১৬-২০১৭) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত: কলকাতা-০৭৩, মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড



৫.১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা নাটকের পূর্বসূত্র সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করুন।

৪। বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে রামনারায়ণ তর্করত্নের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৫। বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে দীনবন্ধু মিত্রের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৬। বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে অমৃতলাল বসুর ভূমিকা আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ৬ : আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য-১

বিন্যাস ক্রম

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৬.২ পরিচিতি
৬.৩ বাংলা কথাসাহিত্যের পূর্বকথা
৬.৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬.৫ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
৬.৬ রমেশচন্দ্র দত্ত
৬.৭ স্বর্ণকুমারী দেবী
৬.৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ
৬.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে কী শিখলাম
৬.১১ অতিরিক্ত পঠন
৬.১২ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৬.১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী-

- বাংলা কথাসাহিত্যের পূর্বকথা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।
- বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, মীর মোশারফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

৬.২ পরিচিতি

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস ও ছোটগল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। বিশেষত, উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপকরণের ছোঁয়ায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল। এর পূর্বে অর্থাৎ মধ্যযুগের সাহিত্যে মানবজীবনের মাধ্যমে দেবলীলা ও দেবমহিমা বর্ণনাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু উনিশ শতকে, অর্থাৎ ইংরেজ শাসনকালে, বাঙালি জাতি ভারতবর্ষের বাইরেও যে আরো বিস্ময়কর দেশ ও দ্বীপ তার সন্ধান পেলো। এ সম্পর্কে ড° অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "ইংরেজি ভাষার মারফতে বাঙালি সর্বপ্রথম এই বিচিত্র দুনিয়ার পরিচয় পেল, স্বাদ পেল ইংরেজি সাহিত্যের"। যার ফলে মধ্যযুগের দেবমহিমা বর্ণনা ছেড়ে, বাংলার সাহিত্যিকগণ মাটির গন্ধমাখা বাস্তব পৃথিবীবাসী মানবজীবনের কাহিনি বর্ণনায়

সচেষ্ট হলেন। যেখানে দেবদেবীর মহিমার স্থলে, মানব জীবনের দুঃখ, যাতনা ও বিপর্যয়ের চিত্র প্রতিফলিত হল। তবে দেবমহিমা যে সাহিত্য থেকে একেবারে মুছে গেল তা নয়। মাইকেল, হেমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যকারের রচনায় দেব চরিত্র নতুন রূপে প্রতিভাত হল। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধের কথা উল্লেখযোগ্য। সেখানে প্রাবন্ধিক কৃষ্ণ চরিত্রে দৈব গুণের চেয়ে অধিক মানবিক গুণের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এইভাবে সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনায় প্রকাশভঙ্গিতেও বদল ঘটে। পূর্বযুগে বাংলা সাহিত্যের মাধ্যম ছিল পদ্য, আধুনিক যুগে তা হল গদ্য। মধ্যযুগের সাহিত্যের আবেগের স্থলে, আধুনিক যুগের সাহিত্যে এল যুক্তি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রাধান্য। কারণ এযুগের সাহিত্যের প্রধান উপকরণ হচ্ছে চির ধূলিমলিন মাটির গন্ধ মেশা বাস্তব জীবন, যা অজস্র ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত। ফলে সেই প্রতিঘাত প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে গদ্যভাষা, যা নিত্য দিনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। মূলত উনিশ শতকের বাঙালির জীবন ও চিন্তা ধারায় নবদিগন্তের সঞ্চারে বাংলা গদ্যের ভূমিকা অপরিসীম। যার ফলে বাঙালির মনন সমৃদ্ধ হয়েছে এবং নব সাহিত্য প্রকরণ কথাসাহিত্য ও নাটকের উদ্ভব হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী, উনিশ শতকে হচ্ছে আধুনিক যুগের জন্মলগ্নের কাল। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যের বিকাশের ধারা লক্ষিত হয়। যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসহ সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে প্রাবন্ধিক অক্ষয়কুমার দত্তের বিশিষ্ট অবদান লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, উপন্যাস ও ছোটগল্প-কথাসাহিত্যের অন্যতম দুইটি বিশিষ্ট প্রকরণের বিকাশ পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে অনুপ্রাণিত। তবে গল্প বলা ও শোনার চর্চা ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় উপনিষদ, বৃহৎকথা ও কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থে। উপন্যাসের উৎপত্তি সম্পর্কে তপনকুমার চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন,'চতুর্দশ শতকে ইতালিতে বোকাচিও উপন্যাসধর্মী যে আখ্যান লেখেন তা Novella নামে পরিচিত। এই Novella বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালে উপন্যাসের জন্ম হয়েছে'। রিচার্ডসন, ডিফো প্রমুখেরা পাশ্চাত্য সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাসের সূচনা করেন। যেখানে গদ্যের আকারে, জীবনের সামগ্রিক রূপের বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়। উপন্যাসের মূল শর্ত হচ্ছে বাস্তব সমাজবাসী রক্তমাংসের মানুষের জীবনের বিপর্যয়ের কথা ও সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের দিকটিও স্থান পাবে।

৬.৩ বাংলা কথাসাহিত্যের পূর্বকথা

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ উপন্যাস উন্মেষের কাল। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক ঔপন্যাসিকেরা বিভিন্ন বিচিত্র শ্রেণির উপন্যাস সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। উপন্যাস, ইংরেজিতে যাকে Novel বলা হয়, তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, বাস্তবজীবনের সামগ্রিক রূপ। ঔপন্যাসিক নিজ বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞানের সমন্বয়ে, উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণ করেন। সেই কারণেই উপন্যাস নতুন শিল্পরূপে সমাদৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে ড. দেবেশকুমার আচার্য্য তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের

ইতিহাস: আধুনিক যুগ' গ্রন্থে জানিয়েছেন— "আধুনিক জীবনের মৌল লক্ষণ হল আত্মসচেতনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ যা ইউরোপে তীব্রতর হয়েছিল ফরাসী বিপ্লব থেকে, উপন্যাস তার সহযাত্রী হলো।" সমকালীন বাস্তব জীবন সম্বন্ধে তীব্র আগ্রহী হচ্ছে বাংলা উপন্যাস জন্মের প্রাথমিক শর্ত। এই বাস্তব জীবনবোধ থেকে জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করার ইচ্ছা মানুষের মধ্যে জেগে উঠেছিল।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস জাতীয় রচনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ছদ্মনামে ইংরেজি সাহিত্যের সমাজবাস্তবতা ও সামাজিক ব্যঙ্গ অনুসারে লিখেছেন 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস' নামক নকশা জাতীয় রচনা। যদিও সেগুলির মধ্যে ঘটনা বা চরিত্রের ততটা বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়নি। এছাড়া 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' নামে প্রথম পারিবারিক উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছিলেন হ্যানা ক্যাথরীন মুলেন্স। তবে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ উপন্যাস গুণ লক্ষ করা যায়, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) নামের নক্শা জাতীয় রচনায়। এ সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'আলালের ঘরের দুলাল'ই বোধ হয় বঙ্গভষার প্রথম সম্পূর্ণাবয়ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস'। এ প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র নামও উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতি রয়েছে। এছাড়া ইতিহাস নির্ভর উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থ দুটির নাম 'সফলস্বপ্ন' (উৎস— কন্টারের 'The Traveller's Dream') এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (উৎস 'The Marhatta Chief')।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। বাংলা কথা সাহিত্যর পূর্বকথা বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৬.৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে যথার্থ উপন্যাস সৃষ্টি করেছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এপ্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন-"বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন"। তিনি সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে বিভিন্নধারার উপন্যাস সৃষ্টি করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজ সৃষ্টি ক্ষমতা গুণে ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের আদর্শকে অঙ্গীভূত করে, সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করেছিলেন। যার ফলে তিনি যুগান্তকারী স্রষ্টারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত মাসিকপত্র 'বঙ্গদর্শন', সমগ্র বাঙালিজাতির চিত্তদর্পণ রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। যদিও তাঁর প্রথম উপন্যাস 'Rajmohan's wife' (১৮৬৪) ইংরেজি ভাষাতে 'Indian Field' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটির কাহিনি আধুনিক বাঙালি পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল। শেষাংশটি পরবর্তীকালে, তাঁর পুত্র সম শচীশচন্দ্র সম্পূর্ণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত উপন্যাসগুলিকে বিষয়গত বিভেদ অনুসারে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম বিভাগে রয়েছে ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স যথা— 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫),

'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'যুগলাঙ্গরীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাজসিংহ' (১৮৮২), 'সীতারাম' (১৮৮৭)। দ্বিতীয় বিভাগে রয়েছে দেশ প্রেমমূলক উপন্যাস- 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪)। তৃতীয় বিভাগে রয়েছে সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস— 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'রাধারাণী' (১৮৭৬), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)। ইতিহাস আশ্রয়ী রোমান্স শ্রেণির উপন্যাস: এই শ্রেণির উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের নিরস তত্ত্বের মধ্যে জীবন রস ছড়িয়ে দিয়ে কল্পনা শক্তির মাধ্যমে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। তার প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে উড়িষ্যার অধিকার নিয়ে মোগল-পাঠানের যুদ্ধ কাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল। উপন্যাসে প্রতিফলিত চরিত্রগুলি যথা জগৎ সিংহ, বীরেন্দ্রসিংহ, ইতিহাসের চরিত্র হলেও, সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নয়। এছাড়া ঔপন্যাসিক কিছু কিছু কল্পিত চরিত্রও সংযোজন করেছেন। মূলত যুগযুগ ধরে চলে আসা কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করাই ছিল এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'য় অধিক রোমান্সের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায় অরণ্যকন্যা কপালকুণ্ডলা, ভাগ্যচক্রে সামাজিক জীবন ও বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়ে, কিন্তু নিয়তি নিষ্ঠুর পরিহাস তাকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিল এবং কীভাবে স্বামী নবকুমার নিজের অজান্তে সেই দুর্গতিকে বেগবান করে তুলেছিল, তারই চিত্তাকর্ষক চিত্র বর্ণিত হয়েছে। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে সপ্তদশ মুসলমান সৈন্যের বাংলা বিজয়ের কাহিনির সূত্রে মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের প্রেম কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তবে মনোরমা ও পশুপতির কাহিনি অধিক চিত্তাকর্ষক হয়েছে। পরবর্তী উপন্যাস 'যুগলাঙ্গরীয়' চরিত্র চিত্রণ অতটা উল্লেখযোগ্য হয়নি। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কাহিনি কিছুটা ঐতিহাসিক, কিছুটা কাল্পনিক। 'রাজসিংহ' হচ্ছে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। কারণ রাজস্থানের চঞ্চল কুমারীকে ঔরঙ্গজেবের বিবাহের ইচ্ছা এবং এই ঘটনাসূত্রে রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ এবং রাজসিংহের জয় এবং পরিণতিতে চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে বিবাহ-প্রভৃতি ঘটনার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এর সঙ্গে কিছু কাল্পনিক কাহিনিও পাওয়া যায়।

দেশ প্রেমমূলক উপন্যাস : এই শ্রেণির উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ছিয়াত্তরের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে সংযোজিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের সন্নাসী বিদ্রোহের ইতিহাস। দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে প্রাচীন বাংলার সমাজ ও পারিবারিক একটি মনোরম গার্হস্থ্য কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে, যার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে গীতার তত্ত্বে তাত্ত্বিক বঙ্কিম এর এক ধরনের সূক্ষ্ম ধর্মীয় অনুভূতি ও হিন্দু সামাজিক আচার-আচরণ ঘটিত তত্ত্বকথা।

সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস: এই শ্রেণিতে রয়েছে 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাধারাণী' উপন্যাস। এর মধ্যে 'ইন্দিরা' ও 'রাধারাণী' উপন্যাসের কাহিনি অত্যন্ত সহজ, সরল এবং সরস ভাবে পরিবেশিত হয়েছে। যদিও আকৃতির দিকে এই দুটি কাহিনি বড় গল্পের ন্যায় উপন্যাসের পূর্ণতা লাভ করেনি। তবে যে তিনটি উপন্যাস তাঁর প্রতিভা বিকশিত করেছিল সেগুলো হচ্ছে, 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'রজনী'। এই তিনটি উপন্যাসের মূল বিষয় হচ্ছে নরনারীর আদিম সম্পর্কের জটিলতা। চিত্তবাসনার দমনে ব্যর্থ নরনারীর জীবনের নির্মম পরিণতির জীবন্ত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এই উপন্যাসগুলোতে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব নিরূপণ করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৬.৫ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্য জগতে উদ্ভট ও হাস্যরসের গল্প রচয়িতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর রচনায় কোনো গভীর তত্ত্বের উল্লেখ ছিল না, শিশুসুলভ অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য কৌতুহল ও কৌতুক রস অবলম্বন করে অসাধারণ গল্প লেখার ক্ষমতা ছিল। ড° অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে— "ত্রৈলোক্যনাথের রচনায়, বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে, স্বপ্ন ও বাস্তব, ভূত ও অদ্ভুত, কায়া ও ছায়া মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।" তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা পাঁচটি যথাক্রমে— 'কঙ্কাবতী' (১২৯৯), 'সেকালের কথা' (১৩০১), 'ফোকলা দিগম্বর' (১৩০৭), 'ময়না কোথায়' (১৩১১), 'পাপের পরিণাম' (১৩১৫)। রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাত কুমারের সমসাময়িক কালে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েও, ত্রৈলোক্যনাথ, নিজস্বতা ধরে রেখেছিলেন। তাঁর সাহিত্যের কুশিলবরা হচ্ছে ভূত-প্রেত-রাক্ষস-খোক্কস- ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি রূপকথার জগতবাসী। পাঁচটি উপন্যাসের মধ্যে কঙ্কাবতী হচ্ছে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। উপন্যাসটি বাস্তব ও কল্পনার মিশ্র উপাদান রচিত হয়েছে। উপন্যাসের আখ্যানে কল্পনা মুখ্য হলেও গল্পরস আকর্ষণীয়। বাংলার রূপকথা ও লোককথার উপাদানকে লেখক তাঁর উপন্যাসে অঙ্গীভূত করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথের গল্প সংকলন গ্রন্থ চারটি— 'ভুত ও মানুষ' (১৮৯৭), 'মুক্তামালা' (১৯০৪), 'মজারগল্প' (১৯০৪), 'ডমরুচরিত' (১৯২৩)। প্রতিটি সংকলনগ্রন্থে মোট গল্পের সংখ্যা ত্রিশ। গল্পগুলির সম্বন্ধে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে জানিয়েছেন— "ত্রৈলোক্যনাথের মানবতাবাদের যুক্তিধর্মিতা, পরার্থপরতা, দেশহিতৈষিতা ও মানবমুখীনতার পরিচয় তাঁর গল্পে ছড়ানো আছে। সমাজ সংস্কারকের সচেতনতাও মানব প্রেমিকের সীমাহীনদরদ তাঁর গল্পে উপস্থিত"। পরিশেষে বলা যায়, রূপকথার বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করলেও সৃষ্টি নৈপুণ্যের গুণে তিনি একজন যর্থাথ শিল্পী।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতির পরিচয় দিন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৬.৬ রমেশচন্দ্র দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, উপন্যাস রচনায় ব্রতী সাহিত্যিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। পেশাগত দিক থেকে তিনি ছিলেন একজন রাজকর্মচারী, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদ। তিনি বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কল্পনা শক্তি না থাকলেও, ঐতিহাসিকের পূর্ণদৃষ্টি ছিল। ইতিহাস

নির্ভর উপন্যাস রচনায়, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, সত্যের প্রতি অসীম আগ্রহ। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। উক্ত উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপাদান হচ্ছে, বাংলাদেশের মুঘল সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তা টোডরমলের বিরুদ্ধে জমিদার অমর সিং এর বিদ্রোহ। এখানে ঔপন্যাসিক ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করতে পারলেও ইতিহাস ও মানবজীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক রচনা করে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেননি। ঐতিহাসিক পটভূমি ও ব্যক্তিগত জীবনে মধ্যে মিল না থাকায় প্রাণময় হয়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কন' প্রকাশিত হয়, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে। এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকাল। উপন্যাসে দেখা যায়, নায়ক জমিদার পুত্র নরেন্দ্রনাথ কর্মচারীর চক্রান্তে জমিদারি হারিয়ে ও কর্মচারী কন্যা হেমলতার প্রণয়ের ব্যর্থ হয়ে দেশ ছেড়ে রাজমহলে সাহস রোজার দরবারে উপস্থিত হয় ও শাহজাহান রাজত্বের শেষে পুত্রদের মধ্যে যে তুমুল দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। অবশ্যই ইতিহাস চক্রে ঘূর্ণিত হওয়ার পর থেকে তার ব্যক্তিগত জীবন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এই উপন্যাস সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন— "যদিও এটি মূলত একটি পারিবারিক উপন্যাস; ইতিহাস ইহার অপ্রধান অংশ"। কারণ নরেন্দ্র সমকালের রাজনৈতিক আদর্শের ঘূর্ণিজালে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি। এই উপন্যাসে পাওয়া গেছে ঐতিহাসিক ঘটনার বাস্তব জীবনচিত্র। চরিত্র চিত্রণেও ঔপন্যাসিক যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পরবর্তী উপন্যাস 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসের মূল বিষয় হচ্ছে, ঔরঙ্গজেবের শাসন কালে শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র শক্তির উত্থান এবং মুঘল রাজ্যের বিরুদ্ধে শিবাজীর স্বাধীনতা সংগ্রাম। উপন্যাসটির চরিত্র চিত্রণে ঔপন্যাসিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এর পরবর্তী উপন্যাস 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'য় —জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, রাজপুত ও মুঘলদের মাঝে সংগ্রাম কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তাঁর দুটি সামাজিক উপন্যাস সমাজ ও সংসার রচিত হয়েছিল গ্রাম্য পরিবেশের বাস্তব কাহিনি অবলম্বনে। পরিশেষে বলা যায়, ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৪। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় রমেশচন্দ্রের অবদান তুলে ধরুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৬.৭ স্বর্ণকুমারী দেবী

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলা সাহিত্যে যে সকল প্রতিভাময়ী লেখিকার আবির্ভাব হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম নক্ষত্র স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার, সাংবাদিক ও সমাজকর্মী। তিনিই ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহিত্যিক। স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৫৫ সালের ২৮শে আগষ্ট কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ

করেন। তিনি ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রী এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা। তিনি তার অনুজ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। তার তিন দিদির নাম: সৌদামিনী, সুকুমারী ও শরৎকুমারী।

স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয় অন্তঃপুরে তিন বছর বয়স থেকে। তাঁর 'স্মৃতিকথা' থেকে জানা যায়, তাঁদের শিক্ষয়িত্রী শ্লেটে লিখে দিতেন এবং সেখান থেকে তারা লিখতেন। পরবর্তীতে তার পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অযোধ্যানাথ পাকড়াশি নামে এক দক্ষ শিক্ষককে নিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে স্বর্ণকুমারী দেবী নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত হয়ে উঠেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ প্রভৃতি সব বিষয়েই তাঁর জ্ঞান ছিল অসামান্য। তিনি ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই নভেম্বর নদিয়া জেলার এক জমিদার পরিবারের শিক্ষিত সন্তান জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে মাত্র বারো বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরবর্তীকালে জানকীনাথ ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করে 'রাজা' উপাধি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন একজন দিব্যজ্ঞানবাদী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। জানকীনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবীর তিন সন্তান যথা-হিরন্ময়ী দেবী, জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল ও সরলা দেবী। সাহিত্যের বহু শাখাতে স্বর্ণকুমারী দেবীর ছিল স্বচ্ছন্দ পদচারণা। সংগীত, নাটক ও সাহিত্যে ঠাকুরবাড়ির পুরুষ সদস্যদের সৃষ্টিশীলতা তাঁকে স্পর্শ করেছিল। স্বর্ণকুমারী দেবী একাধিক উপন্যাস, নাটক, কবিতা ও বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-পরিভাষা রচনার বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন। বিয়ের আগে থেকেই তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়। বিয়ের পর স্বামীর উৎসাহে তিনি পুনরায় সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন। তাঁর নিজস্ব জীবনের বিকাশে স্বামীর সহায়তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন— "আমার প্রিয়তম স্বামীর সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতিরেকে আমার পক্ষে এতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইতো না। আজ বহির্জগত আমাকে যেভাবে দেখিতে পাইতেছে, তিনিই আমাকে সেইভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেমপূর্ণ উপদেশে বা ঝটিকা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রেও যেমন সন্তরণ নিপুণ ব্যক্তি সহজে ও অবলীলাক্রমে সন্তরণ করিয়া যায়, সাহিত্যজীবনের ঝটিকাময় ও উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়া আমিও সেইরূপ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিয়াছি।'

যদিও তিনি ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত তবুও নাটক, প্রহসন, গীতিকবিতা, গান, প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় মেলে। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। টডের ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও অনেক ক্ষেত্রে তিনি মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ'। পৃথ্বীরাজ ও মহম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষ কাহিনি নিয়ে এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি রচিত। টডের গ্রন্থ থেকে তিনি এই উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, এই উপন্যাসে স্বদেশানুরাগের গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫২ সালে হানা ক্যাথরিন মুলেন্স তাঁর 'ফুলমণি ও করুণার' বৃতান্ত প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় প্রথম ঔপন্যাসিকের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবীই ছিলেন প্রথম বাঙালি মহিলা ঔপন্যাসিক। স্বর্ণকুমারী দেবীর অনেক বই 'দীপ নির্বাণ রচয়িত্রী' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ মালতী ও গল্পগুচ্ছ। 'নবকাহিনী' তাঁর অপর গল্পগ্রন্থ। স্বর্ণকুমারীর ছোটগল্পগুলির বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে সার্থক চরিত্র চিত্রণে ও ঘটনা বিন্যাসে এবং বর্ণনাভঙ্গির দিক থেকে সার্থক। ছোটগল্পে সমাজে যারা অবহেলিত অবজ্ঞাত তাদের বেদনা সার্থক রূপ পেয়েছে এবং নারী চরিত্রগুলিও স্বমহিমায় ফুটে উঠেছে। রাজনীতির আঙিনায় স্বর্ণকুমারী দেবীর উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর স্বামী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেক্রেটারি ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী নিজেকে শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ভারতের পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হবার প্রয়াস ছিল তাঁর। ১৮৮৯ ও ১৮৯০ সালে পণ্ডিত রামাবাই, রামাবাই রানাডে ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনিও জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে অংশ নেন। তিনিই ছিলেন প্রথম মহিলা যিনি জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উনিশতম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। আবার মাদাম ব্লাভাটস্কির দলভঙ্গের পরে 'সখিসমিতি' নামে স্বর্ণকুমারী মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। 'সখিসমিতি' স্থাপিত হয়েছিল ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে। এর উদ্দেশ্য ছিল- 'মেয়েতে মেয়েতে আলাপ পরিচয়, দেখাশোনা, মেলামেশা স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার ও উন্নতির চেষ্টা, বিধবা রমণীকে সাহায্য করা, অনাথকে আশ্রয়দান ইত্যাদি।' তাঁর অনেক জনহিতকর কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'মহিলা শিল্পমেলা'। বঙ্গদেশ, বোম্বাই, আগ্রা, জয়পুর, কানপুর থেকেও এই শিল্পমেলায় বহু শিল্পজাত দ্রব্য আসতো। এই শিল্পমেলা প্রসঙ্গে তাঁর 'বিধবা শিল্পাশ্রম' গঠন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস— (১) 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬), (২) 'মিবার-রাজ' (১৮৭৭), (৩) 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯), (৪) 'মালতী' (১৮৭৯), (৫) 'হুগলীর ইমামবাড়ী' (১৮৮৭), (৬) 'বিদ্রোহ' (১৮৯০), (৭) 'স্নেহলতা' (১৮৯২), (৮) 'কাহাকে' (১৮৯৮), (৯) 'ফুলের মালা' (১৮৯৫), (১০) 'বিচিত্রা' (১৯২০), (১১) 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১), (১২) 'মিলনরাতি' (১৯২৫), (১৩) 'সাব্বিরের দিন রাত' (১৯১২)।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ— (১) 'নবকাহিনি' (১৮৯২), (২) 'গল্পস্বল্প' (১৮৯৩)।

১৯২৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণকুমারী দেবীকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯২৯ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী উনিশ শতকের সমাজসচেতনতার ক্ষেত্রে একজন অসামান্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯৩২ খ্রিঃ ৩রা জুলাই মারা যান।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৫। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিভা আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৬.৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অপরিসীম। সাহিত্যের প্রতিটি শাখাকে তিনি নিজ সৃষ্টি প্রতিভায় সমৃদ্ধ করেছেন। উপন্যাস রচনায় তিনি বিশিষ্ট শিল্পরূপের পরিচয় দিয়েছেন। মূলত তাঁর উপন্যাসের পটভূমিতে অন্তরজগৎ ও বহির্জগৎ দুটিই অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। বিশেষত বাংলা উপন্যাসের পালাবদলের ক্ষেত্রে স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'করুণা' ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটি তার কিশোর বয়সের রচনা, সেখানে আবেগের আতিশয্য ছিল অধিক। যদিও প্রথম অবস্থায় তিনি বঙ্কিমের আদর্শে, ইতিহাস নির্ভর উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেগুলির মূল লক্ষ্য ছিল বাস্তব মানবজীবন। বিষয়বৈচিত্র্য অনুসারে রবীন্দ্র উপন্যাসগুলিকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—

১। ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস: 'বউ ঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭)।

২। সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস: 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯), 'গোরা' (১৯১০), 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)।

৩। চেতনাশ্রয়ী উপন্যাস: 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬)।

৪। কাব্যোপন্যাস: 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'দুইবোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪)।

'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনুকরণে রচিত হয়েছিল। তবে এখানে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের চেয়ে, মানব জীবনের উপরে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। 'রাজর্ষি' উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে ত্রিপুরা রাজবংশের কাহিনি অবলম্বনে। এখানে প্রথা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে, মানবধর্মে জয় ঘোষিত হয়েছে। তাঁর 'চোখের বালি' উপন্যাসের সূত্রে বাংলা সাহিত্যে প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের সূচনা হল। মহেন্দ্র-বিনোদিনী-আশা-বিহারীর চিত্তচাঞ্চল্যের দোলাচলতার নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'গোরা' উপন্যাসে কলকাতায় পটভূমিতে,স্বাদেশিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। নায়ক গোরা, যার হিন্দু হিসেবে প্রখর জাত্যাভিমান ছিল। সেই পরে জানতে পারে যে সে আইরিশ বংশের সন্তান, তখনই তার উপলব্ধি ঘটে যে মানবিকতার চেয়ে জাতি বড় নয়। মানবধর্মই হচ্ছে প্রধান। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার জলন্ত স্বাক্ষর বহন করছে, 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' নামের দুটি উপন্যাস। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপ এর ত্রিকোণ কাহিনি মনস্তত্ত্বের আকর্ষণ বিকর্ষণের সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসেও স্বদেশচেতনার আড়ালে নরনারীর প্রেমের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে অখণ্ড জীবনের চার অঙ্গের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটিতে রোমান্টিক কবিকল্পনায় প্রেমের সূক্ষ্ম গতিপ্রকৃতি পরিচয় ফুটে উঠেছে। পরিশেষে বলা যায়, রবীন্দ্র উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ শিল্পরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

ছোট গল্প রচনায়, রবীন্দ্রনাথ অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মূলত: বাংলা ছোটগল্পের তিনিই ছিলেন স্রষ্টা। তাঁর সর্বমোট ছোটগল্পের সংখ্যা ৯১টি, সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তার মধ্যে 'গল্পগুচ্ছ', 'তিনসঙ্গী' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখযোগ্য। গল্পগুলিকে যুগবিভাগ দেখানো হলো — ১৮৯১ থেকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকার যুগ।

এই যুগের গল্পে জীবন সম্পর্কে বিচিত্র অনুভূতি, রোমান্টিকতা ও নিসর্গপ্রেম প্রাধান্য পেয়েছে। এই পর্বের কয়েকটি গল্প হল— 'পোস্টমাস্টার' (১২৯৮), 'গিন্নি' (হিতবাদী) 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'একরাত্রি' (সাধনা) ইত্যাদি।

১৯১৪ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'ভারতী' ও 'সবুজপত্র' পত্রিকার সময়কাল। এই পর্বের গল্পগুলোতে যুক্তি, মনন, নারীর অধিকার ও বুদ্ধিবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। এই পর্বের কয়েকটি গল্প হল— 'ঘাটের কথা' (১২৯১), 'দৃষ্টিদান' (১৩০৫), (ভারতী) এবং 'স্ত্রীরপত্র' (১৩২১), 'অপরিচিতা' (১৩২১), (সবুজপত্র) ইত্যাদি। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'তিনসঙ্গী'র যুগ। এই পর্বের গল্পগুলিতে মানবমনের মনন অনুভূতি প্রাধান্য লাভ করেছে। এই পর্বের কয়েকটি গল্প হল— 'রবিবার' (১৩৪৬), 'শেষকথা' (১৩৪৭) ইত্যাদি।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৬। বাংলা কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতিত্ব আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৬.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ

অধ্যায়টিতে বাংলা কথাসাহিত্যের পূর্বসূত্র আলোচনার পাশাপাশি বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম পুরোধা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাকর্ম এবং তাঁদের বিভিন্ন রচনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।



৬.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- বাংলা কথাসাহিত্যের পূর্বকথা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারলাম।
- বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম কথাসাহিত্যিক তথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, মীর মোশারফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারলাম।



৬.১১ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৪, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মে ২০১২) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ); কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (প্রথম প্রকাশ, ১৪০২, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪২৯); সাহিত্য প্রকরণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

● মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, একাদশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪); সাহিত্য টীকা; কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ



৬.১২ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ উপন্যাস উন্মেষের কাল। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক ঔপন্যাসিকরা বিভিন্ন বিচিত্র শ্রেণির উপন্যাস সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস জাতীয় রচনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ...এ প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র নামও উল্লেখযোগ্য। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য : ৬.৩ অংশ)

২। তিনি সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে বিভিন্নধারার উপন্যাস সৃষ্টি করলেন। ...বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত উপন্যাসগুলিকে বিষয় গত বিভেদ অনুসারে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য : ৬.৪ অংশ)

৩। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্য জগতে উদ্ভট ও হাস্যরসের গল্প রচয়িতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। ... রচিত উপন্যাসের সংখ্যা পাঁচটি- ...বাংলার রূপকথা ও লোককথার উপাদানকে লেখক তাঁর উপন্যাসে অঙ্গীভূত করেছেন।... ত্রৈলোক্যনাথের গল্প সংকলন গ্রন্থ চারটি- ... পরিশেষে বলা যায়, রূপকথার বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করলেও সৃষ্টি নৈপুণ্যের গুণে তিনি একজন যথার্থ শিল্পী। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য : ৬.৫ অংশ)

৪। পেশাগত দিক থেকে তিনি ছিলেন একজন রাজকর্মচারী, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদ। ...ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। উক্ত উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপাদান হচ্ছে, ... দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কন' প্রকাশিত হয়, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে। এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট সম্রাট... পরবর্তী উপন্যাস 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য : ৬.৬ অংশ)

৫। স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলা সাহিত্যে যে সকল প্রতিভাময়ী লেখিকার আবির্ভাব হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম নক্ষত্র স্বর্ণকুমারী দেবী। ...সাহিত্যের বহু শাখাতে স্বর্ণকুমারী দেবীর ছিল স্বচ্ছন্দ পদচারণা। ...যদিও তিনি ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত তবুও নাটক, প্রহসন, গীতিকবিতা, গান, প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় মেলে। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। ...স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য : ৬.৭ অংশ)

৬। বিশেষত বাংলা উপন্যাসের পালাবদলের ক্ষেত্রে স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ... বিষয়বৈচিত্র্য অনুসারে রবীন্দ্র উপন্যাস গুলিকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ...মূলত বাংলা ছোটগল্পের তিনিই ছিলেন স্রষ্টা। ... ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'তিনসঙ্গী'র যুগ। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য : ৬.৮ অংশ)



৬.১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব নিরূপণ করুন।

২। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যে কীর্তির পরিচয় দিন।

৩। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় রমেশচন্দ্রের অবদান তুলে ধরুন।

৪। স্বর্ণকুমারী দেবীর কথাসাহিত্যিক প্রতিভা আলোচনা করুন।

৫। বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ৭ : আধুনিক বাংলা কবিতা-২

অধ্যায় বিন্যাস

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৭.২ পরিচয়

৭.৩ আধুনিক কবিতার সাধারণ পরিচয়

৭.৪ রবীন্দ্রনাথ

- ৭.৪.১ কবি পরিচয়
- ৭.৪.২ কাব্য পরিচয়
- ৭.৪.৩ বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অবদান

৭.৫ নজরুল ইসলাম

- ৭.৫.১ কবি পরিচয়
- ৭.৫.২ কাব্য পরিচয়
- ৭.৫.৩ নজরুল ইসলামের কাব্য বৈশিষ্ট্য

৭.৬ জীবনানন্দ দাশ

- ৭.৬.১ কবি পরিচয়
- ৭.৬.২ কাব্য পরিচয়
- ৭.৬.৩ জীবনানন্দের কাব্য বৈশিষ্ট্য

৭.৭ বুদ্ধদেব বসু

- ৭.৭.১ কবি পরিচয়
- ৭.৭.২ কাব্য পরিচয়
- ৭.৭.৩ বুদ্ধদেব বসুর কাব্য বৈশিষ্ট্য

৭.৮ সুকান্ত ভট্টাচার্য

- ৭.৮.১ কবি পরিচয়
- ৭.৮.২ কাব্য পরিচয়
- ৭.৮.৩ সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার বিশেষত্ব

৭.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ

৭.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে কী শিখলাম

৭.১১ অতিরিক্ত পঠন

৭.১২ অগগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৭.১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি—

- বিশ শতকের আধুনিক কবিতার সাধারণ রূপরেখা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিশ শতকের আধুনিক বাংলা কবিতায় যে সমস্ত পালাবদল ঘটেছিল, তার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে পরিচিত হবেন।
- রবীন্দ্র যুগের কবি হয়েও তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবিরা কোথায় আলাদা ছিলেন, সেই সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন। নির্বাচিত কবিদের কাব্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা অবলম্বন করে অধ্যায়ের শেষাংশে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে পারবেন।

৭.২ পরিচয়

এই অধ্যায় থেকে বিশ শতকের পাঁচজন কবি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারবেন। বাংলা সাহিত্যের এই পাঁচ কবি বহুল জনপ্রিয়। তাঁদের কবিতা অনেক সময় আবৃত্তি করা হয়। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে তাঁরা কোন জায়গায় অবস্থান করেন,তা জানতে এই অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশগুলো সহায়ক হবে। কবিদের কাব্যগ্রন্থ, কাব্য বৈশিষ্ট্য এবং জীবন পরিচিতি এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। কিছু তথ্যমূলক উপায়ে বিষয়গুলো সহজ করে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

৭.৩ আধুনিক কবিতার সাধারণ পরিচয়

'আধুনিক' শব্দটি যেহেতু আপেক্ষিক তাই আধুনিকতার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ মোটেই সহজ কথা নয়। ইংরেজি কিংবা বাংলা সাহিত্যে মর্ডান বা আধুনিক বলে একদল কবি চিহ্নিত হয়ে আছেন। বাংলা কবিতায় আধুনিক কবিদের চিহ্নিত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া চলে না কোনমতেই। সেই রবীন্দ্রনাথই আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন- "কাজটা সহজ নয়। কারণ পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে?" (রবীন্দ্রনাথ, 'আধুনিক কাব্য', 'সাহিত্যের পথে', ১ম সংখ্যা, পৃ: ১৩১) সেই সীমানা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন অনেকেই। আবু সঈদ আইয়ুব দিয়েছেন এক স্পষ্টতর সর্বগ্রাহী সংজ্ঞা— "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত অন্তত মুক্তি প্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।" (আবু সঈদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভূমিকা, আধুনিক বাংলা কবিতা পৃ: ৪০) এছাড়াও আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা নিয়ে নানা জন নানা মত পোষণ করেছেন। কিন্তু বাংলা কাব্যের আধুনিকতা এসব সংজ্ঞার মাধ্যমে নিরূপণ করা যথেষ্ট নয়, এর ব্যাপকতা অনেক।

৭.৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একথা অস্বীকারের উপায় নেই যে রবীন্দ্র কবিতা দিয়েই বাংলা কবিতার যুগে আধুনিকতার সঞ্চার হয়েছিল। কী ভাবে, কী ছন্দে, কী ভাষায় এমন কি পাশ্চাত্যানুসারী বিষয়ানুভবেও

রবীন্দ্র কবিতা আধুনিকতার চরম পরাকাষ্ঠার প্রমাণ রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের কবি প্রকৃতি সীমার সঙ্গে অসীমের, খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের, ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বজীবনের চিরন্তন প্রবাহের মধ্যে আকণ্ঠ ডুব দিয়ে তুলে এনেছে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। জগৎকে তিনি দেখেছেন অখণ্ড রূপে। ছেলেবেলা থেকেই অসীম প্রতিভাধর এই কবি কাব্য, গীতিকাব্য কাব্যোপন্যাস, কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য ইত্যাদি সমস্ত সাহিত্য রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

৭.৪.১ কবি পরিচয়

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। পিতার নাম ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা ছিলেন সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ যখন কাব্য চর্চা শুরু করেন, তখন বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মহাকাব্য এবং আখ্যান কাব্যের যুগ। কিন্তু মধুসূদনের মহাকাব্যিক বীররসের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল চক্রবর্তীর গীতিকবিতার দিকে আকৃষ্ট হলেন। কবি হিসেবে একদিকে যেমন পাশ্চাত্য কবি শেলি, কিটস প্রভৃতি রোমান্টিক কবিদের প্রভাব তাঁর কবিমনকে প্রভাবিত করেছিল তেমনি অন্যদিকে উপনিষদের পরিমণ্ডল এবং কালিদাস জয়দেব এবং বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবও তাঁর কাব্যভুবনকে এমন এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় উন্নীত করেছে,যা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য কবি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা কবিতায় রোমান্টিকতাও বিহারীলাল হয়ে প্রথম রবীন্দ্রনাথে এসেই বিকশিত হয়েছিল। বাংলা কবিতায় প্রাচীন রীতি-নীতি আদর্শ ভেঙে আধুনিকতার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠা প্রথম কবিই হলেন রবীন্দ্রনাথ।

৭.৪.২ কাব্য পরিচয়

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলোকে মোটামুটি চারটি পর্বে ভাগ করতে পারি—

- প্রথম পর্ব (উন্মেষ পর্ব/সূচনা পর্ব) : 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২), 'প্রভাত সংগীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)
- দ্বিতীয় পর্ব (ঐশ্বর্য পর্ব) : 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৩), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালি' ১৮৯৬)
- তৃতীয় পর্ব (অন্তবর্তী পর্ব) : 'কথা' (১৯০০), 'কাহিনী' (১৯০০), 'কণিকা' (১৯০০), 'কল্পনা' (১৯০০), 'ক্ষণিকা' (১৯০০), 'নৈবেদ্য' (১৯০২), 'স্মরণ' (১৯০২-১৯০৩), 'শিশু' (১৯০৩), 'উৎসর্গ' (১৯০৩-১৯০৪), 'খেয়া' (১৯১০)
- চতুর্থ পর্ব (গীতাঞ্জলি পর্ব/আধ্যাত্ম পর্ব) : 'গীতাঞ্জলি' (১৯১১), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪), 'গীতালি' (১৯১৫)
- পঞ্চম পর্ব (বলাকা পর্ব/গতিবাদের পর্ব) : 'বলাকা' (১৯১৬), 'পলাতকা' (১৯১৮), 'শিশু ভোলানাথ' (১৯২২), 'পূরবী' (১৯২৫), 'মহুয়া' (১৯২৯)

- ষষ্ঠ পর্ব (পুনশ্চ পর্ব) : 'বনবাণী' (১৯৩১), 'পরিশেষ' (১৯৩২), 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'বিচিত্রিতা' (১৯৩৩), 'শেষসপ্তক' (১৯৩৫), 'বীথিকা' (১৯৩৫), 'পত্রপুট' (১৯৩৬), 'শ্যামলী' (১৯৩৬)।
- সপ্তম পর্ব (অন্ত্য পর্ব) : 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'সেঁজুতি' (১৯৩৮), 'আকাশ-প্রদীপ' (১৯৩৯), 'নবজাতক' (১৯৪০), 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (১৯৪০), 'আরোগ্য' (১৯৪০), 'জন্মদিনে' (১৯৪), মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'শেষলেখা' (১৯৪১)।

কবির প্রথম দিকের কবিতাগুলোতে মানব জীবনের বিচিত্র রঙ্গ লীলা উপস্থাপিত হলেও মূলত 'মানসী' কাব্যগ্রন্থেই তার প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়। 'মানসী'র প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতা গুলি তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ সুতীব্র অনুভূতি ও সুগভীর ভাবগাম্ভীর্যে সমৃদ্ধ। 'সিন্ধু তরঙ্গ', 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি' প্রভৃতি কবিতার নিদর্শন। মানসীতে যে প্রেমলীলায় অতৃপ্তি জ্ঞাপন করেছেন, 'চিত্রাঙ্গদা'য় সেই প্রেমলীলাই উপজীব্য। আবার মানসী ও চিত্রাঙ্গদায় প্রেম সৌন্দর্যকে দেহোত্তীর্ণ করে বৃহত্তম যে প্রেমকে কবি অখণ্ড রূপে পেতে চেয়েছেন, 'সোনার তরী','চিত্রা', 'চৈতালি' এবং তার পরবর্তী কয়েকটি কাব্যে তা সার্থকতা লাভ করেছে।

'কণিকা'র অধিকাংশ কবিতা ক্ষুদ্র কবিতা। এই কাব্যের বেশিরভাগ কবিতা তত্ত্বমূলক, উপদেশাত্মক কিংবা ব্যঙ্গহাস্যমূলক। 'কথা ও কাহিনী' কাব্যে আমরা লক্ষ করি মহাজীবনের আভাস কবির চিত্তকে স্পর্শ করেছে। 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থে 'সোনারতরী, 'চিত্রা'র সৌন্দর্য তন্ময়তার সঙ্গে মিশেছে নবলব্ধ গভীর চেতনা। 'কল্পনা' কাব্যে—

"দূরে বহুদূরে,
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শ্রিপ্রা-নদী পারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।"(স্বপ্ন)

এই কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে কবিচিত্তের রোমান্টিক চেতনার প্রকাশ। ইতিহাস চেতনার সাথে মিশে যে প্রেম পৌঁছে যেতে চায় কবিকল্পনার চরমসীমায়।

রবীন্দ্রনাথ মূলত মানব ও প্রকৃতির কবি, প্রেম ও সৌন্দর্যের বিচিত্র রসানুভূতির কবি। তাঁর 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' ইত্যাদি কাব্যে এক আধ্যাত্মিক সমর্পণের কথা, আত্মনিবেদনের কথা স্থান পেয়েছে। নৈবেদ্য'র সব কবিতাই প্রার্থনা। কোন কোন কবিতায় স্বদেশ মহিমার কথা উচ্চারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সাধনাও তার অধ্যাত্ম সাধনা থেকে পৃথক নয়। তিনি সাধনা করেছেন সেই স্বর্গের, যে স্বর্গে মানবের চিত্ত ভয়শূন্য, শির অবনত এবং জ্ঞান যেখানে মুক্ত। মানুষের জয়গানে তিনি বলেছেন—

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' (প্রাণ)

আবার অধ্যাত্ম দর্শন নিয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।' (নৈবেদ্য, ৩০ সংখ্যক কবিতা)

'বলাকা' গতিবাদের কাব্য। এই গতিবাদ কবির অন্তরে এক রহস্যানুভূতি জাগিয়ে তোলে। যৌবনের ছন্দ, চঞ্চলতা এবং দৃপ্ত চলনে তিনি বলাকার গতিময়তাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে যৌবন স্মৃতি পর্যালোচনা সঙ্গে আসন্ন বিদায়ের করুণ সুর এক পরিণত জীবনদর্শনের রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

পুনশ্চ থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত কাব্যগুলিতে কবির শেষ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে। পুনশ্চ কাব্যে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ছবি উঠে এসেছে। 'শেষ সপ্তক'এ কবির আত্মজিজ্ঞাসা ও শৈশবের স্মৃতিচারণা রূপ পেয়েছে। 'পত্রপুট' কাব্যে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ চমৎকার আত্মবিশ্লেষণে রূপলাভ করেছে। 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ আবার পুরোমাত্রায় ইতিহাস সচেতন এবং বিজ্ঞানমনস্ক। 'সানাই' কাব্যে পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন - সুদূরের পিপাসা - প্রকৃতিপ্রেম ইত্যাদির আস্বাদন ধরা পড়ে।

৭.৪.৩ বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অবদান

রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রবাহ আলোচনায় সীমিত পরিসরে তার কাব্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা হয়তো সম্ভব নয়। আমরা এটুকু সিদ্ধান্তে আসতে পারি, যে কবি জীবনের এক একটি পর্যায়ে কিংবা স্তরে বিচিত্র ভাবরসের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন সীমা থেকে অসীমের দিকে যাত্রাই হচ্ছে রবীন্দ্র কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নিত্য নতুন সৃষ্টিকে অতিক্রম করে আরেক নতুন সৃষ্টির মধ্যে যাত্রাই হচ্ছে রবীন্দ্র কবি জীবনের ধর্ম। চিত্ররূপময়তা, আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা, ভাষা ও ছন্দের বৈচিত্র্য এবং বাস্তব ও প্রগতিচেতনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূলকথা। এখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্য বৈশিষ্টের কয়েকটি দিক দেওয়া হল—

১। ভাবগভীরতা: রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গভীর দার্শনিক চিন্তা ও উপলব্ধির প্রকাশ দেখা যায়।

২। গীতিধর্মিতা: তাঁর কবিতাগুলি গানের মতো সুরেলা ও সহজে মনে রাখার মতো।

৩। চিত্ররূপময়তা: রবীন্দ্রনাথের শব্দ ব্যবহার ও ভাষারীতিতে প্রকৃতির ছবি ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৪। আধ্যাত্মিকতা: তাঁর কবিতায় আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রকাশ দেখা যায়।

৫। প্রকৃতিপ্রেম: রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ভালোবাসতেন এবং তা তাঁর কবিতায় বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

৬। মানবপ্রেম: মানবজাতির প্রতি তাঁর গভীর দরদ ও ভালোবাসার প্রকাশ তাঁর কবিতায় দেখা যায়।

৭। স্বদেশপ্রেম: রবীন্দ্রনাথের কবিতায় জন্মভূমি ও দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রকাশ রয়েছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৭.৫ নজরুল ইসলাম

"গাহি সাম্যের গান,
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান।
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রীষ্টান গাহি সাম্যের গান।"

বাংলা কাব্য আসরে রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বলতায় হারিয়ে না গিয়ে যিনি বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে সমতার কথা বলেছিলেন তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমকালীন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সামাজিক ক্ষেত্রে অন্যায় অসাম্য পরাধীনতার যন্ত্রণা এবং তা থেকে উত্তরণের ভাবনা নিয়েই বাংলা সাহিত্যে নজরুলের কবিতার অভিষেক। নজরুলের কবিতার মূল সুর ছিল অন্যায় অবিচার শোষণ এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কাব্য ভাবনার সময়েই বাস্তবতা নিয়ে কবিতা এবং গান রচনা করে তিনি বাঙালি মননকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন।

৭.৫.১ কবি পরিচয়

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম। রবীন্দ্র যুগের প্রেম, আধ্যাত্মবাদ, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি ছেড়ে একেবারে অন্য ধারার পথিকৃৎ হয়ে যিনি বাংলা কবিতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি নজরুল ইসলাম। শিক্ষা দীক্ষায় তিনি বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে নাম লিখিয়ে নজরুল কিছুকাল সামরিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করেছিলেন। ফিরে এসে ঘর বেঁধেছিলেন। কিন্তু সেই ঘর তাকে আটকে রাখতে পারেনি। কণ্ঠে ছিল সুরের রেশ। এই সুরের জাদুতেই তিনি সারা দেশটা চষে বেরিয়েছেন। ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহব্যঞ্জক কবিতা ও গান লিখে তিনি বিদ্রোহী কবি আখ্যা পেয়েছিলেন। বিদেশি সরকারের রক্তচক্ষুকে অবহেলা করায় তাকে কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছিল। শুধু বিদ্রোহের গান নয়, ভক্তির গান তথা শ্যামা সংগীত ও ইসলামী গান কিংবা প্রেমের গজলও তার অনবদ্য সৃষ্টি। নজরুলের কবিতা কণ্ঠে ধারণ করেই পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। যে দেশ তাঁকে পরবর্তীতে জাতীয় কবিরূপে সম্মানিত করেছে। বিংশ শতাব্দীর বাঙালির মননে কাজী নজরুল ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর কবিতার মূল বিষয়বস্তু মানুষের উপর সামাজিক

অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। তিনি বাংলা সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অন্যতম ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অসামান্য অবদানের জন্য তাকে সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রিতে ভূষিত করে।

৭.৫.২ কাব্য পরিচয়

নজরুল বাংলা কবিতায় নিয়ে এসেছিলেন নতুন যুগ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পরিবর্তনের এক দমকা হাওয়া নিয়ে এলেন। যার ফলে দুর্দম অনুপ্রেরণা নিয়ে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের আবির্ভাব ঘটল। জীবনকে দেখার তার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। যেমন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ, যৌবনপ্রেম বীরত্ব, তারুণ্যের শক্তি, মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াই এসব নিয়ে নজরুল কবিতা লিখেছেন। যা পরবর্তী কবিদের কাছে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। নজরুলের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'অগ্নিবীণা' (১৯২২), 'দোলনচাঁপা' (১৯২৩), ' বিষের বাঁশি (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'ছায়ানট' (১৯২৫), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'ফণীমণসা' (১৯২৭), 'সিন্ধুহিন্দোল' (১৯২৪), 'চক্রবাক' (১৯২৯) ইত্যাদি।

নজরুলের কাব্যে দুটি ধারা লক্ষ করা যায়। একদিকে তিনি সৌন্দর্য প্রেমের ক্ষেত্রে আদর্শবাদী এবং অন্যদিকে সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি বাস্তববাদী। মানব জীবনের প্রতি তার গভীর প্রেম ও সহানুভূতি তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। ভারতের সর্বহারা শ্রেণিই তাঁকে বিপ্লব ধর্মে দীক্ষা দেয়। 'সর্বহারা'য় এসে তিনি সাম্যবাদের কথা প্রচার করেন। সাম্যবাদী কবিতায় বলেছেন-

'গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান।
যেখানে মিশছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান
গাহি সাম্যের গান" (সাম্যবাদী)

ভারতবর্ষের সামাজিক বর্ণব্যবস্থা, শ্রমের অসাম্য, শ্রেণিভেদ ইত্যাদি তাঁকে বিদ্রোহী হতে বাধ্য করেছে। বিদ্রোহের এই সুর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর 'বিষের বাঁশি' কাব্যে। এছাড়া বিদ্রোহী কবিতায় যেমন বলেছেন-

"আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণী
আমি পথ-সন্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণী!" (বিদ্রোহী)

এমনি 'ধূমকেতু' কবিতায় কবি স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু রূপে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন। ' অগ্নিবীণা','বিষের বাঁশি' ও 'ভাঙার গান' এই তিনটি কাব্যের মূলে আছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসঙ্গ। এছাড়া হিন্দু মুসলমানের সংস্কৃতি সমন্বয়ের জন্য তিনি লিখেছেন 'শাত-ইল আরব', 'কামাল পাশা'। উভয় সম্প্রদায়ের অন্ধকার দূরীকরণে লিখেছেন 'মাহররম', 'কোরবাণী', 'রক্তাম্বর-ধরিণী মা', 'আগমন' প্রভৃতি কবিতা। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সাধনার

কথা বলতে গিয়ে কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন মিলনের বাণী—

"মাভৈঃ! মাভৈঃ! এতদিনে বুঝি জাগিল ভারত প্রাণ
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান।"
(হিন্দু মুসলমান যুদ্ধ, ফণিমনসা)

মানুষের জয়গান ঘোষণা করতে করতে তিনি ধর্মের অসারতা, ধর্মগ্রন্থের অর্থহীনতাকে তুলে ধরেছেন এ ভাবে— 'মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো'।

কবির কবিতায় প্রেমের প্রসঙ্গেও এসেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা। 'দারিদ্র্য' কবিতায়—

"ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি
বিধবার হাসি সম স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি
নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
দুরন্ত নেশায় আজি পুষ্প-প্রগলভায়" (দারিদ্র্য)

এছাড়া 'ছায়ানট', 'দোলনচাঁপা', 'সিন্ধুহিন্দোল' 'চক্রবাক' এসব কাব্যগ্রন্থের মূলসুর প্রেম ও নিসর্গচেতনা। 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে নাম কবিতায় তিনি লিখেছেন তিনি প্রভাতে নদীর ধারে না থেকে 'ক্লান্ত পাখায় উড়ে যাব দূর বিস্মরণীর পাড়ে' তখন হয়তো কেউ তার অনুসন্ধান করবে। মানুষের সামাজিক জীবন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এসব নিয়েও নজরুল তাঁর কবিতায় বিক্ষোভ ফেটে পড়েছেন। 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতার উপসংহার তিনি বলেন—

"বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষজ্বালা এইবুকে—
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে,
রক্ত ঝরাতে পারিনা তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা।" (আমার কৈফিয়ৎ)

কাজী নজরুল ইসলাম শিশু বিষয়ক বেশক'টি কবিতা রচনা করেছেন। খুকি ও কাঠবেড়ালি', 'প্রভাতী', 'লিচু চোর', 'ঘুমপাড়ানি গান', 'সাত ভাই চম্পা' প্রভৃতি। বলা যায়, নজরুল কোন ছলচাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে অকপট সত্য কথা তীব্রভাবে ঘোষণা করেছেন তাঁর কবিতায়। ভেদাভেদ নয়, হিংসা কিংবা শ্রেণির বিন্যাস নয়। প্রেমের মধ্য দিয়ে সকল শ্রেণির মানবের মিলনকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর কাব্য দর্শনে। নারী এবং পুরুষজাতির মধ্যেও তিনি কোন অনৈক্য দেখতে চাননি। 'নারী' কবিতায় বলেছেন-

"নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এরপর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।"

সবশেষে বলা যায় মানবদরদী ছিলেন বলেই মানুষের অবমূল্যায়ন দেখে তিনি বারবার খুবই দুঃখে ফেটে পড়েছেন কবিতায়। প্রতিবাদ যে কবিতায় হতে পারে নজরুলই প্রথম দেখিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে। মানুষের মাঝে থেকে মানুষের প্রতি ভালবাসায় সমগ্র দেশ এবং জাতির কল্যাণের কথা ভেবেছিলেন কবি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য তার কবি মনকে করে তুলেছিলেন কখনো রোমান্টিক, কখনো মরমী বাউল। কবির বিশেষত্ব এখানেই।

৭.৫.৩ নজরুল ইসলামের কাব্যবৈশিষ্ট্য

১। নজরুলের কবিসত্তা ছিল যুগসচেতন। এই যুগের দাবিতেই তিনি হয়েছিলেন বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহ অন্যায় অসাম্য ভণ্ডামির বিরুদ্ধে।

২। রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলের প্রেমচেতনা আদর্শায়িত নয়, বরং তাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষা সাধারণ মানুষের জন্য। তিনি বিশ্বাস করতেন "প্রেম সত্য চিরন্তন,প্রেমের পাত্র, সে বুঝি চিরন্তন নয়"।

৩। নজরুলের কাব্যের ভাষা বেগবান শাণিত নিশ্চিত এবং অব্যর্থ। তাঁর একদিকে যেমন সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় তেমনি আরবি ফারসি শব্দেরও প্রাচুর্য রয়েছে।

৪। ছন্দের ক্ষেত্রেও নজরুলের কৃতিত্ব লক্ষণীয়। কলাবৃত্ত দলবৃত্ত মিশ্র কলাবৃত্ত সব রীতিই তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। নজরুলের কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৭.৬ জীবনানন্দ দাশ

বাংলা কাব্যভুবনে জীবনানন্দ দাশ প্রথম কবিব্যক্তিত্ব যিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরে। জীবনের বিচিত্র লীলা রহস্য সন্ধানে ও অনুধাবনে বাংলা কবিতায় তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। বলা যায় জীবনানন্দ রবীন্দ্র উত্তর কাব্যধারার প্রথম পথপ্রদর্শক। আদিতে রবীন্দ্রনাথের মতো উজ্জ্বল বিশ্বাস এবং আশাবাদ জীবনানন্দের ছিল না। কেননা তিনি যে সময়ের মানুষ ভারতবর্ষের ইতিহাসে সে এক বিপর্যস্ত কাল। একই সঙ্গে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে নতুন চিন্তা চেতনার অধিকার বাঙালি মানুষকে তখন নতুন পথের সন্ধানী করে তুলেছিল। ফলে জীবনানন্দের কবিতায় আমরা পাই, কবির জটিল, নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতা, অনিশ্চয়তা, সংশয় আবার তীব্র জীবনাশক্তি এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। আবার একইসঙ্গে জীবনানন্দের কবিতায় সমস্ত জটিলতা থেকে সরে গিয়ে ইতিহাসচেতনা, কালচেতনা কিংবা নিসর্গপ্রীতির যে উদাহরণ পাওয়া যায় সেগুলো নিঃসন্দেহে আলোচ্য বিষয়।

৭.৬.১ কবি পরিচয়

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অন্যতম কবি ব্যক্তিত্ব জীবনানন্দ দাশের জন্ম ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের বরিশালে। মা কুসুমকুমারী, পিতা সত্যানন্দ দাশগুপ্ত। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ করে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। জীবনানন্দ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি.এ এবং এম.এ পাস করে পরবর্তীতে কলকাতায় খড়গপুর কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন লাজুক এবং মুখচোরা। বেশিরভাগ সময় তার কেটেছে বরিশালের বাড়ির বিরাট গাছ-পাতা- ফল ঘেরা চৌহদ্দির

মধ্যে। গ্রামবাংলার প্রতি জীবনানন্দের ছিল এক অদ্ভুত টান। মাতা কুসুমকুমারীর কবিতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পিতা ছিলেন ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক। শোনা যায় ব্যক্তিগত জীবন তাঁর খুব সুখকর ছিল না। হয়তো এক ব্যক্তি জীবনের সকল পরাজয় সমস্ত শক্তি দিয়ে কবিসত্তাকে বিকশিত করতে সাহায্য করেছিল। পাশাপাশি সমসাময়িক যুগের জটিলতা, হতাশা, নৈরাশ্যবাদ তাঁর কাব্যকে রবীন্দ্র পরবর্তী কাব্য জগতে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। মাত্র ৫৫ বছর বয়সে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে একটি ট্রাম দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

৭.৬.২ কাব্য পরিচয়

জীবনানন্দের কবি জীবনের প্রস্তুতি ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল, সঠিক বলা যায় না। তবে 'ঝরাপালক'কেই তার প্রস্তুতি পর্বের প্রথম ফসল বলে ধরে নেওয়া হয়। বিষয় ভাবনা অনুযায়ী আর কাব্যগ্রন্থগুলোকে এভাবে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়,

- প্রথম পর্ব— 'ঝরা পালক' (১৯২৭), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭)
- দ্বিতীয় পর্ব— 'মহা পৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৯৬১)

রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বাংলা কবিতায় এক নতুন রীতি স্থাপনে জীবনানন্দ যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে বাংলা কাব্যপ্রবাহকে প্রভাবিত করেছিল। জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে আছে মৃত্যুচেতনার সমারোহ। আছে সমসাময়িক অবক্ষয়িত সমাজের প্রতিবিম্ব। কিন্তু একই সঙ্গে জীবনানন্দ ছিলেন অসম্ভব জীবনমুখী কবি। একদিকে মর্তপ্রীতি অন্যদিকে মৃত্যুচেতনা এই দ্বৈরথে কবি মন হয়েছে আক্রান্ত। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় এক ধূসর, ক্ষয়িষ্ণু, শীতার্ত, ম্লান এবং অন্ধকার জগতের প্রকাশ বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। যে জগতে থেকে কবির মনে দেখা দেয় এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা।

"মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়- প্রেম নয়- কোন এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চলে আসি।
বলি আমি এই হৃদয়ে রে,
সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়।" (বোধ)

যতই বিবিক্তি থাক, বিচ্ছিন্নতা থাক, জীবনানন্দ জীবনের কবি। রোমান্টিক কাব্য সাধনার কবি। তাঁর প্রেমের কবিতাগুলি যদি আমরা লক্ষ করি, তবে দেখবো প্রেমকে তিনি দেখেছেন এভাবে— 'কোনো এক মানুষীর মনে কোনো এক মানুষের তরে যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে' (নির্জন স্বাক্ষর, ধূসর পাণ্ডুলিপি) নারীকে আর স্বপ্ন লোকের আড়ালে না রেখে রক্ত মাংসের মানুষ পরিচয়ে কবি তাঁর কবিতায় উপস্থাপিত করেছেন।

"সুরঞ্জনা ওইখানে যেও নাকো তুমি,
বোলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে।"
(আকাশলীনা, সাতটি তারার তিমির)

'আকাশলীনা' কবিতায় কবির এই উচ্চারণ স্পষ্টতই বোঝায়, কাঙ্ক্ষিত নারীর প্রতি পুরুষের মনের এটি এক চিরন্তন আকুতি। কবিতায় প্রেমিকার নাম ধরে ডেকে তিনি ঈর্ষাকাতর মনে প্রশ্ন করেন- 'কি কথা তাহার সাথে? তার সাথে'। অন্যদিকে কবির 'বনলতা সেন' রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা। যে কবিতায় নাম, পদবী, ভৌগলিক অবস্থানসহ কবির প্রেমিকা মূর্ত হয়ে ওঠেন রহস্যময়ীরূপে।

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে!" (বনলতা সেন)

হাজার বছর ধরে পথ হাঁটতে হাঁটতে শ্রান্ত, ক্লান্ত নাবিক যখন তার বনলতা সেনকে খুঁজে পান তখন সেই নারীর কাছেই তিনি আশ্রয় খোঁজেন।' 'প্রচণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন'।

প্রেম খুঁজতেই কবি বারবার অতীত ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছেন। কখনো প্রেমিকার চুলকে তার মনে হয়েছে 'বিদিশার অন্ধকার নগরী'। কখনো প্রেমিকার মুখে দেখতে পেয়েছেন শ্রাবস্তীর কারুকার্য। তিনি একই সঙ্গে সমসাময়িককালকে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারেননি। যে কোন রোমান্টিক কবির ইতিহাস প্রিয়তা স্বাভবিক। কিন্তু অন্যান্য রোমান্টিক কবির সাথে জীবনানন্দের এই জায়গায় পার্থক্য রয়েছে। কেননা 'কবিতার কথা' গ্রন্থে জীবনানন্দ তার কাব্যে ইতিহাস চেতনা নিয়ে বলেছেন— "কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।" জীবনানন্দ জীবনকে দেখেছেন খোলা চোখে। বর্তমানের অন্তরালে অতীতের কান্না, ঘাম, রক্তের নোনা স্বাদ মিলিয়ে পৃথিবীকে দেখার চেষ্টা করেছেন কবি অবিরত। এই ইতিহাস চেতনার হাত ধরেই কবি পৌঁছাতে চান এক রোমান্টিক জগতে। উল্লেখ করা যায়, 'বনলতা সেন', 'পিরামিড', 'নগ্ন নির্জন হাত' প্রভৃতি কবিতার কথা।

জীবনানন্দের কাব্য প্রতিবার পরতে পরতে রয়েছে গ্রামবাংলার নিসর্গচেতনা। তার শেষের দিকের কাব্যগ্রন্থ 'রূপসী বাংলা'য় ফুটে উঠেছে বাংলার রূপসী প্রকৃতির বর্ণিল ছবি। বাংলার নদী, মাঠ, গাছ, পাখি এবং সবুজ ঘাসের ডাঙায় এই কবি ফিরে আসতে চেয়েছেন বারবার। হয়তো মানুষ নয়, অন্য কোন বেশে, অন্য কোনো রূপে।

"আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়।
হয়তো মানুষ নয়, হয়তোবা শঙ্খচিল শালিকের বেশে।"

'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় এইভাবেই কবি কখনো ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কার্তিকের নবান্নে ভোরের কাক হয়ে জন্মগ্রহণ করতে। এই বাংলা তাঁর কাছে এতই আকর্ষণীয় যে কবি আর কোন পৃথিবীর খোঁজে যান না। "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ! খুঁজিতে যাইনা আর!"

'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলি বর্ণময় ও দৃশ্যরূপময়। কবি কিটসের মতো ইন্দ্রিয় সচেতন হয়ে বাংলাকে রূপে গন্ধে স্পর্শে সাজিয়ে তুলেছেন তার কবিতায়।

"গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে নীল ধোঁয়া সকালে সন্ধ্যায়
উড়ে যায়-মিশে যায় আম বনে কার্তিকের কুয়াশার সাথে;
পুকুরের লাল সরক্ষীর ঢেউয়ে বারবার চায় সে জড়াতে-
করবীর কচি ডাল; চুমো খেতে চায় মাছরাঙাটির পায়।"

'মহাপৃথিবী' সংকলনে কবি জীবনানন্দ পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। পৃথিবীর বুক থেকে প্রকৃতির রমণীয়তা কোথাও যেন অন্তর্নিহিত হয়েছে। চারিদিকে তিনি দেখেছেন এই 'মহাপৃথিবী'তে মাতাল, ভিখারি ও কুকুরের ভিড়। প্রেমের মধ্যে দেখেছেন হিংস্রতার থাবা। সব মিলিয়ে পৃথিবীর ভয়ংকর রূপ ফুটে উঠেছে 'মহাপৃথিবী'র কবিতাগুলিতে।

'বাংলার পাড়াগাঁয়ে শীতের জোৎস্না আমি কতবার দেখলাম
কত বালিকাকে নিয়ে গেল বাঘ জঙ্গলের অন্ধকারে;
কতবার হটেনটট-জুলু দম্পতির প্রেমের কথাবার্তার ভিতর
আফ্রিকার সিংহকে লাফিয়ে পড়তে দেখলাম;

(আজকের এক মুহূর্ত)

'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় দেখলাম লোকটির বিছানায় তার বধূ ছিল, শিশুও ছিল। তবু ফাল্গুনের অন্ধকারে সমস্ত প্রাচুর্য ও প্রার্থী চাওয়া পাওয়া ছেড়ে তার মৃত্যুর সাধ হল—

"শোনা গেলে লাশ কাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে
কাল রাতে-ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হল তার সাধ;"

(আট বছর আগের একদিন)

'সাতটি তারার তিমির' কাব্যেও একইভাবে কবি দেখেছেন রাত্রির ঘন অন্ধকার। কিন্তু নগর জীবনের জটিলতা, অবসন্ন রূপ কে পেছনে ফেলে তিনি পৌঁছতে চেয়েছেন গৌরবোজ্জ্বল জীবনে। তাই যুদ্ধ ও বাণিজ্যিক অভিযানে যে মানুষ ভুলে গেছে পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে, সে কথাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে চান কবিতায়—

"সেইখানে উঁচু উঁচু হরিতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোলরাঙা
চুপে-চুপে ডুবে যায় জ্যোৎস্নায়-
পিপুলের গাছে ব'সে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দ্যাখে; সোনার বলের মত সূর্য আর
রূপার ডিবের মত চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।'

(গোধূলি সন্ধির নৃত্য)

'সাতটি তারা তিমির' পর্যায়ের কবিতায় কবি বহু চিত্রকল্পতে পরাবাস্তবতার সাথে সংযোগ স্থাপন করেছেন। জীবনানন্দ ছিলেন পাশ্চাত্য অনুসারী কবি। ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক কবিতার অনুসরণে বহু রোমান্টিক প্রতীক এবং স্বপ্নময় ভাষার ব্যবহার করেছেন তিনি তাঁর কবিতায়। যেমন— 'রামধনু রংয়ের কাঁচের জানালা', 'রক্তিম গ্লাসের তরমুজ মদ', 'পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' ইত্যাদি। উপমার ব্যবহার এসেছে তাঁর কবিতায় অনায়াসে। যেমন— বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, পচা চালকুমড়া, মরা ঘাস ইত্যাদি।

'বেলা অবেলা কালবেলা'তে জীবনানন্দ তাঁর আপন সত্তা নিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন। এখানে নারীকেই তিনি তার ভবিষ্যৎ বলে ভেবেছেন। যেন নারীই তার প্রেম প্রেরণার আশ্রয়স্থল। কবি উপলব্ধি করেছেন দশরূপা নারী তার জীবনের বিস্তৃত পরিসরে ছায়া দিয়ে চলেছেন। 'প্রেমের বিথার মহীয়সী,ঠিক এরকম আধা নীলের মতো, জ্যোতির মতো (নারী সবিতা)।

প্রথম মহাযুদ্ধের সংশয়পূর্ণ পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এবং পাশ্চাত্যের কবি টি এস এলিয়ট, স্পেন্ডারের মত কবিদের কাব্যপ্রভাবে সঙ্গত কারণেই জীবনানন্দের কাব্য মনন এক স্বতন্ত্র ধারায় বয়ে চলেছিল। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির ছন্দ ছাড়া জীবনের পটভূমিতে জীবনানন্দ তখন বিশ্বাস এবং আশাবাদ এর পরিবর্তে অস্থির হৃদয়ের যন্ত্রণাবোধ এবং অনিশ্চিত জীবনের প্রতিচ্ছবি রচনায় বেশি স্বচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। পাশাপাশি ভাষা এবং ছন্দের দিক থেকেও এক নতুন ধারার জন্ম দিয়েছেন। এখানেই তিনি অনন্য।

৭.৬.৩ জীবনানন্দের কাব্য বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্র সমসাময়িক হয়েও বাংলা কবিতার ধারায় এক স্বতন্ত্র মাত্রা যিনি যোগ করেছিলেন, তার কাব্য প্রতিভাকে শব্দ এবং অক্ষরের সীমাবদ্ধতায় বিচার করা যায় না। তবুও কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে জীবনানন্দের কাব্য কৃতিত্বকে এভাবে তুলে ধরা যায়।

ক) জীবনানন্দ তাঁর সমসাময়িক কাল এবং মানুষকে উপলব্ধি করার পাশাপাশি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মিলিয়ে যে আবহমান মানুষ তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তার কবিতায়।

খ) কবির কবিতায় বাংলার গ্রাম্য প্রকৃতি যেমন উঠে এসেছে তার সমস্ত রূপ সৌন্দর্য নিয়ে তেমনি বাংলার লোক ঐতিহ্য এবং লোকপুরাণের শাশ্বত জীবনধারাও প্রতিফলিত হয়েছে।

গ) জীবনানন্দের কবিতায় নারী, রবীন্দ্রনাথের 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা' রূপে নয়, বরং উপস্থাপিত হয়েছে নিজস্ব নাম ভূমিকায়। যেমন— বনলতা সেন, মৃণালিনী, সুদর্শনা, শ্যামলী, শেফালিকা, সুরঞ্জনা, সবিতা, সুচেতনা, অরুণিমা প্রভৃতি।

ঘ) বাংলা সাহিত্যের প্রথম পরাবাস্তববাদী কিংবা স্যুররিয়ালিস্ট কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ। পাশ্চাত্য অনুসারী কবি তাঁর কবিতায় পরাবাস্তবের আশ্রয়ে জীবনের সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

ঙ) জীবনানন্দের ভাষায় এবং সংলাপের ক্ষেত্রে এক ধরনের নাটকীয়তা লক্ষ্য করা যায়। যেমন তবু, অথবা ইত্যাদি অব্যয় জুড়ে দিয়ে এক ধরনের বিশেষ বাকরীতি তাঁর কাব্যকে দিয়েছে এক নতুন চমক। এছাড়া দাঁড়ি, কমা এবং কোলনের ব্যবহারও তার কাব্যকে দিয়েছে এক আলাদা মাত্রা।

চ) জীবনানন্দ প্রধানত তানপ্রধান ছন্দের কবি। যদিও কলা বৃত্ত ও দলবৃত্ত ছন্দেও তিনি কাব্যরচনা করেছেন। তাঁর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিলন।

৭.৭ বুদ্ধদেব বসু

মহাযুদ্ধোত্তর এবং রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক বাংলা কাব্য আন্দোলনের সুদীর্ঘ ধারার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যিনি যুক্ত তিনি বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেবের কবিতাও একাধারে বিদ্রোহের, ক্লান্তির, সন্ধানের, বিস্ময়ের, জাগরণের এবং বিশ্ববিধানে আস্থাবান মনোবৃত্তির। মহাযুদ্ধের পৃথিবীর বাস্তব অভিজ্ঞতা সরাসরি তার কবিতায় না আসলেও পাশ্চাত্য প্রভাবে আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা তাঁর কাব্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্র আধুনিক বাংলা কাব্যের ভুবনে বুদ্ধদেব বসু মূলত প্রেমের কবি। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক চেতনা বুদ্ধদেব বসুকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বুদ্ধদেব নিজেই বলেছেন— "যা কিছু লিখেছি সব, সবই ভালোবাসার কবিতা, কথা বুনে, ছন্দ গেঁথে, শব্দ ছেনে আমি শুধু ভালোইবেসেছি সবচেয়ে তীব্র, মত্ত, সত্য করে"।

৭.৭.১ কবি পরিচয়

বুদ্ধদেব বসুর জন্ম ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মাতামহের বাড়ি কুমিল্লায়। তাঁর পিতা ভূদেব বসু পেশায় ঢাকা আদালতের উকিল ছিলেন। তাঁর মাতার নাম বিনয়কুমারী। বুদ্ধদেব বসুর মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহ ছিলেন পুলিশ অফিসার। তার পৈতৃক নিবাস ছিল বিক্রমপুরে। মাতামহ চিন্তাহরণ ও মাতামহী স্বর্ণলতা সিংহ'র কাছে প্রতিপালিত হন বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রথমভাগ কেটেছে কুমিল্লা, নোয়াখালী আর ঢাকায়। নিতান্তই কিশোর বয়সে লেখা তাঁর কবিতা পড়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন— "এর মধ্যে কবিতার প্রতিভা রয়েছে, একদিন প্রকাশ পাবে।" রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল যে তাঁর কাব্যে বাস্তবের সংযোগ নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, জীবনের জ্বালা যন্ত্রণার চিহ্ন এবং তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরকে তিনি অন্যায় ভাবে উপেক্ষা করেছেন। তাই রবীন্দ্রোত্তরণের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়ে বুদ্ধদেব আধুনিক বাংলা কাব্যের নব বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

৭.৭.২ কাব্য পরিচয়

বুদ্ধদেব বসুর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ গুলি হল— 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭), 'দময়ন্তী' (১৯৪৩), 'দ্রৌপদীর শাড়ি' (১৯৪৮), 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫), 'যে আঁধার আলোর অধিক' (১৯৫৮), 'মরচে পরা পেরেকের গান' (১৯৬৬) ইত্যাদি।

ঊনবিংশ শতকের বুর্জোয়া মূল মর্যাদা বোধ এবং কল্যাণময় শালীনতাকে পুড়িয়ে দিয়ে রক্তমাংসের মানুষের জৈব রূপ প্রকাশে যখন কবিরা সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন বুদ্ধদেবই সেই পথের প্রধান পথিক। 'বন্দীর বন্দনা'তে তাঁর প্রেম ভাবনার নানা বৈচিত্র্যময় রূপ ধরা পড়ে। প্রেমকে তিনি অতীন্দ্রিয় রূপে না দেখে, দেখেছেন মূর্ত শরীরীরূপে। 'বন্দীর বন্দনা' কবিতার শুরুতেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়—

'বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষ বর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
রমণী রমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি
তাদের মেটাতে হয় বঞ্চনার দুর্দম বিক্ষোভ।'

কিন্তু কামনার পরিতৃপ্তিই যে প্রেম বা মনুষ্যত্বের চরম প্রকাশ নয় এ কথা কবি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই 'বন্দীর বন্দনা' ও 'কঙ্কাবতী'র কবি যখন মধ্য তিরিশের যৌবন্মাদনা ছাড়িয়ে ক্রমশ চল্লিশের দরজায় এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর কবিতায়ও দেখা গেল প্রেমের সেই উদ্দাম উল্লাসের পরিবর্তে প্রেমের দর্শন চিন্তা। তাই নিসর্গ প্রেমের সৌন্দর্য অনুভূতি দেখে তাঁর মত্ত হতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছে করে শাশ্বত প্রেমের স্বাদ পেতে। আর তখনই তিনি যৌন আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রবৃত্তির কারাগার থেকে মুক্তি পেতে ঘোষণা করেন—

'তুমি মোরে দিয়েছো কামনা অন্ধকার ক্ষমা রাত্রি সম
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম,মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম।'

রবীন্দ্রপ্রেমিক কবি বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিধাতার আশীর্বাদকেই লক্ষ করেছেন, সেখানে বুদ্ধদেব বসু বিশ্বাস করতেন মানুষই প্রত্যক্ষভাবে ক্লান্তিহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমস্ত গ্লানি ও কালিমাকে জয় করতে পেরেছে। তাই বিধাতার সৃষ্টির প্রতি অভিযোগ জানিয়ে কবি বলেন—

'আমারে রচেছি আমি; -তুমি কোথা ছিলে অচেতন
সে মহা সৃজন কালে তুমি শুধু জানো সেই কথা।'

রবীন্দ্র যুগের প্রভাব থেকে দূরে সরে গিয়ে বুদ্ধদেব নিঃসন্দেহে আধুনিক কাব্যধারায় নতুন কিছু যোগ করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয়া'কে দেখেছেন দেহহীন লাবণ্য রূপে, কল্পনায়, স্বপ্নে। বুদ্ধদেব বসু সেখানে প্রিয়াকে পেতে চান রক্তমাংসের নারীরূপে। আবার সেই দেহজ প্রেমের মধ্যেই কবি আজীবন ছুটে চলেন এক অবিনশ্বর প্রেমের অন্বেষণে।

অন্যদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর ছিল ঘনিষ্ঠ সংযোগ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পুরাণ কাহিনি কিংবা ইতিহাসের ঘটনাবলি প্রভৃতি প্রসঙ্গ প্রায়ই তাঁর কবিতায় লক্ষ করা যায়। 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে পৌরাণিক কাহিনি একটি যুগোচিত নতুন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। 'দ্রৌপদীর শাড়ি' যেন এক রহস্য। যে রহস্যের তল পাওয়া অসম্ভব—

'মন্ত্র পড়া অন্তরাল
দিলো না তবু সাড়া।
অসম্ভব দ্রৌপদীর
অন্তহীন শাড়ি।'

দময়ন্তীর কাহিনিকেও যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে ব্যাখ্যা করেছেন বুদ্ধদেব। দময়ন্তীর রূপ-যৌবন স্বর্গের দেবতারাও কামনা করেছিলেন। কিন্তু দময়ন্তী মানব নলকেই বরণ করেছিলেন। কবির বক্তব্য— মানবপ্রেমের মধ্যেই অমরত্বের বীজ লুকিয়ে আছে। তাঁর 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থেও মহাভারতের চিত্রকল্পের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

বুদ্ধদেবের কাব্য সাধনা মূলত শুরু হয় রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই। তাই যুগোপযোগী আধুনিক চিন্তা চেতনা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েও কবি বারবারই রবীন্দ্রধর্মী শাশ্বত প্রেমচেতনা এবং চিরন্তন ঐতিহ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। বক্তব্যে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক হয়েও রাবীন্দ্রিক ছন্দ ও তৎসম শব্দের ঝংকারকে তিনি অতিক্রম করতে পারেননি। শুধু কয়েকটি জায়গায় আধুনিক কবিতার কাব্যরীতি ও ভাষার সরলতা তাঁর কবিতাকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয়।

৭.৭.৩ বুদ্ধদেব বসুর কাব্যবৈশিষ্ট্য

১। রবীন্দ্রোত্তর কাব্য ধারায় এক নতুন কাব্য রীতির সূচনা করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। রবীন্দ্রদ্রোহিতাই ছিল যে রীতির মূল কথা।

২। পুরাণ সাহিত্যের প্রভাব এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি একান্ত একনিষ্ঠ কবি ছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

৩। পাশ্চাত্য কাব্য কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় কবি টেনিসন, স্পেণ্ডার, বোদলেয়ারের প্রভাব লক্ষ করা যায়। পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণ তাঁর কাব্যস্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪। আত্মসচেতনতা এবং আত্মদ্বন্দ্ব কবির কবিতার পরতে পরতে লক্ষ করা যায়।

৫। একদিকে রবীন্দ্রদ্রোহিতা এবং অন্যদিকে রবীন্দ্রপ্রেম এই দ্বৈতসত্তা বুদ্ধদেবের কবিতাকে প্রভাবিত করেছে বিশেষভাবে।

৭.৮ সুকান্ত ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র সমসাময়িক কবিদের মধ্যে নজরুলের মতই মানবতাবাদী সাম্যবাদী এবং অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। মাত্র ২১ বছরের জীবনকালেই যিনি বাংলা সাহিত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বিশ শতকের চরম ক্রান্তিকালে যিনি রোমান্টিক কবিতার মত বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি। কিশোর কাল থেকেই স্বতন্ত্র কাব্যভাষা এবং রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি বলিষ্ঠ বিশ্বাস তাঁর কাব্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

৭.৮.১ কবি পরিচয়

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মাতুলালয়ে সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম। পিতা নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, মা সুনীতি দেবী। নিবারণ চন্দ্রের আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার কোটালী পাড়ায়। অল্প বয়সে মাতৃহারা হওয়ার দরুন, সুকান্তের ছিল ছন্নছাড়া জীবন। দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী। ছেলেবেলা থেকে শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা, গ্রন্থ পাঠ এবং বন্ধু অরুণাচল বসুর বন্ধুতা এবং তার মা কবি সরলা বসুর সান্নিধ্য তাঁকে কাব্য রচনা প্রবৃত্ত করেছিল। শোনা যায়, গল্প দাদুর আসরে গল্প পাঠ এবং রবীন্দ্র প্রয়াণে কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে সুকান্তের কবি জীবনের সূত্রপাত। কিন্তু স্বল্পায়ু এই কবি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ২১ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

৭.৮.২ কাব্য পরিচয়

সুকান্ত যখন কাব্য রচনা শুরু করেন, তখন ভারতবর্ষ অত্যাচারে-অবিচারে, শোষণে-বঞ্চনায়, বিক্ষোভে-বিদ্রোহে, দাঙ্গা-মন্বন্তরে উত্তাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ প্রভাবে তখন খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, পঞ্চাশের মন্বন্তর। এছাড়া ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণ, কালোবাজারি, মজুতদারি প্রভৃতির প্রেক্ষাপটে মার্ক্সীয় জীবনাদর্শন নিয়ে শোষিত, নিপীড়িত শ্রেণীর পক্ষে কলম ধরেছিলেন কবি। সাম্যবাদী ধ্যানধারণা নিয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে আশাবাদের বাণী শুনিয়েছেন। সুকান্তের কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম— 'ছাড়পত্র' (১৯৪৭), 'পূর্বাভাস' (১৯৫০), 'মিঠেকড়া' (১৯৫১), 'অভিযান' (১৯৫৩), 'ঘুম নেই' (১৯৫০), 'হরতাল' (১৯৬২), 'গীতিগুচ্ছ' (১৯৬৫)। মাত্র ২১ বছরের জীবনকালেই কবি ছিলেন অনেকটা পরিণত। তাই ছাড়পত্র কাব্যের প্রথম কবিতায় যৌবনের আবেগ নয় বরং নতুনকে ধৈর্য ও সহানুভূতি দিয়ে গ্রহণ করতে চান কবি এবং নবজাতকের কাছে বলিষ্ঠ অঙ্গীকার করেন এই বলে—

'চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এই শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

(ছাড়পত্র)

'ছাড়পত্র' কাব্যে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় কবি রবীন্দ্র ঐতিহ্যের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেন—

'এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।
এখনো স্বগত ভাবাবেগে;
মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে।'

কিন্তু সুকান্তের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং মতাদর্শ তাঁকে সমসাময়িক কবিদের থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বতন্ত্র জায়গায় স্থান দিয়েছে। সমকালীন বাস্তব পরিস্থিতি ও সংগ্রামের ঘনঘটায় তিনি নিজেই নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন এভাবে-

'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।'

রাশিয়ার বিপ্লবী চেতনা ও লেনিনের নেতৃত্ব কবিচিত্তকে নন্দিত করেছে বারবার। লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।'

'একটি মোরগের কাহিনী'তে সমাজের অবহেলিত, শোষিত শ্রেণির মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। 'মোরগ' এখানে নিম্নবিত্ত শ্রেণির প্রতীক। যে চিৎকার করেও খাবার যোগাতে পারেনা। কিন্তু খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

'ছোট্ট, মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে—
প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবার'!
তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে;
অবশ্য খাবার খেতে নয়--
খাবার হিসেবে।'

ঠিক একইভবে 'রাণার' কবিতায় ডাকহরকরার জীবন নিয়ে কবি সমস্ত সর্বহারা জীবনের দুঃখ কথা ফুটিয়ে তুলেছেন।

'অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।'

অন্যায়ের বিরুদ্ধে,অবিচারের বিরুদ্ধে কবির কলম ছিল সবসময় উদ্দীপ্ত। 'দেশলাই কাঠি' কবিতায় কবির বিপ্লবী চেতনা তথা আশাবাদের কথা উঠে এসেছে।

'আমরা বন্দী থাকব না তোমাদের পকেটে,
আমরা বেরিয়ে পড়ব, আমরা ছড়িয়ে পড়ব
শহরে, গঞ্জে, গ্রামে- দিগন্ত থেকে দিগন্তে।'

রবীন্দ্র কবিতার রোমান্টিকতা থেকে বেরিয়ে এসে সমকালীন বাস্তবতার জটিল, কঠিন পরিস্থিতিতে ক্ষুধার্ত, অবহেলিত জনগণের হয়ে সুকান্ত তাঁর 'মহাজীবন' কবিতায় লিখেন—

'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'

'ছাড়পত্র' কাব্যের আরো দুটি বিখ্যাত কবিতা 'বোধন' এবং রানার'। ভারতবর্ষে বারবার হিংসাত্মক দাঙ্গা এবং নারীঘাতী শিশুঘাতী সাম্রাজ্যবাদের কুৎসিত প্রবণতার বিরুদ্ধে কবি উচ্চারণ করেন—

'প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘর বাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।'

তীব্র আবেগ ও উত্তেজনায় সংগ্রামী চেতনার স্বরূপ ধরা পড়েছে তাঁর 'ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থের নানান কবিতায়। এই কবিতায় কবি আলোর পূজারী। অন্ধকারের বুকে তিনি সূর্যের প্রতীক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করেন। তাই 'রৌদ্রের গান' কবিতায় কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

'রৌদ্রে কঠিন ইস্পাত উজ্জ্বল
ঝকমক করে ইশারা যে তার বুকে
শূন্য নীরব মাঠে রৌদ্রের প্রজা
স্তব করে জানি সূর্যের সম্মুখে।'

ছোটদের জন্য রচিত কবিতায়ও তিনি বাস্তবতার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। 'পুরোনো ধাঁধা' কবিতায় উঠে আসে মোক্ষম এক প্রশ্ন—

'বলতে পারো বড় মানুষ মোটর কেন চড়বে?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?'

এছাড়া পৃথিবীর নানা ধরণের মেকি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি বলেছেন—

'ভেজাল ভেজাল ভেজাল রে ভাই ভেজাল সারা দেশটায়।'

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যে কবি লেখেন— 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'। (আঠারো বছর বয়স) এমন স্বদেশপ্রেমিক এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এক কবিকে বাংলা সাহিত্য হারিয়েছে অকালে। তাঁর সব কবিতা শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক দর্শন থেকে উঠে আসেনি, উঠে এসেছে নিপীড়িত সমাজের কঠিন বাস্তবতার গভীর জীবনবোধ থেকে। সমাজব্যবস্থার সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সহজ সরল ভাষায় প্রতিবাদের কথা হয়তো বাংলা সাহিত্যে এর আগে আর কেউ বলতে পারেননি।

৭.৮.৩ সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার বিশেষত্ব

সুকান্ত ছিলেন জনসংহতির কবি। জীবনে জীবন যোগ করার সাধনার কবি। তাই চারিদিকে এত নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও সুকান্তের কবিতায় কোন হতাশা-নৈরাশ্য কিংবা অবসাদ-ক্লান্তির স্থান নেই। বরং আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয়ে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল। তাই ধ্বস্ত, জীর্ণ এই পৃথিবীর সমস্ত গ্লানি তিনি মিটিয়ে যেতে চান। সুকান্ত মার্কসবাদী জীবনদর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই শোষক ও শোষিতের চিরন্তন সংগ্রামের কথা তাঁর কাব্যে একটি বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে। মিছিল, বিদ্রোহ, শপথ, বিপ্লব, রক্ত, ঘাম, যুদ্ধ, বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা এগুলো শব্দ তাঁর

কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে। যে জীবন তাঁর চোখে দেখা, যে জীবনের সমস্যাগুলো তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, সেই জীবনকেই তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন তাঁর কবিতায়। তাই কবিতার ভাষাকে অলংকৃত করার কোন চেষ্টাই তিনি করেননি। মানুষকে সংহত করার, জাগ্রত করার পণ নিয়ে তিনি খুব সাধারণ জলের মতো স্বচ্ছ, ঝকঝকে ভাষার ব্যবহারে তাঁর কবিতাকে করে তুলেছিলেন বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্পদ।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যের বিশেষত্ব সম্পর্কে লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৭.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ

- বিশ শতকের আধুনিক বাংলা কবিতা মূলত রোমান্টিকতা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াবার প্রচেষ্টা।
- প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোমান্টিক প্রেম এবং অধ্যাত্মচেতনায় বাংলা কবিতাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিলেন, পরবর্তী কবিদের তাঁর প্রভাব থেকে সহজে মুক্ত হতে পারেননি।
- জীবনানন্দ কবিতায় বাস্তবপ্রেম, ইতিহাসচেতনা, এবং জটিল নাগরিক জীবনের গান শোনা যায়।
- নজরুল এবং সুকান্তের কবিতায় যেমন সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ধ্বনি শোনা যায়, অন্যদিকে বুদ্ধদেব এবং জীবনানন্দের কবিতায় প্রেমের বাস্তব অনুভূতি স্থান পেয়েছে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার হাত ধরে।



৭.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

বিশ শতকের আধুনিক কবিতার সাধারণ রূপরেখা সম্পর্কে জানতে পারলাম।

- বিশ শতকের আধুনিক বাংলা কবিতা মূলত রোমান্টিকতা থেকে সরে দাঁড়িয়ে কীভাবে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াবার প্রচেষ্টা করেছে সে বিষয়ে জানতে পারলাম।
- বিশ শতকের আধুনিক বাংলা কবিতায় যে সমস্ত পালাবদল ঘটেছিল,তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পরিচিত হলাম।
- রবীন্দ্র যুগের কবি হয়েও তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবিরা কোথায় আলাদা ছিলেন, সেই সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করতে পারলাম।
- নির্বাচিত কবিদের কাব্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পেলাম। নজরুল এবং সুকান্তের কবিতায় যেমন সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বার্তা রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বুদ্ধদেব এবং জীবনানন্দের কবিতায় প্রেমের বাস্তব অনুভূতি স্থান পেয়েছে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার হাত ধরে। সে সমস্ত বিষয় এই অধ্যায় থেকে বিশেষভাবে জানা সম্ভব হল।



৭.১১ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য দেবেশ কুমার (২০১২), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ; কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সী
- ইসলাম আজহার (২০০১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ; অনন্যা
- চৌধুরী শীতল (মার্চ, ২০১৯); আধুনিক বাংলা কবিতা, নিবিড় পাঠ; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং
- ত্রিপাঠী দীপ্তি (জুন, ২০১৩); আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং
- বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার (২০০৬); বাংলা সাহিতের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট
- মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার (২০১২); বাংলা কবিতা পর্বে পর্বান্তরে; কলকাতা : প্রজ্ঞা বিকাশ
- সিকদার অশ্রুকুমার (১৩৬৭); আধুনিক কবিতার দিগবলয়; কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী



৭.১২ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের এক একটি পর্যায় কিংবা স্তরে স্তরে বিচিত্র ভাবরসের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন সীমার থেকে অসীমের দিকে যাত্রা হচ্ছে রবীন্দ্র কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ...এখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্য বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি দিক দেওয়া হল-ভাবগভীরতা: রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গভীর দার্শনিক চিন্তা ও উপলব্ধির প্রকাশ দেখা যায়। ...স্বদেশপ্রেম: রবীন্দ্রনাথের কবিতায় জন্মভূমি ও দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রকাশ রয়েছে। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৭.৪ — ৭.৪.৩)

২। নজরুল বাংলা কবিতায় নিয়ে এসেছিলেন নতুন যুগ। ...নজরুলের কাব্যে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। ...কাজী নজরুল ইসলাম শিশু বিষয়ক বেশক'টি কাব্য কবিতা রচনা করেছেন। ...সবশেষে বলা যায় মানবদরদী ছিলেন বলেই মানুষের অবমূল্যায়ন দেখে তিনি বারবার খুবই দুঃখে ফেটে পড়েছেন কবিতায়। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৭.৫ — ৭.৫.৩)

৩। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মাতুলালয়ে সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম। ...সুকান্ত যখন কাব্য রচনা শুরু করেন, তখন ভারতবর্ষ অত্যাচারে-অবিচারে, শোষণে-বঞ্চনায়, বিক্ষোভে-বিদ্রোহে, দাঙ্গা-মন্বন্তরে, উত্তাল। ...সুকান্তের কাব্যগ্রন্থ গুলোর নাম ...মাত্র ২১ বছরের জীবনকালেই কবি ছিলেন অনেকটা পরিণত। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৭.৮.২ — ৭.৮.৩)



৭.১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য-সম্ভারের পরিচয় দিন।

২। বাংলা কাব্য সাহিত্যে নজরুলের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। বাংলা কবিতায় কবি জীবনানন্দের অবদান আলোচনা করুন।

৪। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৬। বিশ শতকের বাংলা কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ৮ : আধুনিক বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ-২

বিন্যাস ক্রম

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৮.২ পরিচিতি
৮.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮.৪ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
৮.৫ প্রমথ চৌধুরী
৮.৬ রাজশেখর বসু
৮.৭ বুদ্ধদেব বসু
৮.৮ অধ্যায় সংক্ষেপ
৮.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৮.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৮.১১ অতিরিক্ত পঠন
৮.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধের নাম ও গদ্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলা গদ্য সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কৃতিত্ব ও তাঁর রচিত প্রবন্ধের নাম সম্পর্কে অবগত হবেন।
- বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর রচিত প্রবন্ধের নাম ও তাঁর অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যে রাজশেখর বসুর কৃতিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বুদ্ধদেব বসুর অবদান বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যে কতখানি সে সম্পর্কে অবগত হবেন।

৮.২ পরিচিতি

বাংলা গদ্য সৃষ্টি-ইতিহাসকে মানব সভ্যতার প্রথম বসন্তের হাওয়া বলা যেতে পারে। নবজাগরণের উল্লাস বাঙালির হৃদয়ে এসে লাগলো শুরু হল আধুনিক যুগের। মধ্যযুগের গতানুগতিক প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে নতুনভাবে যুক্তির মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করল এই গদ্য সাহিত্য। তৈরী হল মুদ্রণ যন্ত্র। বাংলা সাহিত্য ধারা আরো সমৃদ্ধ হল এই গদ্য সাহিত্যের হাত ধরেই। শুরু হল বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখাও। এই ভাবেই এগিয়ে যেতে শুরু করল

বাংলা গদ্য সাহিত্যের গতি ধারা। এই ধারায় লিখতে শুরু করলেন রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, অন্নদাশংকর রায় থেকে আরো অনেকেই।



জেনে রাখা ভালো

রবীন্দ্র-প্রবন্ধ পরিচয় :

রবীন্দ্র-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) : য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

রবীন্দ্র-রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) : চিঠিপত্র, পঞ্চভূত

রবীন্দ্র-রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড) : আত্মশক্তি

রবীন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড) : ভারতবর্ষ, চারিত্রপূজা

রবীন্দ্র-রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড) : আধুনিক সাহিত্য, রাজা প্রজা

রবীন্দ্র-রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) : স্বদেশ, সমাজ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব

রবীন্দ্র-রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড) : ধর্ম, শান্তিনিকেতন ১-১০

রবীন্দ্র-রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড) : শান্তিনেকেতন ১১-১৭

রবীন্দ্র-রচনাবলী (নবম খণ্ড) : আধুনিক সাহিত্য

রবীন্দ্র-রচনাবলী (দশম খণ্ড) : রাজা ও প্রজা

রবীন্দ্র-রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড) : সাহিত্যের পথে, কালান্তর

রবীন্দ্র-রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড) : বিশ্বপরিচয়, বাংলাভাষা-পরিচয়, পথের সঞ্চয়, ছেলেবেলা, সভ্যতার সংকট

রবীন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্দশ খণ্ড) : আত্মপরিচয়, সাহিত্যের স্বরূপ, মহাত্মা গান্ধী, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, সমবায়নীতি, খৃষ্ট, পল্লীপ্রকৃতি

রবীন্দ্র-রচনাবলী (ষোড়শ খণ্ড) : শিক্ষা, বাংলা শব্দতত্ত্ব, সংগীতচিন্তা

৮.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের এমন এক দিগন্ত প্রসারী ব্যক্তিত্ব, যিনি শুধু কবি বা সাহিত্যিক নন, বরং এক বিশ্বমানবতাবাদী চিন্তাশীল লেখক, যাঁর রচনায় যুগের অন্তরাধুনিক সুর ধ্বনিত হয়েছে বারবার। কবিতা, গান, গল্প, নাটকের পাশাপাশি প্রবন্ধ সাহিত্যেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গভীর মননের অধিকারী; তাঁর লেখনী ছিল যুক্তিবোধে ঋদ্ধ, অনুভূতিতে প্রগাঢ়, আর ভাষায় অপূর্ব শিল্পরসের আধার। তিনি সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন ও মানবজীবনের নানা দিক নিয়ে যেমন গভীর বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি প্রকাশ ভঙ্গির সুষমা ও সাবলীলতায় প্রবন্ধকে করেছেন সাহিত্যের এক অনন্য শাখা। তাঁর প্রবন্ধসমূহ কেবল তাত্ত্বিক ভাবনার নিদর্শন নয়, বরং এক গভীর মানবিক দায়বদ্ধতার স্বাক্ষর। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রাবন্ধিক নন, বরং এক দূরদর্শী ভাবুক, যাঁর চিন্তা আজও আমাদের আলো জোগায়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বিভিন্ন দিক উঠে আসে সমাজ, রাষ্ট্র, ছন্দ, সাহিত্য, শিক্ষা ইত্যাদি

বিষয়। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন পনের বছর বয়স থেকেই। পরে তা দীর্ঘ দিন এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

পাঠকের সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিকে কয়েকটিভাবে ভাগ করা হয়েছে যথা—

আত্মপরিচয় : 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা'

বিশ্বযাত্রী : য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'

পত্রাবলী : ছিন্নপত্রাবলী, (ইন্দিরাদেবীকে লিখিত), ভানুসিংহের পত্রাবলী

চারিত্রপূজা : 'বিদ্যাসাগর-চরিত', 'ভারতপথিক রামমোহন রায়', 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'মহাত্মাগান্ধী', 'বুদ্ধদেব', 'খৃস্ট'

শিক্ষা : 'শিক্ষার হেরফের', 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ', 'শিক্ষাসংস্কার', 'শিক্ষাসমস্যা', 'জাতীয় বিদ্যালয়', 'আবরণ', 'তপোবন', 'ধর্ম-শিক্ষা', 'শিক্ষাবিধি', 'লক্ষ্য ও শিক্ষা', 'স্ত্রীশিক্ষা', 'শিক্ষার বাহন', 'ছাত্রশাসনতন্ত্র', 'অসন্তোষের কারণ', 'বিদ্যার যাচাই', 'বিদ্যাসমবায়', 'শিক্ষার মিলন', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', 'শিক্ষার বিকিরণ', 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি', 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ', 'আশ্রমের শিক্ষা', 'ছাত্রসম্ভাষণ'।

শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ:

একত্রিশ বছর বয়সে তিনি শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' লিখেছিলেন। 'শিক্ষাবিধি' প্রবন্ধে শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে উঠার কথা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে বলেছেন। 'বিদ্যাসমবায়' প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটনার কথা বলেন তা অবশ্যই দেশীয় ঐতিহ্য বজায় রেখে। 'লিপিকা' প্রবন্ধ গ্রন্থে তিনি 'তোতাকাহিনী' প্রবন্ধে আধুনিক যান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন। নারী ও পুরুষের শিক্ষার মধ্যে তিনি কোনো পার্থক্য মেনে নিতে চাননি 'স্ত্রীশিক্ষা'র প্রবন্ধে তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ কিছু শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধের নাম এখানে উল্লেখ করা হল—

'শিক্ষা-সংস্কার' (১৯০৬), 'শিক্ষা-সমস্যা' (১৯০৬), 'ধর্মশিক্ষা' (১৯১১), 'তপোবন' (১৯১২) 'শিক্ষার মিলন' (১৯২১), 'ছাত্র-সম্ভাষণ' (১৯৩৬) প্রভৃতি।

রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধ সাহিত্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। আবার কখনো বা তিনি সাম্যের কথাও বলেছেন। সমকালীন সমাজের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথাও তাঁর প্রবন্ধে উঠে আসে। তিনি 'কালান্তর' (১৯৩৭) প্রবন্ধ গ্রন্থে জনকল্যাণের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। ঠিক তেমনি 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) প্রবন্ধে শোষক ইংরেজকে ধিক্কার জানাতেও ছাড়েননি।

সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ:

সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকের রচনা নিয়েও

সমালোচনা করেছেন। এখানে বাদ পড়েনি বিদেশি সাহিত্যের কথাও। 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭) প্রবন্ধে লেখক সংস্কৃত সাহিত্যের কথা সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'সাহিত্য' গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল— 'সাহিত্যের তাৎপর্য', 'সাহিত্যের সামগ্রী', 'সাহিত্যের বিচারক', 'সৌন্দর্যবোধ', 'বিশ্বসাহিত্য', 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য', 'সাহিত্যসৃষ্টি', 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য', 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', 'কবিজীবন'। সংযোজন অংশে রেখেছেন 'কাব্য: স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট', 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য' ইত্যাদি। প্রাবন্ধিক এখানে বাইরের জগতকে শিল্পী হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে হৃদয়ের 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' আর এক নতুন জগত সৃষ্টি করার কথা বলেন। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৩১৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল— 'ছেলে ভুলানো ছড়া', 'কবিসংগীত', 'গ্রাম্যসাহিত্য' ইত্যাদি।

জীবনী ও ভ্রমণকাহিনি বিষয়ক প্রবন্ধ:

এই প্রবন্ধগুলিতে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাই। 'জীবনস্মৃতি' ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এখানে কবি বর্তমানের চোখে অতীত জীবনকে দেখেছেন। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের বিষয়গুলি হল— সূচনা, শিক্ষারম্ভ, ঘর ও বাহির, ভৃত্যরাজক তন্ত্র, নর্মাল স্কুল, কবিতা-রচনারম্ভ, নানা বিদ্যার আয়োজন, বাহিরে যাত্রা, কাব্যরচনাচর্চা, শ্রীকণ্ঠবাবু, বাংলাশিক্ষার অবসান, পিতৃদেব, হিমালয়যাত্রা, প্রত্যাবর্তন, ঘরের পড়া, বাড়ির আবহাওয়া, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, গীতচর্চা, সাহিত্যের সঙ্গী, রচনাপ্রকাশ, ভানুসিংহের কবিতা, স্বাদেশিকতা, ভারতী, আমেদাবাদ, বিলাত, লোকেন পালিত, ভগ্নহৃদয়, বিলাতি সংগীত, বাল্মীকি প্রতিভা, সন্ধ্যাসংগীত, গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ, গঙ্গাতীর, প্রিয়বাবু, প্রভাতসংগীত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কারোয়ার, প্রকৃতির প্রতিশোধ, ছবি ও গান, বঙ্কিমচন্দ্র, জাহাজের খোল, মৃত্যুশোক, বর্ষা ও শরৎ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, কড়ি ও কোমল। প্রাবন্ধিকের কথায় বলা যেতে পারে— "মনে করিয়াছিলাম, জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু, দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে- তাহা কোন্-এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে- সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে; (জীবনস্মৃতি; পৃষ্ঠা-৯)"। কোথাও এসেছে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' প্রসঙ্গ, আবার কোথাও বা চাকর শ্যামের, ঈশ্বরের কথা বলেছেন।

'পিতৃদেব' অংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন— "কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা বুঝাইয়া দান - দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া (জীবনস্মৃতি; পৃষ্ঠা-৪৯)।" এই গ্রন্থের ভাব ও ভাবনা আমাদের ক্রমশ মানসিক পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরীকে যে সব চিঠি লিখেছেন তার অধিকাংশ চিঠি রয়েছে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে। এটি ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই চিঠিগুলি সংকলন ও

সম্পাদনা করেন। 'জাপানযাত্রী' (১৯১৯), 'ছেলেবেলা' (১৯৪০) প্রবন্ধে রবিঠাকুরের জীবন কাহিনি উঠে এসেছে।

ধর্ম-দর্শন ও অধ্যাত্ম বিষয়ক:

মানুষের মাঝে সর্বদা বেঁচে থাকতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর প্রধান ধর্মই ছিল মানব প্রেম। মানবতা বোধ থেকেই তিনি ঈশ্বরকে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর 'সঞ্চয়' (১৯১৬), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে মানব ধর্মের। এই পর্বের আরো কিছু প্রবন্ধের নাম হল— 'উপনিষদ ব্রহ্ম' (১৯০১), 'ধর্ম' (১৯০৯), 'বিকাশ' (১৯৪১), 'বিশ্বভারতী' (১৯৫১) ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র:

মনের ভাবনা শুধু সাহিত্য রচনার মধ্যে প্রকাশ করেননি প্রাবন্ধিক। বিশ্বের আনন্দধারা যা কিছু উপলব্ধি করতেন সেগুলিকে শব্দবন্দি করে রাখতে দেখা গিয়েছে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে। যেমন বলা যেতে পারে— 'চিঠিপত্র' (১৮৮৭), 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯০৭) 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (১৯৩০), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১) ইত্যাদি রচনাগুলিতে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্যের রচনাশৈলী

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের রচনাশৈলীর কিছু দিক তুলে ধরা হল—

- রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ সাহিত্যকে রূপ এবং রসে বৈচিত্র্য নিয়ে এলেন। উপস্থাপন কাঠামোকে সাজালেন নতুন ভাবে।
- রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যে ভাব পেয়েছে। তার সনেও জ্ঞানের দিকটি পেয়েছে প্রাধান্য।
- রবীন্দ্রনাথের হাতে সমালোচনা সাহিত্য ধরা দিল সৃষ্টিশীল সাহিত্য রূপে। পাঠকের ভালোলাগা এবং মন্দলাগার ওপরে গুরুত্ব দিয়েও তিনি সমালোচনা সাহিত্য নতুন মাত্রা এনে দিলেন।
- 'লিপিকা' কাব্যে এসে তিনি কাব্যধর্মী গদ্যের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ভাষা আরো সমৃদ্ধ করে তুললেন 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধগুলিতে, মৌখিক গদ্যভাষার প্রসঙ্গ এসে পড়েছে 'ছেলেবেলা'। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ-সাধনে দ্বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেই দিন য়ুরোপের বড়ো দিন। আমাদের দেশেও সেই বড়ো দিনের অপেক্ষা করব-সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা। বাংলা ভাষাকে চিনতে হবে ভালো ক'রে; কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দুর্বলতা, দুইই আমাদের জানা চাই।"



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৮.৪ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)

১৮৬৪ সালের ২০ আগস্ট রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার জেমো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা গোবিন্দসুন্দর এবং মা চন্দ্রকামিনী। ১৮৭০ সালের ২৫ মে ছয় বছর বয়সে রামেন্দ্রসুন্দর প্রথম স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৮৮ সালে পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। রামেন্দ্রসুন্দরের নেশা ছিল সাহিত্য-চর্চা আর পেশা অধ্যাপনা। রামেন্দ্রসুন্দরই প্রথম পরিষদের ধ্যান-ধারণাকে গতি দান করেছেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দের ২৪ অগ্রহায়ণ থেকে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২৪ জ্যৈষ্ঠ- এই প্রায় সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তিনি নিবিড় ভাবে যুক্ত ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের ছিল যুক্তিবাদী মন। আর এই মনকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব সংসারের জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন নিজের মতো করে। তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছে ত্রিধারা যেমন বলা যেতে পারে— বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্যকে যেন এক সূত্রে গেঁথে তুলতে চেয়েছেন। আমরা বলব তিনি এই ত্রিধারর সেবক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে—



জেনে রাখা ভালো

বি.এ পড়ার সময়েই তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'মহাশক্তি' ১২৯১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

"তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্র সুন্দর, আমি তোমাকে সাদরে অভিবাদন করিতেছি।"

তিনি তাঁর সুন্দর মন-মানসিকতা নিয়ে আমাদের কাছে যে সকল গ্রন্থসমূহ উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'প্রকৃতি' (১৮৯৬); 'পুণ্ডরীক কুলকীর্ত্তি পঞ্জিকা' (১৯০০); 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪); 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬); 'পদার্থবিদ্যা'; 'মায়াপুরী' (১৯১১); 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' (১৯১১)); 'চরিতকথা' (১৯১৩); 'কর্মকথা' (১৯১৩) 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৯১৪); 'ভূগোল' 'শব্দকথা' (১৯১৭); 'যজ্ঞকথা' (১৯২০); 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০); 'নানাকথা' (১৯২৪); 'জগৎকথা' (১৯২৬) ইত্যাদি। তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে ছোটদের নিয়েও অনেক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। যা ছোটদের আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা দানও ঘটিয়েছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ-সাহিত্যের রচনাশৈলী

- খুব সচেতন ভাবে তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে তুলে ধরে যথাযথভাবে প্রচার ঘটিয়ে গেছেন।
- রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর রচনায় উপমার ব্যবহার খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করে গেছেন।
- তিনি কঠিন তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে অনেক সহজ উদাহরণ এনে বিষয়টি মসৃণ করে তুলেছিলেন।
- সাধু ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি অনেক বেশি মননশীল ছিলেন।
- তাঁর রচনার আর একটি বিশেষ দিক হল তৎসম শব্দের প্রয়োগ। এই প্রয়োগ তাকে যেন

দক্ষ শিল্পী রূপে পাঠকদের কাছে পরিস্ফুট করে তুলে।

- তাঁর রচনায় প্রয়োজন মতো যর্থাথ যতিচিহ্ন ব্যবহার ছিল। এই বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর 'সুখ না দুঃখ' প্রবন্ধটি দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে জটিল বাংলা শব্দ পরিহার করে অতি সহজ চেনা ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।
- তাঁর রচনার একটি উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্য হল একই ধরনের শব্দের প্রয়োগ করে তিনি নিজস্ব একটা বাক্য স্পন্দন সৃষ্টি করেছেন। যেমন- "অগত্যা বলিতে হয়, অমঙ্গলের উদ্দেশ্য মঙ্গলাত্মক; অগত্যা বলিতে হয়, মঙ্গল সম্পাদনের জন্য অমঙ্গলের বিকাশ।" (অমঙ্গলের উৎপত্তি)
- বেশ কিছু রচনায় দেখা গিয়েছে গদ্য ভাষা ও কাব্যরস সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' প্রবন্ধের সামান্য অংশ তুলে ধরলে বিষয়টি সহজ হবে— "মনুষ্যমাত্রেরই জীবনকালে এমন একটি মুহূর্ত আইসে, যখন সে সুন্দর বন প্রদেশ হইয়ে সায়ংকালীন বংশীধ্বনি বর্ণগত করিয়া চন্দ্রাপীড়ের ঘোড়ার মতো সেই অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দিগ্বিদিকে ছুটিতে থাকে,....."
- তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতির একটি নিজস্ব ঘরনা ছিল একটা।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৮.৫ প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

প্রমথ চৌধুরীকে বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। তিনি ১৮৬৮ সালের ৭ই অগাষ্ট যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী জমিদার ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শন অনার্স নিয়ে ১৮৮৯ সালে পাস করেন। পরে ইংরাজিতে এম-এ পাস করেন ১৮৯০ সালে। ১৮৯৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করেন। ১৯১৪ সালে মাসিক সবুজপত্র প্রকাশনা করেন এবং তার মাধ্যমে বাংলা গদ্যরীতির প্রবর্তন করে জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তির পরিচয় রাখেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর প্রধান খ্যাতি মননশীল প্রবন্ধ রূপে। তবে তিনি উচ্চ মানে কবিতা ও গল্পও রচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর সাহিত্যে- প্রবন্ধ, সনেট, ছোটগল্প ইত্যাদি বিষয়কে আটপৌরে চলিত ভাষায় রচনা করে একজন সার্থক কথা-সাহিত্যিক রূপে পরিচিতি পান।



জেনে রাখা ভালো

বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন। 'বীরবল' ছদ্মনামে তিনি 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ব্যঙ্গরসাত্মক প্রবন্ধ রচনা প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যান্য সম্পাদিত পত্রিকাগুলি হল 'বিশ্বভারতী' (১৩৪৯-৫০), 'রূপ ও রীতি' (১৩৪৭-৪৯) এবং অলকা।

প্রবন্ধগ্রন্থ

'তেল-নুন-লকড়ি' (১৯০৬), 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানাকথা' (১৯১৯), 'আমাদের শিক্ষা' (১৯২০), 'দু-ইয়ার্কি (১৯২১), 'বীরবলের টিপ্পনী' (১৯২১, 'রায়তের কথা' (১৯২৬), 'নানা চর্চা' (১৯৩২), 'বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' (১৯৩৪), 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' (১৯৪০), 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু মুসলমান' (১৯৫৩)



জেনে রাখা ভালো

প্রমথ চৌধুরীর প্রথম প্রবন্ধ 'জয়দেব' প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকায়।

গল্পগ্রন্থ

'চার ইয়ারি কথা' (১৯১৬), 'আহুতি' (১৯১৯), 'নীললোহিত' (১৯৩২), 'গল্প সংকলন' (১৯৪১)।

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ-সাহিত্যের রচনাশৈলী

- বাংলা গদ্যের সচেতন প্রতিফলন ঘটতে দেখা গিয়েছে 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭) প্রবন্ধগুলিতে। একে 'বীরবলী গদ্য'ও বলা হয়ে থাকে। 'সবুজপত্র' পত্রিকা চলিত গদ্যকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আসন দান করার মাধ্যম।
- তাঁর রচনার একটি বিশেষ দিক হল সাহিত্যের ভাষাকে তিনি মুখের ভাষার অনেক কাছে পৌঁছে দিয়েছেন; পাঠক মহলে।
- এ ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে চলিত ভাষার পক্ষপাতী হলেও তাঁর গদ্যরীতিকে 'মৌখিক গদ্যরীতি' কোনো ভাবে বলা যাবে না।
- তিনি ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তাই তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে ভাষা এবং সাহিত্য দু'রকমের রচনাই উপস্থাপন করা। তারা ভাষা বিষয়ক রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসাবে বলা যেতে পারে— 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা', 'কথার কথা', 'আমাদের ভাষা সঙ্কট', 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা', 'বাংলা ব্যাকরণ' ইত্যাদি এবং সাহিত্য বিষয়ক রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'সাহিত্যে চাবুক', 'সাহিত্যে খেলা', 'কাব্যে অশ্লীলতা' ইত্যাদি। তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "তাঁহার রচনা শুধু সাহিত্যগুণ সম্পন্ন নহে, এক অভিনব ভাব প্রকাশরীতির প্রবর্তক নহে, পরন্তু এক চিরবিস্মিত এবং ফরাসি দেশের দৃষ্টান্ত হইতে নতুন করিয়া শেখা জীবনদর্শনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা রূপে আমাদের ভাব জীবনের চিরন্তন সম্পদ।....."
- কথকতার সুলভ প্রকাশভঙ্গি, ব্যঙ্গ ও পরিহাস প্রবণতা এটিও তাঁর গদ্যসাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে 'তেল-নুন-লকড়ি' প্রবন্ধটির কথা।
- তিনি বিশ্বাস করতেন আঙ্গিকের কাঠিন্যতা নয়, তা থেকে সাহিত্যকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলা যেতে পারে, তাঁর গদ্য 'ইস্পাতের ছুরি'র মতো যেন।

- পাঠকের মনে থাকবে তিনি কিভাবে মুখের কথা শিল্পকথায় রূপান্তরিত করেছেন
- বুদ্ধিদীপ্ত তির্যকভঙ্গি তাঁর গদ্য-পদ্য রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- শাণিত যুক্তি ও আলঙ্কারিক ভাষা প্রয়োগেও তিনি দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।
- তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন ফরাসি সাহিত্যের রচনা। নিজস্ব রচনাশৈলীকে বজায় রেখে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৮.৬ রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)

সাহিত্য ও চিন্তার ইতিহাসে প্রাবন্ধিক রাজশেখর এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিত ও সাহিত্যতাত্ত্বিক, যিনি কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র নিয়ে সুগভীর আলোচনা করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে যুক্তির বিশ্লেষণ, শৈল্পিক সৌন্দর্যবোধ এবং সাহিত্যবিষয়ক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। রাজশেখরের প্রবন্ধধর্মী রচনাগুলিতে সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য, কাব্যের প্রকৃতি, কবির দায়িত্ব ও সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে তাঁর চিন্তা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। বিশেষত, তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থটি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে, যা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সেতুবন্ধন হিসেবেও বিবেচিত হয়। তাঁর লেখনীতে একদিকে যেমন বিদ্যাচর্চার মনন, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে এক শিল্পসংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি-যা তাঁকে একজন অসামান্য প্রাবন্ধিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

জীবন ও কর্ম

রাজশেখর বসু ১৮৮০ সালে ১৬ই মার্চ মঙ্গলবার বর্ধমান জেলায় শক্তিগড়ের কাছে মাতুলালয় বামুনপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক বাড়ি ছিল নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের কাছে উলা বীরনগরে। পিতা চন্দ্রশেখর ও মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী। ১৮৯৭ সালে তিনি পাটনা কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯০২ সালে রিপন কলেজ থেকে বি-এল পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে মাত্র তিনদিন কোর্টে যান। পরে আবার ফিরে আসেন বিজ্ঞানচর্চার স্বক্ষেত্রে। ১৯০৩ সালে তিনি কেমিস্ট হিসাবে বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দিলেন। পরে ম্যানেজার পদে যুক্ত হন। রাজশেখর বসুর পত্নী মৃণালিনী দেবী। তাঁদের একমাত্র কন্যা প্রতিমা (১৯০১-১৯৩৪)। এক সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন। তারপর এলেন রাজশেখর বসু। তাঁর কথায় বলা যেতে পারে— "সকল দেশেই অল্প কয়েকজন বিচক্ষণ বোদ্ধা সাহিত্যের বিচারকের পদ অধিকার করেন।"



জেনে রাখা ভালো

রাজশেখর বসুর ডাকনাম ছিল ফটিক। আর ছদ্ম নাম ছিল পরশুরাম। 'চলন্তিকা' রাজশেখর বসুর এক অসামান্য কীর্তি। এই সংকলিত অভিধান পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠিতে জানিয়েছেন-"এতদিন পরে বাঙলা ভাষার অভিধান পাওয়া গেল। পরিশিষ্টে চলন্তিকায় বাঙলার যে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ দিয়েছেন তাও অপূর্ব হয়েছে।" গড্ডালিকার গল্পগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ রাজশেখর বসুকে অভিনন্দিত করেন।

১৯৫৫ সালে তিনি 'চলন্তিকা' অভিধানের জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার পান। তিনি 'আনন্দীবাঈ ইত্যাদি' গল্পের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পান ১৯৫৬ সালে। তিনি কালিদাসের 'মেঘদূত' গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় রাজশেখর বসুর দু'টি ছোটগল্প অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। পরশ পাথর এবং বিরিঞ্চি বাবা অবলম্বনে তৈরি হয়েছিল 'মহাপুরুষ' ছবিটি।

রাজশেখর বসুর গ্রন্থ

তিনি গল্প লেখার পাশাপাশি অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে তাঁর প্রবন্ধ সংকলন 'লঘুগুরু' প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম সংস্করণের প্রবন্ধগুলি হল 'নামতত্ত্ব' (১৩৩০) 'ডাক্তারি ও কবিরাজি' (১৩৩১), 'ভদ্র জীবিকা' (১৩৩২), 'রস ও রুচি' (১৩৩৪), 'অপবিজ্ঞান (১৩৩৬), 'ঘনীকৃত তৈল' (১৩৩৭), 'ভাষা ও সংকেত' (১৩৩৮), 'সাধু ও চলিত ভাষা' (১৩৪০), 'বাংলা পরিভাষা' (১৩৪০), সাহিত্য বিচার' (১৩৪১)। পরে দেখা গিয়েছে (১৩৬৯) খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে আটটি নতুন প্রবন্ধ সংযোজিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'খ্রিস্টীয় আদর্শ' (১৩৪৯), 'তিনি' (১৩৪৯), 'ভাষার বিশুদ্ধি (১৩৫০), 'প্রার্থনা' (১৩৫০), 'সংকেতময় সাহিত্য' (১৩৫০), 'বাংলা বানান' (১৩৫১), 'বাংলা ছন্দের শ্রেণি' (১৩৫২), 'রবীন্দ্র পরিবেশ' (১৩৫৫)। তাঁর ১৩৬২ সালে প্রকাশিত 'বিচিন্তা' প্রবন্ধ সংকলনে (প্রথম সংস্করণে) পনেরটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। সেগুলি হল— 'ইহকাল পরকাল (১৩৫৫), 'বিলাতী খ্রিস্টান ও ভারতীয় হিন্দু' (১৩৫৭), 'ভেজাল ও নকল' (১৩৫৭), 'ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার' (১৩৫৭), 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' (১৩৫৮), 'বাঙালির হিন্দি চর্চা (১৩৫৮), 'সাহিত্যিকের ব্রত', 'ভারতীয় সভ্যতা' (১৩৫৮), 'জীবনযাত্রা' (১৩৫৯), 'জন্মশাসন ও প্রজাপালন' (১৩৬০), 'বাংলা ভাষার গতি' (১৩৬০), 'জাতিচরিত্র' (১৩৬১), 'সমদৃষ্টি' (১৩৬১), 'অশ্রেণিক সমাজ' (১৩৬১), 'বিজ্ঞানের বিভীষিকা (১৩৬২)। ঠিক তার পরবর্তী সংস্করণে এই গ্রন্থে আরও তিনটি প্রবন্ধ স্থান পায়। সেগুলি হল 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান', 'নিসর্গচর্চা', 'সংস্কৃতি ও সাহিত্য'। ১৩৬৫ সালে প্রকাশিত হয় রাজশেখরের প্রবন্ধ সংকলন 'চলচ্চিন্তা'। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি হল- 'আমাদের পরিচ্ছদ' (১৮৭৮), 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৮৭৮), 'গল্পের বাজার' (১৮৭৯), 'সাহিত্যের পরিধি' (১৮৭৯), 'বানানের সমতা ও সরলতা' (১৮৭৯), 'আচার্য-উপাচার্য' ইত্যাদি।

রাজশেখর বসুর প্রবন্ধ-সাহিত্যের রচনাশৈলী

- তাঁর রচনা রীতিতে প্রকাশ পায় তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রামেন্দ্রসুন্দরের যথার্থ উত্তরসূরী।
- প্রবন্ধ ছিল তাঁর অনেক বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি।
- ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যন্ত ধারালো ও শ্লেষ মিশ্রিত বাক্যবাণ।
- তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধে ভাষার শুদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে- 'গ্রহণীয় শব্দ', 'ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার', 'বাংলা ভাষার গতি', 'ভাষার বিশুদ্ধি' প্রভৃতি।
- তাঁর ভাষাশৈলীর গঠনের সম্পর্কে একটি উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, যেমন- 'লক্ষ্মীর বাহন' প্রবন্ধের মন্তব্য- 'বণিকের একটি নাম সাধু, পাকা ব্যবসাদার মাত্রেই পাকা সাধু'।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৪। প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু গ্রন্থ সম্পর্কে পরিচয় প্রদান করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৮.৭ বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৮)

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে যুগে যুগে বিভিন্ন প্রাবন্ধিক তাঁদের অমূল্য স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তিনি ১৯০৮ সালের ৩০শে নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লায়। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮ই মার্চ ১৯৭৮ সালে। তাঁর পিতা ছিলেন ভূদেবচন্দ্র বসু। এবং মাতা ছিলেন বিনয়কুমারী বসু। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তিনি কলেজিয়েট স্কুলে পড়াকালীন ১৯২৩ সালে 'পতকা' ও 'ভগ্নরথ' নামে দু'টি হাতে লেখা পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। বার বছর বয়সে তিনি 'ডাক' নামে একটি কবিতা লেখেন। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্মবাণী' এটি 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর পর তিনি ধীরে ধীরে প্রবন্ধ সাহিত্যে মনোনিবেশ শুরু করেন। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা বেশি না হলেও তার জন্য তিনি কালজয়ী হয়ে থাকবেন। রবীন্দ্র উত্তরকালের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ

তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থগুলো হল— 'উত্তর তিরিশ' (১৯৪৫), 'কালের পুতুল' (১৯৪৬), 'সাহিত্য চর্চা' (১৯৫৪), 'রবীন্দ্রনাথ: কথা সাহিত্য' (১৯৫৫), 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' (১৯৫৭), 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৩), 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', (১৯৩৫), 'জাপানী জার্নাল' (১৯৬২), 'দেশান্তর' (১৯৬৬), 'মহাভারতের কথা' (১৯৭৪), কবিতার শত্রু ও মিত্র' (১৯৭৪)।



জেনে রাখা ভালো

তাঁর কিছু কাব্যগ্রন্থ হল— বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, নতুন পাতা প্রভৃতি। কবিতা ও প্রবন্ধের পাশাপাশি তিনি নাটকও রচনা করেছেন। তাঁর নাটক ও কাব্যনাট্যগুলি মধ্যে হল- একটি মেয়ের জন্য (১৯২৭), রাবণ (১৯৩১) অনুসূয়া (১৯৩৩), মায়ামালঞ্চ (১৯৩৩), অনাম্নী অঙ্গনা (১৯৬৯), প্রথম পার্থ (১৯৭০)। তিনি কিছু গল্পগ্রন্থও লিখেছেন— রজনী হ'লো উতলা (১৯২৬), নতুন নেশা (১৯৩৩), শনিবারের বিকেল (১৯৩৬) প্রভৃতি। এছাড়াও চেকভের অনুদিত একটি গল্প 'কাল একটি পরীক্ষা'। বুদ্ধদেব বসুর কিছু উপন্যাস হল— সাড়া (১৯২৮-৩০), ধূসর গোধূলি (১৯৩২), একদা তুমি প্রিয়ে (১৯৩৩), বিশাখা (১৯৪৫), তিথিডোর (১৯৪৭-৪৯) প্রভৃতি। তিনি ১৯৬৭ সালে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কাব্যনাট্যের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৭০ সালে পদ্মভূষণ পুরস্কার লাভ করেন।

বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা সাহিত্য

- রামায়ণ (১৯৪৭)
- মেঘদূত (১৯৫৭)
- মহাভারত
- কথাসাহিতিক ও গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ
- কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬)

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ-সাহিত্যের রচনাশৈলী

- বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক হল রবীন্দ্র সমালোচনার দিকটি।
- কাব্যময়তা, মার্জিত রুচি এবং বিশিষ্ট গদ্য রীতিতে তাঁর সমালোচনা সাহিত্যের এই দিকটি তুলে ধরে বিশিষ্ট সাহিত্য রস পরিণত করেন।
- তাঁর রচনার অন্য একটি দিক হল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য সাহিত্যিকদের নানা রচনায় আলোচনা করেছেন। টলস্টার বোদলেয়র, টি. এস. এলিয়ট, কাফকা থেকে শুরু করে বেদব্যাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম কেউই বাদ যাননি।
- তাঁর রচনায় উপমা সমন্বিত গদ্য ভাষা এবং বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি বুদ্ধদেবের গদ্যসাহিত্য এবং প্রবন্ধ সাহিত্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে।
- বাংলা শিশু সাহিত্যের নানান দিক তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে আলোচনা করেছেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় 'বাংলা শিশুসাহিত্য' (১৯৫২) প্রবন্ধ গ্রন্থে।
- তাঁর রচনার আর একটি বিশেষ গুণ গদ্যভাষার বিশুদ্ধ উপস্থাপন। যা তাকে সহজেই মননশীল শিল্পী করে তুলেছে।
- বুদ্ধদেব বসুর কাব্যিক উপমা, শব্দ-স্পন্দন, ছন্দ ও সুরের দোলা নতুন মাত্রা এনে নিয়েছিল গদ্য রচনায়।

- তাঁর গদ্যভাষা শৈলীতে ছিল নিজস্ব জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন।
- তাঁর গদ্যসাহিত্যের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সমালোচনা সাহিত্য। যার মধ্যে রয়েছে মননশীলতা।

৮.৮ অধ্যায় সংক্ষেপ

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের বিকাশে যাঁরা পথিকৃৎ ও পথপ্রদর্শক হিসেবে অমর হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু এবং বুদ্ধদেব বসু-এই পাঁচজনের অবদান সর্বজনস্বীকৃত ও অনস্বীকার্য। এঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব চিন্তাভাবনা, ভাষার ভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মননের বৈশিষ্ট্য দিয়ে বাংলা প্রবন্ধকে এনে দিয়েছেন এক শক্তিশালী সাহিত্যিক ভিত্তি।

রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধকে দিয়েছিলেন আধ্যাত্মিকতা, মানবতাবাদ ও গভীর জীবনবোধের এক আলোকোজ্জ্বল মাত্রা। তাঁর ভাষা ছিল কাব্যিক, দার্শনিক ও মরমিয়াভাবপূর্ণ, যা প্রবন্ধকেও করে তুলেছিল সাহিত্যসম্মত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিজ্ঞানের জগৎ থেকে শুরু করে সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করে পাঠকচেতনাকে বিস্তৃত করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক, যিনি প্রবন্ধে ব্যক্তিগত রুচি, রসবোধ ও শৈল্পিক চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়েছেন সহজ-সরল অথচ ব্যতিক্রমী ভঙ্গিতে। রাজশেখর বসু তাঁর ব্যঙ্গ-রসাত্মক অথচ তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণধর্মী রচনার মাধ্যমে পাঠককে যেমন আনন্দ দিয়েছেন, তেমনি সমাজ ও মানুষের নানা অসংগতি নিয়ে গভীর চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু আধুনিকতাবাদী বোধ ও বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রবন্ধকে করে তুলেছেন চিন্তাশীল, মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনার একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

এই প্রাবন্ধিকদের মিলিত অবদান বাংলা প্রবন্ধকে শুধু সাহিত্যের একটি শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেনি, বরং এটিকে জ্ঞান, যুক্তি, রুচি ও রসের এক সংবেদনশীল ক্ষেত্র করে তুলেছে। তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে একাধারে মননশীল, রসনীয় এবং সমাজ-সংলগ্ন এক শিল্পরূপ। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণ ও তার ধারাবাহিক উৎকর্ষে এই মনীষীদের অবদান আজও আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।



৮.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- বাংলা গদ্য সাহিত্যের গতিধারা সম্পর্কে জানলাম।
- গদ্যে ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতটা প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে নির্বাচিত প্রাবন্ধিকের সমালোচনায় জানতে পারলাম।
- শুধু বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সমালোচনা নয়, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারলাম এই অধ্যায়ে।
- নির্বাচিত লেখকদের রচনা কৌশল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

৮.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। রবীন্দ্রনাথে প্রবন্ধে বিভিন্ন দিক উঠে আসে সমাজ, রাষ্ট্র, ছন্দ, ইত্যাদি বিষয়। ...একত্রিশ বছর বয়সে তিনি শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' লিখেছিলেন। ...সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে এখানে প্রাবন্ধিক অন্যান্য লেখকের লেখা নিয়েও সমালোচনা করেছেন। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৮.৩ অংশ)

২। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের ছিল যুক্তিবাদী মন। ...তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে ছোটোদের নিয়েও অনেক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৮.৪ অংশ)

৩। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক। ...সুচারু গদ্যশিল্পী রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ দেখা যায় যে সব গ্রন্থে সেগুলি হল— ...। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৮.৫ অংশ)

৪। তিনি গল্প লেখার পাশাপাশি অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ...পরে দেখা গিয়েছে ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে আটটি নতুন প্রবন্ধ সংযোজিত হয়...। ১৩৬৫ সালে প্রকাশিত হয় রাজশেখরের প্রবন্ধ সংকলন 'চলচ্চিন্তা'। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৮.৬ অংশ)

৫। রবীন্দ্র উত্তরকালের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। ...কাব্যময়তা, মার্জিত রুচি এবং বিশিষ্ট গদ্য রীতিতে তাঁর সমালোচনা সাহিত্যের এই দিকটি তুলে ধরে বিশিষ্ট সাহিত্য রস পরিণত করেন। ...তাঁর রচনার আর একটি বিশেষ গুণ গদ্যভাষার বিশুদ্ধ উপস্থাপন। যা তাকে সহজেই মননশীল শিল্পী করে করে তুলেছে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৮.৭ অংশ)

৮.১১ অতিরিক্ত পঠন

- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার; (২০১৭); আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; কলকাতা : প্রজ্ঞাবিকাশ
- চৌধুরী, প্রমথ (১৯৫৭); প্রবন্ধ সংগ্রহ; কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; (১৪১৭); রবীন্দ্র-রচনাবলী, (এক খণ্ড-অষ্টাদশ খণ্ড); কলকাতা : বিশ্বভারতী
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; (আষাঢ়, ১৪২১); জীবনস্মৃতি; কলকাতা : বিশ্বভারতী
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; (জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯); বাংলাভাষা-পরিচয়; কলকাতা : বিশ্বভারতী
- ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর; (২০১৪); বেদ-কথা-যজ্ঞ-কথা; কলকাতা : সোমলতা
- ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর; (২০২৩); রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নির্বাচিত রচনা; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার; (২০১৪-২০১৫); বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার; (২০১৫); বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা; কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- বসু, বুদ্ধদেব; (২০১৪); প্রবন্ধ-সংকলন; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং
- বসু, রাজশেখর; (২০১৪); রাজশেখর বসু প্রবন্ধাবলী; কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ
- বসু, রাজশেখর; (১৩৪৬); লঘুগুরু; কলকাতা : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
- সেন, সুকুমার; (১৩৪১); বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য; কলকাতা : রঞ্জন প্রকাশালয়



৮.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ ও গদ্যশৈলী সম্পর্কে যা জান লিখুন।

২। প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ ও গদ্যশৈলী সম্পর্কে নীতিদীর্ঘ আলোচনা করুন।

৩। প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর গদ্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করুন।

৪। প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসুর গদ্যশৈলী আলোচনা করুন।

৫। প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ ও গদ্যশৈলী সম্পর্কে নীতিদীর্ঘ আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ৯ : আধুনিক বাংলা নাটক-২

বিন্যাস ক্রম

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৯.২ পরিচিতি

৯.৩ নাট্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- ৯.৩.১ নাটকের শ্রেণিবিভাগ
- ৯.৩.২ নাটকের বিষয়
- ৯.৩.৩ নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব

৯.৪ নাট্যশিল্পী ক্ষীরোদপ্রসাদ

- ৯.৪.১ নাটকের শ্রেণিবিভাগ
- ৯.৪.২ নাট্যসাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের অবদান

৯.৫ নাট্যশিল্পী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

- ৯.৫.১ নাটকের শ্রেণিবিভাগ
- ৯.৫.২ নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অবদান

৯.৬ নাট্যকার মন্মথ রায়

- ৯.৬.১ মন্মথ রায়ের উল্লেখযোগ্য নাটক
- ৯.৬.২ মন্মথ রায়ের নাটকের বিষয়
- ৯.৬.৩ মন্মথ রায়ের নাট্যসাহিত্যে অবদান

৯.৭ নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য

- ৯.৭.১ বিজন ভট্টাচার্যের উল্লেখযোগ্য নাটক
- ৯.৭.২ নাট্যসাহিত্যে বিজন ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব

৯.৮ অধ্যায় সংক্ষেপ

৯.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে কী শিখলাম

৯.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৯.১১ অতিরিক্ত পঠন

৯.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

পাশ্চাত্য নাট্যপ্রেমী কিছু ব্যক্তির হাত ধরে বাংলায় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানান সংঘর্ষের মধ্য বাংলা নাটক সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে গেছে। এই সমৃদ্ধি পর্বের সাক্ষর রেখেছেন যেসব নাট্যকার তাঁদের নাট্যকৃতি নানান বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এই অধ্যায়ে এইসকল নাট্যকারদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

৯.২ পরিচিতি

বাংলা নাট্যরীতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নানান বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়কে স্থান দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে নাট্যকারেরা বিশেষ করে ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিজন ভট্টাচার্য, মন্মথ রায়েরা বাংলা নাটকের জগতকে বিস্তর পরিমণ্ডলে বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আলোচ্য নাট্যকারেদের মধ্যে সকলেই তাঁদের নিজস্ব নাট্য রীতির গুণে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

৯.৩.০ নাট্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রায় সমস্ত সাফল্যের সঙ্গে বিচরণ করেছেন। মূলত তিনি কবি হলেও নাট্যকার হিসেবে ও তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন শ্রেণির নাটক তিনি লিখেছেন বিশেষ করে রূপক সাংকেতিক নাটক রচনায় তার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

৯.৩.১ নাটকের শ্রেণিবিভাগ:

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে, সেগুলি হল—

১	গীতিনাট্য	'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া' (১৮৮২), 'মায়ার খেলা' (১৮৮২)
২	নিয়মানুগ নাটক	'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯), বিসর্জন' (১৮৯০), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৪), 'মালিনী' (১৮৯৬), 'নরকবাস' (১৯০০), 'গান্ধারীর আবেদন' (১৯০০), 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' (১৯০০)
৩	কৌতুক নাট্য	গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭),
৪	রূপক, সাঙ্কেতিক ও	'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭), 'ব্যঙ্গ-কৌতুক' (১৯০৭), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৫), 'শোধবোধ' (১৯২৫) 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯), 'রাজা'
	তত্ত্বমূলক নাটক	(১৯১০), 'অচলায়তন' (১৯১২), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'গুরু' (১৯১৮), 'অরূপরতন' (১৯১৯), 'মুক্তধারা' (১৯২২), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), 'পরিত্রাণ' (১৯২৯), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২), 'রথের রশি' (১৯৩২), 'তাসের দেশ' (১৩৩৯)
৫	সামাজিক নাটক	'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫), 'বাঁশরী' (১৯৩৩), 'শাধবোধ' (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)

৬	নৃত্যনাট্য	'শাপমোচন' (১৯৩১), 'তাসের খেলা' (১৯৩৩), 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' (১৯৩৭), 'নৃত্যনাট্য শ্যামা' (১৯৩৯)

৯.৩.২ নাটকের বিষয়

গীতিনাট্য: 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা'। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় বাল্মীকির কবিত্ব লাভ নাটকের বিষয়। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বাল্মীকি প্রতিভা পাঠযোগ্য গ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি প্রতিভা তাহা নহে, ইহা সুরে নাটিকা অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই ইহার নাট্য বিষয়টা সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মর্যাদা ইহাতে অল্পস্থলেই আছে। দশরথের হাতে অন্ধ মুনির পুত্রহত্যার বিষয়কে কেন্দ্র করে 'কালমৃগয়া'রচিত হয়েছে। 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, "'বাল্মীকি প্রতিভা'ও 'কালমৃগয়া'এক গোত্রের, 'মায়ার খেলা' ভিন্ন গোত্রের রচনা হিসেবেই নির্দেশিত.... বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাটোর সূত্রে গানের মালা।"

কাব্যনাটক ও নাট্যকাব্য: মানব প্রকৃতির প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের কথা নির্দেশ করেছেন নাট্যকার 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে। গীতিধর্মী কাব্যনাটক 'চিত্রাঙ্গদা' ১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হবার পর 'চিত্রাঙ্গদা'র নৃত্যনাট্য সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৩৪২ বঙ্গাব্দে। চিত্রাঙ্গদার মূল কাহিনি রবীন্দ্রনাথ মহাভারত থেকে সংগ্রহ করেছেন। চিত্রাঙ্গদা কুরূপা বলে অর্জুন তাকে প্রত্যাখ্যান করলে চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে পরমা সুন্দরী হয়। সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে অর্জুন চিত্রাঙ্গদার সান্নিধ্য কামনা করে। শেষে অর্জুন সৌন্দর্যভোগে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং চিত্রাঙ্গদার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে তার প্রতি সত্য প্রেমে আবদ্ধ হয়। প্রেমের সার্থকতা প্রসঙ্গে তৃতীয় দৃশ্যে বসন্ত চিত্রাঙ্গদাকে বলেছে- "ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ তখন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে আপনি ঝড়িয়া প'ড়ে যাবে, তাপক্লিষ্ট লঘু লাবণ্যের দল।"

বিদায় অভিশাপ: 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধে কাব্যের তাৎপর্য প্রসঙ্গে জবানীতে 'বিদায় অভিশাপে'র কাহিনি অংশ বিবৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ, শুক্রচার্যের নিকট হইতে, সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত বৃহস্পতির পুত্র কচকে দেবতারা দৈত্যগুরুর আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে কচ সহস্র বর্ষ নৃত্যগীত বাক্য দ্বারা শুক্র তনয়া দেবযানীর মনোরঞ্জন করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ করিলেন। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল তখন দেবযানী তাহাকে প্রেম জানাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। দেবযানীর প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও কচ নিষেধ না মানিয়া দেবলোকে গমন করিলেন।" উপনিষদের শ্রেয় ও প্রেয়র দ্বন্দ্ব এখানে প্রকাশিত হয়েছে। পুরুষ মহত্তর আদর্শের জন্য অর্থাৎ 'শ্রেয়র জন্য প্রেয়কে ত্যাগ করিতে পারে', এই তত্ত্বটি এখানে ব্যাখ্যা হয়েছে।

বৃহস্পতি পুত্র কচ মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা নিতে স্বর্গ থেকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের আশ্রমে এসে কচ শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে সন্তুষ্ট করেন। দেবযানী কচকে নিয়ে যান

শুক্রাচার্যের কাছে। শুক্রাচার্য কচকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। এরপর কচ সহস্র বছর ধরে শুক্রচার্যের কাছে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করতে থাকেন। দীর্ঘদিন শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে থাকার ফলে নৃত্য-বাদ্য-গীতে পারদর্শী কচ দেবযানীর মন হরণ করে নেন। দেবযানী আকর্ষিত হন কচের প্রতি। দেবযানী কচকে প্রেম নিবেদন করেন। হাজার বছর কেটে গেলে কচের সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হয়। এবার তাঁর স্বর্গে ফিরে যাবার পালা। স্বর্গলোকে এমনই তিনি প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলেন। কচের প্রেমে উন্মত্ত দেবযানী কচকে স্বর্গে ফিরে যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু কর্তব্যকর্মে কৃতসংকল্প কচের পক্ষে দেবযানীর কথা মান্য করা সম্ভব হল না। কচকে নিজের হৃদয় সিংহাসনে বেঁধে রাখতে না পেরে দেবযানী অভিশাপ দিলেন। দেবযানী জানালেন, কচ যে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখেছেন, তা শেখাতে পারলেও প্রয়োগ করতে কখনও পারবেন না। দেবযানী কচকে অভিশাপ দিলেও কচ দেবযানীকে আশীর্বাদ করে স্বর্গে ফিরে এলেন। মহাভারতের আখ্যানকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার জোরে প্রেম কাহিনিতে রূপান্তরিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বর্গের চেয়েও প্রেম ও প্রকৃতির শোভা বড়ো হয়েছে। নীহাররঞ্জন রায় 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা'গ্রন্থে লিখেছেন, "কর্তব্য ও জীবনের গভীরতর উদ্দেশ্যের বশ্যতাই কচ চরিত্রের দীপ্তি ও গৌরব। এই সহজ ও সরল অথচ সুদৃঢ় ও আত্মপ্রত্যয়বান চরিত্রের আশ্রয়েই দেবযানীর সহজ মানবিক শঙ্কা-লজ্জা-রাগ-ভয়-কামনা-কম্পিত প্রেম হৃদয়ের বিকাশ। সাধারণ মানবিক প্রেম-বাসনার দীপ্তি এবং তারা কিছু অশ্রদ্ধেয়ও নয়। দেবযানীর অভিশাপ ও কচের বর দুইই সত্য, দুইই জীবনধর্মগত।"

'গান্ধারীর আবেদন', 'নরকবাস', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'; ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে একসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্যধর্মী নাটক প্রকাশিত হয়েছে। মহাভারতের গান্ধারীকে নিয়ে 'গান্ধারীর আবেদন'এ লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি' সত্ত্বেও অভিনয় যোগ্যতা যথেষ্ট বর্তমান। 'সতী' নাটকের বিনায়ক রাও চরিত্র সম্পূর্ণ নাটকীয় হয়ে উঠেছে। সমাজধর্ম ও পিতৃ স্নেহের দ্বন্দ্ব সংকটের মধ্যে কাহিনি সম্পূর্ণ নাটকীয় হয়ে ওঠে তখন যখন মাতা রমা রাই মাতৃধর্ম বিসর্জন দিয়ে সংস্কার বশে কন্যাকে পরপুরুষের চিতায় তুলে দেন। 'নরকবাস' নাটকে প্রথা-ধর্ম-ক্ষাত্র-গর্ব পিতৃধর্মের কাছে হার মেনেছে। রাজা সোমকের চরিত্র যথেষ্ট নাটকীয় হয়ে উঠেছে। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটকে তরল হাস্যরস একটি সম্পদ। এটি পুরুষ ভূমিকা বর্জিত। আশ্রমের বালিকাদের দ্বারা নাটকটি বহুবার অভিনীত হয়েছে। সমালোচক লিখেছেন, "এই নাটিকার কথাবার্তার ভঙ্গিতে, লঘু তালের ছন্দে, আগাগোড়া অনাবিল হাসির স্রোত তরতর করে বয়ে গেছে, ভাষণ ও প্রতিভাষণ উজ্জ্বল ইস্পাতের তীক্ষ্ণতায় ঝলমল করে উঠেছে এবং তীক্ষ্ণ ও ঔজ্জ্বল্য ও মুখর চঞ্চল্যের ওপর রাণী কল্যাণীর চরিত্রটিতে সুকোমল সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।"

কর্ণকুন্তী সংবাদ : রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনি' কাব্যে সংকলিত হয়েছে 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'এবং 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'। মহাভারতের 'উদ্যোগ পর্ব' কেন্দ্র করে রচনা করেন 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'। কর্ণ ও কুন্তীর সাক্ষাৎ এবং তাদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে এই নাট্যকাব্যটি রচিত হয়েছে। কুন্তী পাণ্ডব-জননী রূপে পরিচিত হলেও কর্ণকুন্তীর কুমারী বয়সের

সন্তান। লোক-লজ্জার ভয়ে কুন্তী কর্ণকে একটি পাতায় করে ভাসিয়ে দিয়েছিল জলে। সুত বংশের অধিরথ এবং তার স্ত্রী রাধা সেই সন্তানকে নিজের ছেলের মতো করে মানুষ করেন। দুর্যোধন এই কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করেন অর্জুনের প্রতিপক্ষ বীর যোদ্ধা রূপে দেখে। হস্তিনাপুরে কর্ণকে অর্জুনের সঙ্গে দেখে মূর্ছিতা হয়ে গিয়েছিলেন। আলোচ্য নাট্যকাব্যে দেখা যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগের রাতে কুন্তী ও কর্ণকে পাণ্ডব পক্ষে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন, কুন্তীও কর্ণের সংলাপে পরিস্ফুট হয়েছে নাটকীয় দ্বন্দ্ব।

নিয়মানুগ নাটক:

মালিনী: রবীন্দ্রনাথের নিয়মানুগ মনস্তত্ত্বমূলক নাটকগুলিতে মানবমনের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ প্রকাশিত হয়েছে। 'মালিনী' (১৮৯৬) নিয়মানুগ নাট্যকাব্য। বুদ্ধের সেবাকরার পুরস্কার স্বরূপ এক বালিকা পরবর্তী জন্মে কাশীরাজের কন্যা 'মালিনী' রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মালিনী তাঁর পূর্বজীবনের সংস্কার মতো বুদ্ধশিষ্য কাশ্যপ এবং অন্য শিষ্যদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। ব্রাহ্মণেরা তখন মালিনীর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে অখুশি হয়ে রাজার কাছে মালিনীর নির্বাসন চাইলেন। মালিনীর কয়েকদিনের মধ্যে পাঁচশো রাজ অমাত্যদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করে তোলেন। সেইসব অমাত্যরা মালিনীর যাতে নির্বাসন দণ্ড না হয়, রাজাকেসেই অনুরোধ করেন। ব্রাহ্মণদের এবং বৌদ্ধদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দ্বিতীয় কাহিনিটি স্বপ্নলোক। বিদ্রোহের জন্য চক্রান্তকারী দুই বন্ধুর এক বন্ধু সেই চক্রান্ত ফাঁস করে দেওয়ায় অন্যজন সেই বন্ধুকে হত্যা করে। এই দু'টি কাহিনির সংযোগসাধন রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী' নাটকে করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে থাকার সময় এই নাটকের ভাব যে স্বপ্নে লাভ করেছিলেন, তা তিনি নাটকের ভূমিকায় জানিয়েছেন। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' গ্রন্থে সংকলিত 'মহাবস্তবাদন' গ্রন্থের একটি গল্প। কাশীরাজের কন্যা মালিনীকে বুদ্ধের শিষ্য কাশ্যপের কথামতো ভিক্ষুণী হতে হয়েছে। মালিনীর বিরুদে বিদ্রোহ করেছিলেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ক্ষেমংকর ও তার বন্ধু সুপ্রিয়। ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয় ছাড়া সকল ব্রাহ্মণ মালিনীর ধর্মগ্রহণ করেছিল। এদিকে সুপ্রিয়কে রেখে ক্ষেমংকর বিদেশে চলে যায় সৈন্য আনতে, কাশী থেকে বৌদ্ধ ধর্ম দূর করার জন্য। সুপ্রিয় তখন মালিনীর সঙ্গে প্রায়ই শাস্ত্রালোচনা করতে গিয়ে উভয়ে একে অপরের জন্য ভীষণভাবে আকর্ষণ অনুভব করতে থাকল। ক্ষেমংকর তখন পত্র পাঠালেন তিনি খুব শীঘ্র সৈন্য নিয়ে ফিরছেন। সুপ্রিয় সে পত্র রাজাকে দিলে, রাজা ক্ষেমংকরকে বন্দি করে আনলেন। ক্ষেমংকরের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন রাজা। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিয় ও মালিনীর অনুরোধে রাজা ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করলেন। কৌশলে ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হত্যা করলেন। রাজা ক্ষেমংকরকে হত্যার হুকুম দিলে মালিনী ক্ষমা করার অনুরোধ জানিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। পঞ্চাঙ্কের পরিবর্তে চারটি দৃশ্য নাটকটি বিন্যস্ত হলেও এটিকে আমরা নিয়মানুগ কাব্য নাটকই বলব। আদর্শে সংঘাত নাটকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে।

বিসর্জন: 'মালিনী'র সঙ্গে 'বিসর্জন' (১৮৯০)-এর অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখা যায়। 'বিসর্জন' প্রথাসিদ্ধ পাঁচ অঙ্কের নাটক। প্রথার সঙ্গে প্রেমের বিরোধই নাটকের বিষয়বস্তু। প্রেমের

বাণী অনুভব করে গোবিন্দ মাণিক্য মন্দিরে বলিদান প্রথা বন্ধ করে দিলে শুরু হয় বিরোধ। জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে প্রথা ধর্মের অবসান ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'রাজর্ষি'র বিষয়কে কেন্দ্র করে ১২৯৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশ করেন 'বিসর্জন'নাটক। ১৩০৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে 'বিসর্জন' নাটকের ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়। নাটকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালের আষাঢ় মাসে। পঞ্চাঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নাটক এটি। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ। 'বিসর্জন' নাটক সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা যায় বলে আমরা মনে করি। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য হলেন অহিংস পূজার প্রতিনিধি আর রঘুপতি হলেন হিংস্র শক্তি পূজার প্রতিনিধি। নাটকটি প্রসঙ্গে বলা রবীন্দ্রনাথের অভিমত এখন আমরা স্মরণ করতে পারি— 'নাটকের শেষে রঘুপতি প্রতিমা বিসর্জন দিলেন, এই বাইরের ঘটনা ঘটল। কিন্তু এই নাটকে এর চেয়েও মহত্তর আর এক বির্সজন হয়েছে। জয়সিংহ তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে রঘুপতির মনে চেতনার সঞ্চার করে দিয়েছিল। মানবধর্মের সঙ্গে প্রথা ধর্মের বিরোধকে কেন্দ্র করেই 'বিসর্জন' নাটকটি রচিত হয়েছে। বহুযুগ ধরে চলে আসা যুক্তিহীন প্রথার বিরুদ্ধে গোবিন্দমাণিক্য দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গোবিন্দমাণিক্যের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন তাঁর ভাই, তাঁর স্ত্রী গুণবতী। ত্রিপুরেশ্বরী দেবীর পুরোহিত রাণী গুণবতীকে আশ্বাস দিয়েছেন, দেবীর কাছে তিনশো' ছাগ একশো' মহিষ বলি দিলে সন্তান হীনা রাণী সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন। রাণী প্রতিজ্ঞা করলেন বলি তিনি দেবেন। এদিকে রাজা বলি দেওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনতাকে রঘুপতি নানা উপায়ে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে চাইলেন। কিন্তু রাজা বুদ্ধি ও সাহস দিয়ে সবকিছুর মোকাবিলা করলেন। রঘুপতি তাঁর পালিত পুত্র জয়সিংহকে রাজহত্যার প্ররোচিত করলেন। কিন্তু অপর্ণার মতো জয়সিংহও হত্যা নয়, প্রেমকেই জীবনের ধর্ম বলে মনে করেছেন। শ্রাবণের শেষরাতে দেবীর চরণে রাজরক্ত দেবার প্রতিজ্ঞা করলেন জয়সিংহ। সেদিন দেবীর কাছে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করেন জয়সিংহ। জয়সিংহ নিজে যেহেতু রাজপুত্র রাজবংশের সন্তান ছিলেন, তাই নিজের রক্তই রঘুপতিকে দান করলেন। পুত্রসম জয়সিংহের মৃত্যুতে উন্মাদ হয়ে উঠলেন রঘুপতি। রিয়ালিজমের উগ্রতা নেই। রিয়ালিজমের সচেতনতা যে এতে কাজ করেছে, তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক :

রবীন্দ্রনাথ কৌতুক নাটকে মানুষের অধঃপতনকে ব্যঙ্গ করেছেন। যেখানেই মানবতার অপমান দেখেছেন তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন বিভিন্নভাবে। 'ছাত্রের পরীক্ষা', 'পেটে ও পিঠে, 'ভাব ও অভাব', 'বিনি পয়সার ভোজ', 'নূতন অবতার', প্রভৃতি রচনায় কৌতুক ও হাস্যরসের যে প্রবাহ দেখি, কৌতুক নাটকগুলিতে সেই রূপই প্রতিপন্ন হয়েছে। 'গোড়ায় গলদ' এ ছদ্মবেশী

নারী ইন্দুমতীকে বিবাহ করে নিমাই। আর এখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে কৌতুক রস।

বৈকুণ্ঠের সরলতায় এবং অবিনাশের বুদ্ধিহীনতায় এ নাটকে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'হাস্য কৌতুক'ও 'ব্যঙ্গ কৌতুক' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদ মাত্রকেই আমরা ছেলেমানুষী জ্ঞান করি। বিজ্ঞলোকের পক্ষে হেঁয়ালি নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়।' রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কৌতুক নাট্য রয়েছে। 'অন্ত্যেষ্টি সৎকারে' অসুস্থ পিতার সুস্থ হয়ে ওঠার চাইতে পিতার মৃত্যুই ছেলেদের কাছে কাঙ্খিত হয়েছে। আবার 'ব্যঙ্গ কৌতুকে' ও 'স্বর্গীয় প্রহসন' এবং 'বশীকরণ' নামে দুটি মজার নাট্য সংকলিত হয়েছে।

চিরকুমার সভা: চিরকুমার সভা'য় (১৯২৫) চিরকুমার থাকার প্রতিজ্ঞাকে ব্যঙ্গ করেছেন নাট্যকার। পূর্ণ, শীল, বিপিনরা চিরকুমার সভার সদস্য। কিছুদিনের মধ্যেই তারা বিবাহ করে তিন নারীকে।

শোধবোধ: 'শোধবোধ'এর (১৯২৫) নলিনী অসাধারণ এক রমণী চরিত্র। সতীশদের অভিজাত হতে চাওয়া, নন্দীদের সমাজে প্রবেশ করার চেষ্টা তাঁর হৃদয়ে বিদ্রূপ নিয়ে এসেছে। নলিনীকে মিস্টার নই ব্রেসলেট দিলে সতীশ দেয় নেক্লেস। এমন প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রবেশ করতে রাজি ছিল না নলিনী। সে সতীশের ভিতরের আসল মানুষটিকে লাভ করতে চায়। শেষ পর্যন্ত ওদের মিলন ঘটে। রবীন্দ্রনাথ কৌতুক নাট্যগুলি মানুষের মনুষ্যত্বকে সম্মানিত করেছে।

রূপক, সাঙ্কেতিক ও তত্ত্বনাটক: রবীন্দ্রনাট্য প্রতিভার সবচেয়ে স্মরণীয় দিক হল রূপক সাঙ্কেতিক ও তত্ত্ব নাটকগুলো। নানা প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে রূপক ও সাঙ্কেতিকতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। 'কণ্ঠরোগ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি বিদ্রোহী নহি, বীর নহি, বোধ করি নির্বোধও নহি। উদ্যত রাজদণ্ডপতে দলিত হইয়া অকস্মাৎ অপঘাত মৃত্যুর ইচ্ছাও আমার নেই।'এটা যেমন সামাজিক দিক, তেমন আধ্যাত্বিক দিকও আছে। রবীন্দ্রমানস সীমা ও অসীমের মেলবন্ধনে সর্বদা উদগ্রীব ছিল। এই উদগ্রীবতা পূর্ণ হয় রূপকের জগতে।

শান্তিনিকেতনের ঋতু উৎসবে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসব' লেখেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের সম্বন্ধ তত্ত্ব এই নাটকে ব্যক্ত হয়েছে। এই নাটকের ঠাকুরদাদা চরিত্র জগৎ ও জীবনের চেতনার তত্ত্বকে ব্যক্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ""শারদোৎসব' থেকে আরম্ভ করে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি-যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি, তখন দেখতে পাই, প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়াটা, এক রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে শারদোৎসব করার জন্য। তিনি খুঁজেছেন তাঁর সাথী। পথে দেখলেন চেয়ে শরৎ প্রকৃতির আনন্দ যোগ দেবার জন্য উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু উপানন্দ প্রভুর ঋণশোধ করছে— সেই দুঃখের রূপ মধুরতম।"

প্রায়শ্চিত্ত: ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয় 'প্রায়শ্চিত্ত'। এখানে এসেছে ঐতিহাসিক চরিত্র প্রতাপাদিত্যের কাহিনি আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর কথোপকথন। ইংরেজদের শাসনকালের অত্যাচারকে রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্য চরিত্রে ব্যক্ত করেছেন। প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন, 'প্রায়শ্চিত্তের লক্ষ্য রাজনৈতিক বিপ্লবাদর্শ স্থাপন করা...'। এই সময় ইংরেজের দমন

নীতি প্রবল আকার নিয়েছে। প্রতিবাদে জন্ম নিয়েছে সন্ত্রাসবাদীর দল। ধনঞ্জয় বৈরাগী বিপ্লবের পতাকা উড়িয়েছে। আঘাতের বদলে ভালোবাসার জোরে সে সবকিছু ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে, প্রজাদের খাজনা নিতে বারণ করেছে সে রাজাকে। ধনঞ্জয় প্রজাদের বলেছে, "তোরা যে মার সইতে পারিস নে। সেইজন্য তোদের মারগুলো সব নিজের পিঠে নেওয়ার জন্য স্বয়ং রাজার সংকেত আছে।"

সামাজিক নাটক: রবীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকে সমাজ জীবনের বিচিত্র সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে। 'কর্মফল' গল্পের নাট্যরূপ 'শোধবোধ' (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)। কৃত্রিমতার বিরোধিতা করেছেন নাট্যকার এই নাটকে। 'শেষের রাত্রি' গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫)-এ। যতীনের মনের জাতের বিক্ষোভ ও বেদনা এখানে নাটকীয় হয়ে ফুটে উঠেছে। 'বাঁশরী' (১৯৩৩) প্রেমের নাটক। সোম শংকর ভালোবেসেছিল বাঁশরীকে, কিন্তু বিবাহ করেছিল সুষমাকে। প্রেম ও পরিণয়ের জটিলতাই নাটকটার বিষয় হয়েছে।

নৃত্যনাট্য: রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে নৃত্যকলার সাহায্যে ভাব পরিস্ফুটনের নূতন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। কাজেই সংলাপ রচিত হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র এই জাতীয় নাটক গৌণ স্থান অধিকার করে। 'পরিশোধ' কবিতাকে 'শ্যামা' (১৯৩৯) এবং 'শাপমোচন' কবিতাকে 'শাপমোচন' (১৯৩১) নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যবিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৯.৩.৩ নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব:

বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান অবিস্মরণীয়। নিম্নে তাঁর নাট্যকৃতিত্ব তুলে ধরা হল-

১। বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ রূপক ও সাংকেতিক নাটকের প্রবর্তক এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পী। এই শ্রেণির নাটকগুলো বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ।

২। 'প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন, 'নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় একা তিনি শিখিয়েছেন পাখি পড়ানোর মতো করে। প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে কোথায় কীভাবে ঝোঁক দিতে হবে, কীভাবে স্বরের বৈচিত্র্য আসবে, সবই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিয়েছেন।'

৩। রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড টমসন বলেছেন, 'His dramatic work is the vehicle of ideas rather than the expression or action.'

৪। শিশিরকুমার ভাদুড়ী বলেছেন, 'আমাদের দেশে নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, দর্শক বিচারকের মতো আসনে বসে থাকবেন এবং অভিনেতা মঞ্চের বা কাঠগড়ায় আবদ্ধ আসামীর মতো অভিনয় করবে এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা

ঘোরতর অসামঞ্জস্য আছে।'

৫। বাংলা নাটকের ইতিহাসকার ড. অজিতকুমার ঘোষ জানিয়েছেন, 'রবীন্দ্রনাথ আসিয়া বাংলা নাটক তাহার পরিপূর্ণ আভিজাত্য এবং গৌরব লাভ করিল। নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম কলাকৌশল এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিচয় দিলেন তাহা তাঁহার পূর্বে দেখা যায় নাই, এবং পরে অনুসৃত হয়নি।'

৬। রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানের সুর প্রতীকের বার্তা বহন করে এনেছে। 'ডাকঘর' নাটকে দেখা যায় ঘড়িতে ঘন্টা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সুদূরের জন্য তার মন আকুল হয়ে ওঠে।

৭। রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত বাংলা নাটকে ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে ঘটনার পরিবর্তে ভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক' গ্রন্থে বলেছেন, 'নাটক রচনার জন্য প্রচলিত পথ ছাড়িয়া তিনি সম্পূর্ণ নূতন এক পথ ধরিয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণ নূতন এক রীতি তিনি উদ্ভাবন করিয়া লইয়া ছিলেন। তাঁহার কবিমন ঘটনাবহুল নাটক রচনার দিকে না ঝুঁকিয়া ভাবধর্মী নাটক রচনার দিকে ঝুঁকিয়াছিল। তাঁহার গীতিধর্মিতা তাঁহাকে বস্তুভাব বর্জনের পথে টানিয়া আনিয়াছিল। ভাবের রূপকার হিসাবেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব।'

৮। রবীন্দ্রনাথ জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের একজন।

৯.৪ নাট্যশিল্পী ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

ক্ষীরোদপ্রসাদ পেশাদার নাট্যমঞ্চের নাট্যকাররূপে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তিনি গিরিশচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখতে সক্ষম হয়েছেন। ইউরোপীয় নাট্যধারা এবং পুরানো নাট্যধারার মাঝামাঝি একটা পথ নিয়ে নাট্যরচনা করেছেন। তাঁর নাটক সমকালের দর্শকদের দাবী মেটাতে সক্ষম হয়েছিল। নাটক ছাড়া তিনি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থও রচনা করেছেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দ থেকে 'অলৌকিক রহস্য' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।

৯.৪.১ নাটকের শ্রেণিবিভাগ

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিভিন্ন ধরনের ৪৭টি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটকগুলোকে মোটামুটিভাবে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

১। নাটিকা : 'সপ্তম প্রতিমা' (১৯০২), 'রঘুবীর' (১৯০৩), 'রঞ্জাবতী' (১৯০৪), 'রক্ষঃ ও রমনী' (১৯০৭), 'দৌলতে দুনিয়া' (১৯০৯), 'মিডিয়া' (১৯১২), 'নিয়তি' (১৯১৪), 'রত্নেশ্বরের মন্দির' (১৯২২), 'জয়শ্রী' (১৯২৬) ইত্যাদি।

২। রঙ্গনাট্য ও গীতিনাট্য: 'ফুলশয্যা' (১৮৯৪), 'কবি-কাননিকা' (১৮৯৬), 'আলিবাবা' (১৮৯৭), 'প্রমোদরঞ্জন' (১৮৯৮), 'কুমারী' (১৮৯৯), 'জুলিয়া' (১৯০০), 'কিন্নরী' (১৯১৮), 'বৃন্দাবন বিলাস' (১৯০৪), 'বাসন্তী' (১৯০৮), 'বরুণা' (১৯০৮), 'দাদা ও দিদি' (১৯০৮), 'ভূতের বেগার' (১৯০৮), 'দৌলতে দুনিয়া' (১৯০৯), 'মিডিয়া'

(১৯১২), 'ভীষ্ম' (১৯১৩), 'রূপের ডালি' (১৯১৩), 'মিনতি' (১৯১৪), 'রত্নেশ্বরের মন্দির' (১৯২২), 'জয়শ্রী' (১৯২৬)।

৩। পৌরাণিক নাটক: 'প্রেমাঞ্জলি' (১৮৯৬), 'বজ্রবাহন' (১৯০০), 'সাবিত্রী' (১৯০২), 'দুর্গা' (১৯০৯), 'উলুপী' (১৯১৩), 'ভীষ্ম' (১৯১৩), 'রামানুজ' (১৯১৬), 'মন্দাকিনী' (১৯২১), 'নরনারায়ণ' (১৯২৬), 'বিদূরথ' (১৯২৩), 'চাঁদবিবি' (১৯০৭)।

৪। ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক: 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩), 'পদ্মিনী' (১৯০৬), 'চাঁদবিবি' (১৯০৭), 'পলাশির প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭), 'নন্দকুমার' (১৯০৭), 'অশোক' (১৯০৮), 'বাঙ্গালার মসনদ' (১৯১০), 'আহেরিয়া' (১৯১৫), 'বঙ্গে রাঠোর' (১৯১৭), 'আলমগীর' (১৯২১), 'গোলকুন্ডা' (১৯২৫)।

৯.৪.২ নাট্যসাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের অবদান:

১। বাংলা নাট্য সাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছেন। পৌরাণিক নাটক 'নরনারায়ণ' ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক 'আলমগীর' এবং গীতিনাট্য 'আলিবাবা, বাংলা রঙ্গমঞ্চে এই ত্রয়ী নাটকের ভূমিকা আমরা কখনও ভুলতে পারি না।

২। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড)'-তে আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন, 'ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যরচনার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে কাহিনির মনোহারিত্ব অর্থাৎ প্লটের গল্প রস। গিরিশচন্দ্র যে ভক্তি রসোচ্ছাসে বন্যা আনিয়াছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহা প্রতিরোধ করিলেন-নাট্যকাহিনিকে সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়া।'

৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন, 'ক্ষীরোদপ্রসাদের উনিশ শতকের ভাবাবেগ প্রবণতার পরিবর্তে বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদের বিকাশ দেখা গিয়াছিল, যুক্তি যার তিনি সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন, তিনি প্রধানত ভাবমার্গ পরিহার করিয়াছেন। সেইজন্য ভাবাবেগের সংযমই তাঁহার নাটকের বৈশিষ্ট্য।'

৪। ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর অনেক নাটকেই শিল্পসার্থকভাবে জাতীয় ভাবাবেগকে প্রচার করতে সক্ষম হয়েছেন।

৯.৫ নাট্যশিল্পী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ইউরোপ ঘুরে এসে দ্বিজেন্দ্রলালের মনের জগতে যে অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়, সেই অভিজ্ঞতাই দ্বিজেন্দ্রলালকে নাট্য লেখার প্রেরণা দেয়। আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ-তে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন, 'বিলাত হইতে ফিরিয়া আসি আমি কলকাতার রঙ্গমঞ্চসমূহের অভিনয় দেখি এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়। নাট্য অভিনয়ের প্রেরণা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন, 'বিলাত যাইবার পূর্বে হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি ছিল। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।' বিলাত যাবার আগেই হিউমার রচনায় এবং ব্যঙ্গ প্রবণতায় তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। হাসির গান লিখে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়

হয়ে উঠেছে হাসির গানগুলোকে তিনি নাটকে স্থায়িত্ব দিতে চাইলেন। সজনীকান্ত দাস 'নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'হাসির গানগুলিকে আরও স্থায়িত্ব দিবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল প্রহসনের আকারে এগুলিকে গ্রথিত কবিরার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার ফলেই দ্বিজেন্দ্রলাল সংগীতকার থেকে নাট্যকারের পদবীতে উত্তীর্ণ হন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আমার কাব্যশক্তি যাহা কিছু ছিল, আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রহসন দিয়ে শুরু করে পৌরাণিক, ইতিহাসাশ্রয়ী, সামাজিক-এই চার শ্রেণির নাটক তিনি রচনা করেন।

৯.৫.১ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের শ্রেণিবিভাগ

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলিকে সমালোচকরা চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন-

১। প্রহসন বা লঘু রসাশ্রয়ী নাটক 'একঘরে' (১৮৮৯), 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২), 'পুনর্জন্ম' (১৯৯), 'আনন্দ-বিদায়' (১৯১২) ইত্যাদি।

২। ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক 'তারাবাঈ' (১৯০৩), 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'সোরাব রুস্তম' (১৯০৮), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯ , 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯৯), 'সিংহল বিজয়' (১৯১৫) ইত্যাদি।

৩। পৌরাণিক নাটক: 'পাষাণী' (১৯০০), 'সীতা' (১৯০৮), 'ভীষ্ম' (১৯১৪) ইত্যাদি।

৪। সামাজিক নাটক: 'পরপারে' (১৯১২), 'বঙ্গনারী' (১৯১৫) ইত্যাদি।

৯.৫.২ নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের অবদান

নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের অবিস্মরণীয় ভূমিকা আমরা কখনও ভুলতে পারি না। তিনি বলেছেন 'বাঙলা ভাষায় নাট্য-সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও আখ্যানবস্তু গঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাববোধ হইতো। আমার কাব্যশক্তি আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।'

১। দ্বিজেন্দ্র জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী বলেছেন, 'তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতিসাবধানতার সহিত লিখিত। কোনো স্থানেই তিনি ইতিহাসকে একেবারে অতিক্রম করেন নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব, মাত্র সেখানেই তাঁহার মোহিনী কল্পনা অতি নিপুণতার সহিত বর্ণপাত করিয়াছে।'

১। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের অভিনবত্ব প্রসঙ্গে নবকৃষ্ণ ঘোষ বলেছেন, 'যাঁহারা বাঙালি থিয়েটারে যাইতে ঘৃণাবোধ করিতেন এমন অনেক ব্যক্তিও ডি.এল. রায়ের নাটকের অভিনয় দেখিতে যাইতে আরম্ভ করিলেন।..... দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যশালাগুলিকে বেল্লিক বাজার হইতে আনন্দবাজারে পরিণত হইবার প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করিলেন।'

৩। ১৩২০ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'তাঁহার নাটক

প্রকাশিত হইবার পর হইতেই বাঙলা রঙ্গমঞ্চসমূহের নাটকে প্রণালিতে একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। থিয়েটারী ঢং হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রঙ্গমঞ্চের নাটক চেষ্টা পাইতেছে। থিয়েটারী সাহিত্যে একটা Intellectual আবহাওয়াও যে সম্প্রতি প্রবেশ লাভের চেষ্টা করিতেছে, ইহাও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সংসর্গের ফল।'

৪। 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন, 'নাটকের ভাষা নিরাবেগ কথার সমষ্টি নয়, ইহার দ্বারা চরিত্র বিশ্লেষণ এবং ঘটনার গতিবিধান করিতে হইবে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা ভালো ভাবেই জানিতেন। সেজন্য তাঁহার ভাষার মধ্যে সর্বত্র গতির আবেগ, এবং ভাবের উচ্ছ্বাস লক্ষ করা যায়। সংলাপের প্রতিটি কথা যেন এক একটা তীক্ষ্ণফলা ছুরিকার ন্যায় ঝকঝক করিতেছে, যেন নিমেষগতিতে দর্শকের হৃদয়ে ইহা আমূল বিদ্ধ হইয়া যাইবে।'

৫। ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক হিসাবে 'নূরজাহান', 'মেবার পতন', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্তে'র ভূমিকা আমরা কখনও ভুলতে পারি না। ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকে স্বদেশি আন্দোলনকে দ্বিজেন্দ্রলাল শিল্পসম্মত ভাবে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

৬। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিকতার উত্তরণে দ্বিজেন্দ্রলালের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

৭। দ্বিজেন্দ্রলাল দক্ষতার সঙ্গে নাটকে গদ্য ও পদ্য উভয় শ্রেণির সংলাপের প্রয়োগ করেছেন।

৯.৬ মন্মথ রায়

আধুনিক বাংলা নাটকের এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন মন্মথ রায়। তিনি সমস্ত শ্রেণির নাটক লিখেছেন। তাঁর সমস্ত শ্রেণির নাটকেই আছে স্বদেশ প্রেম উদ্দীপনা। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'কারাগার' সম্পর্কে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসকার অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন, 'পৌরাণিক কাহিনির প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়াও নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক সংগ্রামের এমন এক অগ্নিময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া মুক্তিকামী জনগণের চিত্তে প্রবল উদ্দীপনা জাগাইয়া আসিয়াছে।'

৯.৬.১ মন্মথ রায়ের উল্লেখযোগ্য নাটক:

মন্মথ রায়ের নাটকগুলোকে ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

১। পৌরাণিক নাটক: 'চাঁদ সদাগর' (১৯২৭), 'দেবাসুর' (১৯২৮), 'সেমিরেমিস' (১৯২৫), 'কাজল প্রহসন রেখা' (১৯২৬), 'শ্রীবৎস' (১৯২৯), 'মহুয়া' (১৯২৯), 'কারাগার' (১৯৩০), 'সাবিত্রী' (১৯৩১), 'খনা' (১৯৩৫), সতী' (১৯৩৭), 'উর্বশী' (১৯৫৩), 'কৃষ্ণবিলাসিনী মীরা' (১৯৫৩), 'মীরাবাঈ' (১৯৫৪), 'শ্রী শ্রীমা' (১৯৫৫) ইত্যাদি।

২। ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক: 'অশোক' (১৯৩৩), 'মীরকাশিম' (১৯৩৮), 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৯৫৮), 'অমৃত অতীত' (১৯৫৯) ইত্যাদি।

৩। সামাজিক নাটক: 'মমতাময়ী হাসপাতাল' (১৯৫২), 'জীবনটাই নাটক' (১৯৫৩), 'পথে বিপথে' (১৯৫৩), 'ধর্মঘট' (১৯৫৩), 'চাষির প্রেম' (১৯৫৩), 'আজব দেশ' (১৯৫৩), 'লাঙ্গল' (১৯৫৫), 'বন্দিতা' (১৯৫৯), 'জয় বাংলা' (১৯৭১) 'রূপকথা' (১৯৩৮),

'রাজনটী' (১৯৩৮), 'ভাঙাগড়া' (১৯৫০) ইত্যাদি।

৪। দেশাত্মবোধক নাটক: 'মহাভারতী' (১৯৫২), 'স্বর্ণকীট ও জওয়ান' (১৯৬২) ইত্যাদি।

৫। জীবনী নাটক : 'লালন ফকির' (১৯৭০), 'আমি মুজিব নই' (১৯৭১), 'শরৎ বিপ্লব' (১৯৭৫), 'এদেশের লেনিন' (১৯৭৮) ইত্যাদি।

৬। একাঙ্ক নাটক: 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩), 'রাজপুরী' (১৯২৫), 'বিদ্যুৎপর্ণা' (১৯৩৭), 'বহুরূপী' (১৯২৭), 'একাঙ্কিকা' (১৯৩১), 'অপরাজিতা' (১৯৩২), 'অসাধারণ' (১৯৫৫), 'নবএকাঙ্কিকা' (১৯৫৮), 'ফকিরের পাথর' (১৯৫৯), 'বিচিত্র একাঙ্ক' (১৯৬১), 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (১৯৬৭) ইত্যাদি।

৯.৬.২ মন্মথ রায়ের নাটকের বিষয়

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধ কাহিনি ও পুরাণ প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে নাটক লিখে তিনি বেশ কিছুদিন মানসিক ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন দর্শকরা ক্রমশই সামাজিক জীবনকেন্দ্রিক নাটক দেখতে বেশি উৎসাহিত বোধ করেছেন। তাছাড়া যে যুগে তিনি নাটক রচনা করেছিলেন, সেটা ছিল জাতীয় ভাবাবেগের যুগ, দর্শকরা তখন 'রাজপুরী' (১৯২৫)-র মতো একাঙ্ক নাটক যেমন চাইছিলেন, তেমন চাইছিলেন সামাজিক নাটক। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তখন দেশের ভিতর জনযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী তছনছ হয়ে গেছে। সেই আঁচ থেকে রক্ষা পায়নি ভারতবর্ষও। চালের দাম অগ্নিমূল্য। কালোবাজারিতে ছেয়ে গেছে। মানুষ না খেয়ে মরছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দিল একদল। বাংলা ভাগ হল। দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করল। মন্মথ রায়ের সামাজিক নাটকগুলো এসবের সাক্ষী হয়ে রইল। দীর্ঘদিন পরে মন্মথ রায় আবার নতুন করে নাটক লিখতে শুরু করলেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর নাট্যজীবনের একটি পর্ব। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হল আর এক পর্ব।

৯.৬.৩ নাট্য সাহিত্যে মন্মথ রায়ের অবদান

বাংলা নাট্যসাহিত্যে মন্মথ রায়ের অপরিসীম গুরুত্ব আছে।

১। মন্মথ রায়ের সময় থেকেই বাংলা একাঙ্ক নাটকের জয়যাত্রা শুরু হয়। তাঁর বৌদ্ধ ও হিন্দু পুরাণকে অবলম্বন করে লেখা একাঙ্ক নাটকগুলো স্মরণীয় হয়ে আছে।

২। স্বদেশ প্রেম এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা সঞ্চার তাঁর নাটকের প্রধান দুই উপাদান। তাঁর পৌরাণিক নাটকেও এসেছে স্বদেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা। রূপকের অন্তরালে বিরাজ করেছে বাঙালির জাতীয় ভাব উদ্দীপনা।

৩। তাঁর নাটকে আধুনিক সমস্যা এবং আধুনিক জীবনবোধের পরিচয় যথাযথভাবে লক্ষ্য করা যায়।

৪। চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি যেমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনই অসাধারণ সংলাপের

জন্য তাঁর বেশিরভাগ নাটক জনপ্রিয় হয়েছে। তাঁর নাটকের কাব্যময় ভাষা দর্শকরা কখনও ভুলতে পারে না।

৫। কল্লোল গোষ্ঠীর তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। মন্মথ রায়ের নাট্যধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৯.৭ নাট্যশিল্পী বিজন ভট্টাচার্য

সমাজ সচেতন নাট্যশিল্পী মাটির মানুষদের জীবনযাত্রা কৃষক ও শ্রমিকদের কথা অর্থাৎ নতুন রিয়ালিটিকে অন্বেষণ করে চললেন। এখানে নট নাট্যকার এবং রঙ্গমঞ্চ পরিচালকের ত্রিবেণী সঙ্গম বিশেষ জরুরি হয়ে পড়ল। সকলকেই বুঝতে হবে সেইসব মানুষদের সমস্যার কথা-প্রকৃত ভারতবর্ষের অবস্থার কথা।

বিজন ভট্টাচার্য একই সঙ্গে গণনাট্য ও নবনাট্যের পুরোধা ব্যক্তি। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসকার ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব হইতেই সাধারণ নাট্যশালায় অবসাদ ও অবক্ষয়ের লক্ষণ প্রকটিত হইয়া উঠিল। ওইসব নাট্যশালা যেসব অসাধারণ অভিনেতা তাঁদের অদ্বিতীয় অভিনয়গুণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহাদের কেহ কেহ পরলোক গমন করিলেন। কেহ কেহ বা রঙ্গমঞ্চ হইতে সাময়িক ভাবে অবসর লইলেন। তাহাদের অভাবে রঙ্গমঞ্চের আকর্ষণ একেবারে কমিয়া গেল।..... নাট্যশালাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে এমন কোনো বলিষ্ঠ ভাবাশ্রয়ী উদ্দীপনাজনক নাটকও তখন রচিত হইতেছিল না। এইসব নানা কারণে সাধারণ নাট্যশালার অবস্থা তখন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। নাটকও মঞ্চকে বাঁচাইবার জন্য সাধারণ নাট্যশালার বাইরে তখন নবজীবনবাদী ও অদম্য উৎসাহী একদল নাট্যমোদী যুবকের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় নবনাট্য আন্দোলন গড়িয়া উঠিল। আর এরফলে নাট্যশালার অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' দিয়েই এই পরিবর্তনের শুরু।

৯.৭.১ বিজন ভট্টাচার্যের নাটক

বিজন ভট্টাচার্য পঁচিশটিরও বেশি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটকগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে-

১। পূর্ণাঙ্গ নাটক: 'নবান্ন' (১৯৪৪), 'অবরোধ' (১৯৪৭), 'জতুগৃহ' (১৯৬২), 'গোত্রান্তর' (১৯৫৯), 'মরাচাঁদ' (১৯৬২), 'ছায়াপথ' (১৯৬২), 'মাস্টারমশাই' (১৯৬১), 'দেবীগর্জন' (১৯৬৯), 'কৃষ্ণপক্ষ' (১৯৬৬), 'ধর্মগোলা' (১৯৬৭), 'আজ বসন্ত' (১৯৭০), 'গর্ভবতী জননী' (১৯৬৯), 'সোনার বাংলা' (১৯৭১), 'চলো সাগরে' (১৯৭২) ইত্যাদি।

২। একাঙ্ক নাটক: 'আগুন' (১৯৪৩), 'জবানবন্দি' (১৯৪৩), 'মরাচাঁদ' (১৯৪৬), 'কলঙ্ক' (১৯৫০), 'জননেতা' (১৯৫০), 'সাগ্নিক' (১৯৬৮), 'লাস ঘুইর্যাজ যাউক' (১৯৭০),

'চুল্লি' (১৯৭৪), 'হাঁস খালির হাঁস' (১৯৭৭)।

৩। রূপক নাট্য: 'স্বর্ণ কুম্ভ' (১৯৭০)।

৪। গীতিনাট্য: 'জীয়ন কন্যা' (১৯৪৮)।

৫। নাট্যরূপায়ণ: 'গুপ্তধন' (১৯৭২), 'নীলদর্পণ' (১৯৭২)

৬। ৭.২ নাট্যসাহিত্যে বিজন ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব:

বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিজন ভট্টাচার্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

১। সমাজ সচেতন শিল্পী বিজন ভট্টাচার্যের হাতে শ্রমিক, কৃষক, শোষণ, বিদ্রোহ, সংগ্রাম, জীবন সম্পর্কে একটা আশাবাদী চেতনা নতুন প্রত্যয়ে প্রতিফলিত হল, উঠে এল লৌকিক সংস্কৃতি এবং অবক্ষয়িত মধ্যবিত্ত সমাজ।

২। গ্রামীণ কৃষক জীবন এবং তাদের বিশ্বাস ও সংগ্রাম বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে শিল্প সার্থকভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

৩। তাঁর নাটকে প্রথম সত্যিকারের গণজীবনের ছবি প্রত্যক্ষ করা গেল।

৪। তাঁর নাটকে যেমন আছে দুর্গতির চিত্র, তেমন আছে সংগ্রামও প্রতিরোধের চিত্র।

৫। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'জবানবন্দি, 'নবান্ন' এদের নাটকত্বের বিচার অন্য নাটকের সূত্রে চললে এরা এক নতুন সৃষ্টি। এদের কানুন তৈরি হতে পারে।

৬। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক মন্বন্তর বা বিভীষিকার মধ্য দিয়ে শেষ হয়নি। শুধু মার খাওয়া নয়, বেঁচে ওঠার সঙ্কল্প, প্রতিরোধ, নবজীবনের আহ্বানগীতি দিয়েই তাঁর নাটক শেষ হয়েছে। মৃত্যু নয়, নাটকে তিনি জীবনের জয়গান গেয়েছেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। নাট্যশিল্পী বিজন ভট্টাচার্যের নাট্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৯.৮ অধ্যায় সংক্ষেপ

নাট্যসমালোচনাগুলির সূত্র ধরেই আমরা দেখি সমকালীন সমাজভাবনা, রাজনীতি, অর্থনীতি নাটক লেখার অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। দেখেছি কেমন ভাবে নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইনের মত বিধান উদ্দেশ্যমূলক নাটক লেখার প্রবাহকে রুদ্ধ করে পৌরাণিক নাটকের প্রাচুর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। বাঙালি মানস এই পরিবর্তনকে মেনেও নিয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে স্বীকৃতি পেয়ে নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। বাঙালির ত্রুটির ক্ষেত্রগুলিকে ব্যঙ্গের কষাঘাতে বিদ্ধ করার জন্য লঘু নাটক লেখা এবং রঙ্গমঞ্চে সেগুলির অভিনয় -এ যেন বাঙালি নট ও নাট্যকারদের বাঙালি জাতিকে কলুষমুক্ত করার প্রচেষ্টা। বাঙালির আত্মসচেতন হওয়ার চেষ্টা আরও বেশি করে ধরা পড়ে যখন ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধক নাটকগুলির সমালোচনা আমাদের হাতে আসে। তৎসহ সংস্কৃত তথা বিশ্ব নাট্য সাহিত্যের আস্বাদ পেতে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা সুপ্রচুর ভিন্ন ভাষার নাটক। এছাড়া আমরা পেয়েছি

অন্যবিধ বেশ কিছু নাটকের সমালোচনাও। এবার অধ্যায়ভিত্তিক বাংলা নাটক সমালোচনার সার্বিক সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।



৯.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- বাংলা নাটকের একটি বিশেষপর্বের নাট্যব্যক্তিদের বিষয় জানতে পারলাম।
- বাংলা নাটকের নির্বাচিত নাট্যব্যক্তিত্বদের নিয়ে তাঁদের নাট্যশৈলী বিষয়ে জানতে পারা গেল।
- বাংলা নাট্যধারায় নির্বাচিত নাট্যকারদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হলাম।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যধারা সম্পর্কে জানতে পেরেছি।
- বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের আলোচনায় পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ছবি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়েছি।
- মন্মথ রায়ের নাট্যধারা সম্পর্কে জানতে পেরেছি।



৯.১০ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন শ্রেণির নাটক তিনি লিখেছেন বিশেষ করে রূপক সাংকেতিক নাটক রচনায় তার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। ...রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে ...গীতিনাট্য: 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা': জীবন স্মৃতির এক বিশেষ অধ্যায় হল 'বাল্মীকি প্রতিভা'। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৯.৩.২)

২। মন্মথ রায়ের নাটকগুলোকে ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। (১) পৌরাণিক নাটক: 'চাঁদ সদাগর' (১৯২৭), 'দেবাসুর' (১৯২৮), ... (২) ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক। 'অশোক' (১৯৩৩), ... (৩) সামাজিক নাটক: 'মমতাময়ী হাসপাতাল' (১৯৫২), 'জীবনটাই নাটক' (১৯৫৩), ... একাঙ্ক নাটক: 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩), ...'একুশে ফেব্রুয়ারি' (১৯৬৭) ইত্যাদি। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৯.৬.২ অংশ)

৩। বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে সাধারণ মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে... সমাজ সচেতন শিল্পী বিজন ভট্টাচার্যের হাতে শ্রমিক, কৃষক, শোষণ, বিদ্রোহ, সংগ্রাম, জীবন সম্পর্কে একটা আশাবাদী চেতনা নতুন প্রত্যয়ে প্রতিফলিত হল ...মৃত্যু নয়, নাটকে তিনি জীবনের জয়গান গেয়েছেন। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৯.৭ অংশ)



৯.১১ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- ঘোষ, অজিতকুমার (১৩৬২ বাংলা); বাংলা নাটকের ইতিহাস; কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টারস অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড।
- চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল (১৪১৮ বঙ্গাব্দ); সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্যপ্রসঙ্গ; কলকাতা; রত্নাবলী
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (আগস্ট, ২০১৭); কলকাতা : প্রজ্ঞাবিকাশ
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮) বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা; কলকাতা : তুলসী প্রকাশন
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (২০১৬-২০১৭) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা : মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড



৯.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

২। বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। মন্মথ রায়ের নাট্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাট্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ১০ : আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য-২

বিন্যাস-ক্রম

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১০.২ পরিচয়
১০.৩ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১০.৪ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১০.৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
১০.৬ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
১০.৭ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
১০.৮ জগদীশ গুপ্ত
১০.৯ আশাপূর্ণা দেবী
১০.১০ অধ্যায় সংক্ষেপ
১০.১১ অধ্যায়টি পাঠ করে কী শিখলাম
১০.১২ অতিরিক্ত পঠন
১০.১৩ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১০.১৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- বাংলা কথাসাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।
- বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম কথাসাহিত্যিক তথা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবীর রচনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

১০.২ পরিচয়

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস ও ছোটগল্পের স্থান অন্যতম। উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপকরণের ছোঁয়ার বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল। মধ্য যুগের সাহিত্যে, মানব জীবনের মাধ্যমে দেবলীলা ও দেবমহিমা বর্ণনাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু উনিশ শতকে অর্থাৎ ইংরেজ শাসনকালে, বাঙালি জাতি ভারতবর্ষের বাইরেও যে আরও বিস্ময়কর দেশ ও দ্বীপ রয়েছে তার সন্ধান পেল, এ সম্পর্কে ড° অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "ইংরেজি ভাষার মারফতে বাঙালি সর্বপ্রথম এই বিচিত্র দুনিয়ার পরিচয় পেল, স্বাদ পেল ইংরেজি সাহিত্যের"। যার ফলে মধ্যযুগের দেবমহিমা বর্ণনা ছেড়ে, বাংলার সাহিত্যিকগণ তখন মাটির

গন্ধমাখা বাস্তব পৃথিবীবাসী মানবজীবনের কাহিনি বর্ণনায় সচেষ্ট হলেন। দেবদেবীর মহিমার স্থলে, মানবজীবনের দুঃখ, যাতনা ও বিপর্যয়ের চিত্র প্রতিফলিত হল। মূলত উনিশ শতকের বাঙালির জীবন ও চিন্তাধারায় নব দিগন্তের সঞ্চারে বাংলা গদ্যের ভূমিকা অপরিসীম। যার ফলে বাঙালির মনন সমৃদ্ধ হয়েছে এবং নব সাহিত্য প্রকরণ কথাসাহিত্য ও নাটকের উদ্ভব হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী, উনিশ শতক হচ্ছে আধুনিক যুগের জন্মলগ্নের কাল। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যের বিকাশের ধারা লক্ষিত হয়। সে সময় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসহ সমাজ-সংস্কারক রাজামোহন রায় থেকে শুরু করে প্রাবন্ধিক অক্ষয়কুমার দত্তের বিশিষ্ট অবদান লক্ষ্য করা যায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কথাসাহিত্যের অন্যতম দুইটি বিশিষ্ট প্রকরণ (উপন্যাস ও ছোটগল্প) বিকাশ লাভ করে। এইদুটি শ্রেণির বীজই পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে এসেছে। তবে গল্প বলা ও শোনার চর্চা ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় উপনিষদ, বৃহৎকথা ও কথাসরিৎ সাগর প্রভৃতি গ্রন্থে। উপন্যাসের উৎপত্তি সম্পর্কে তপনকুমার চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, 'চতুর্দশ শতকে ইতালিতে বোকাচিও উপন্যাসধর্মী যে আখ্যান লেখেন তা Novella নামে পরিচিত। এই Novella বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালে উপন্যাসের জন্ম হয়েছে'। রিচার্ডসন, ডিফো প্রমুখেরা পাশ্চাত্য সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাসের সূচনা করেন। যেখানে গদ্যের আকারে, জীবনের সামগ্রিক রূপের বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়। উপন্যাসের মূল শর্ত হচ্ছে বাস্তব সমাজবাদী রক্তমাংসের মানুষের জীবনের বিপর্যয়ের কথা ও সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের দিকও স্থান পাবে।

এই অধ্যায়ে আমরা রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের সাহিত্যকৃতির আলোচনা করব। উপন্যাসে মানবজীবনের সামগ্রিক পরিচয় প্রকাশিত হয়।

১০.৩ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে ডক্টর দেবেশ কুমার আচার্য তার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আধুনিক যুগ গ্রন্থে বলেছেন, "রবি যখন মধ্য গগনে তখন চন্দ্রের উদয় — বলাবাহুল্য সেই চন্দ্র, শরৎচন্দ্র। রবি তাপে ঝলসে গেল না শরৎচন্দ্রের স্বকীয়তা"। মূলত শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ্যশাসিত ও জমিদার শাসিত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বঞ্চিত মানুষের দুঃখ ও হাহাকারের চিত্র বর্ণনা করার জন্যই কলম ধরেছিলেন।

বস্তুত শরৎচন্দ্র সমকালীন জীবন সম্পর্কিত সামাজিক সমস্যাগুলোকে যথাযথ ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই সেই সমস্যারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন নিজ সাহিত্যে। তাঁর উপন্যাসগুলোতে, বাঙালি জীবনের অতি সাধারণ তুচ্ছ ঘটনাগুলো, অসাধারণ হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। তাই তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। তাঁর উপন্যাসসমূহ প্রকাশকাল অনুযায়ী উল্লেখ করা হল— 'বড়দিদি' (১৯১৩), 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪), 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৪), 'মেজ দিদি' (১৯১৫), 'পল্লী সমাজ'

(১৯১৬), 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৬), 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'শ্রীকান্ত' (১ম ১৯১৭, ১৯১৮, ১৯৩৩), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'দত্তা' (১৯১৮), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'দেনাপাওনা' (১৯১৩), 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০), 'নববিধান' (১৯২৪), 'পথের দাবী' (১৯২৬), 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫), 'শেষের পরিচয়' (১৯৩৯)।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১০.৪ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রকৃতিকে জীবনের উপাদান রূপে গ্রহণ করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। জন্ম সূত্রে সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং সারা জীবন স্কুল মাস্টারি করেও, তিনি বাংলা উপন্যাস সৃষ্টিতে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রকৃতিকে বিষয় করে লেখা তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) বাঙালি জীবনে যথার্থ এপিক বা মহাকাব্যসম গৌরবলাভ করেছিল। বিভূতিভূষণের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, রূপকথার আলোকে,বাংলার ভূপ্রকৃতির চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে বৈচিত্র্য সৃষ্টি। শিশুর অহৈতুকী কৌতূহল ও কবির কল্পনা দৃষ্টি দিয়ে তিনি গ্রাম বাংলার অপরূপ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তা এককথায় অনবদ্য। মূলত প্রকৃতিকে জীবনের উপাদানরূপে চিহ্নিত করা যেটি রবীন্দ্র যুগের অভাবনীয় ছিল সেটি বিভূতিভূষণের বিশেষ কৃতিত্ব। তাঁর রচিত উপন্যাস গুলি হচ্ছে — 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'বিপিনের সংসার', 'দুইবাড়ি', 'অনুবর্তন', 'দেবযান', 'কেদাররাজা', 'হীরামাণিক জ্বলে', 'অথৈ জল', 'ইছামতী', 'দম্পতি', 'অশনি-সংকেত', 'আরণ্যক' প্রভৃতি। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিতা' উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, একটি শিশুমন কীভাবে রূপকথার আলোকে বিচরণ করতে করতে অগ্রসর হল এবং জীবনের নানা ক্ষয়ক্ষতিও তাকে সেই রূপকথার জগৎ থেকে হারিয়ে যেতে দিল না এবং তারপর তার পুত্রের মধ্যেও সে জীবন বয়ে চলল - এই কথাটি বিভূতিভূষণ অসাধারণ শিল্প রূপে দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন। 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে বিশাল অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রহস্যময় যোগাযোগের নিবিড় অনুভূতি, এটিও বিভূতিভূষণের উপন্যাসে একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। 'দেবযান' উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে রূপাতীতলোকের প্রতি আকাঙ্খা। 'ইছামতী' উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে নদী শাসিত গ্রাম বাংলার এক সার্থক রূপচিত্র। সুতরাং বলা যায়, গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করেও নিজ প্রতিভা গুণে তিনি কথাসাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন।

গ্রাম বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের ছবি নিয়ে, বিভূতিভূষণ ছোট গল্প রচনা করেছিলেন। সেই জীবনের বাস্তব ছবি আমাদের চির পরিচিত জগৎ অবলম্বনে অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা ২২৪, সেগুলি বিভূতিভূষণের গল্পসমগ্র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এছাড়াও গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ১৯। সেগুলির মধ্যে 'মেঘমল্লার', 'মৌরিফুল', 'যাত্রা বদল', 'জন্ম ও মৃত্যু', 'কিন্নরদল', 'নবাগত', 'তালনবমী' প্রভৃতি অন্যতম। তাঁর বিভিন্ন বিচিত্র স্বাদের গল্প পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করেছিল।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১০.৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর-শরৎযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নিজসৃষ্টি কর্মরাজির মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর সৃষ্টি শুধুমাত্র বাংলা নয়, বাংলার বাইরেও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। তারাশঙ্কর নিজ উপন্যাস ও ছোটগল্পে যে বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন,তা এক কথায় অনন্যসাধারণ। তারাশঙ্কর যেসময় সাহিত্য রচনা শুরু করেছিলেন, তখন জমিদারি প্রথার অবসান হচ্ছে এবং শিল্পায়নের যুগ আসছে। গ্রামীণ মানুষ একটু ভালো থাকার জন্য শহরের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। এই যে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন সেটি তারাশঙ্কর অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে। তবে এই অস্থির পটভূমিকায়ও নৈরাশ্যবাদী বিষণ্ণতাকে ঝেড়ে ফেলে নবজীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার অন্যদিকে বীরভূমের গ্রাম অঞ্চলের সাধারণ শ্রেণির অর্থাৎ বেদিয়া, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক রহস্যময় ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করে, তাদের জীবনের বাস্তব পরিচয় তুলে ধরেছেন সাহিত্যে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হচ্ছে— 'রাইকমল', 'নীলকণ্ঠ', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', প্রভৃতিতে সমগ্র বাংলাদেশের সামগ্রিক ও বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছেন— "জীবনের বিশালতা ও গভীরতা এভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা, মাংসপেশীর সে জোর ইদানিং বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ- সারা ভারতে ও তার জুড়ি মিলবে না"।

তারাশঙ্কর রচিত ছোটগল্পও বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পরেই ছোটগল্পের সীমাবদ্ধ আঙ্গিক এর মধ্যে বিশাল জীবনচিত্রকে তুলে ধরতে একমাত্র তিনিই সক্ষম হয়েছেন। সেজন্যই তিনি বাংলাদেশের গৌরব এবং ভারতবর্ষের প্রধান কথাকার। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ৩৫ এবং গল্পসংখ্যা ১৯০। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ হচ্ছে— 'রসকলি', 'ছলনাময়ী', 'জলসাঘর', 'হারানো সুর' ইত্যাদি।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১০.৬ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। যদিও পাঠক সমাজের কাছে তিনি 'বনফুল' নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন সত্য শিব সুন্দরের উপাসক। জীবন সম্পর্কে তিনি এক সামগ্রিক ঐক্য বিশ্বাসী। অর্থাৎ জীবনকে তিনি দেখেছেন এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, বাস্তব কল্পনা জগত অতীত ও বর্তমান সত্য ও স্বপ্নের মধ্যে কোনো সীমারেখা নেই। এই দৃষ্টির পেছনে রয়েছে এক মননশীল সৃষ্টিশক্তি যার মধ্যে একই সঙ্গে বিজ্ঞানী ও কবিদৃষ্টির সংগম ঘটেছে।

বলাইচাঁদ সর্বমোট ৪০টি উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসগুলি বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা সহ উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রকরণ বৈচিত্র্য নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। সাহিত্য রচনাকালে তিনি বারে-বারে নানা ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, প্রচলিত রীতিকেও ভেঙেছেন, আবার কখনো দেখা গেছে দুটি ফর্মকে একসঙ্গে মিশিয়েও সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস হল— 'তৃণখণ্ড', 'বৈতরণীর তীরে', 'কিছুক্ষণ', 'জঙ্গম', 'পিতামহ' ও 'ডানা' ইত্যাদি। মূলত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-ভাষা এবং সর্বপ্রকার সামাজিক অন্যায়ের বিরোধিতা করার সংকল্প নিয়ে তাঁর উপন্যাসের কাঠামো তৈরি হয়েছিল। ছোটগল্পকার হিসেবেও বনফুল যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর ছোট গল্প সংকলনের সংখ্যা আটটি। যথা- উর্মিমালা, অনুগামিনী, সপ্তমী, দূরবীন, মণিহারা, এক ঝাঁক খঞ্জন, বহুবর্ণ এবং বনফুলের নতুন গল্প।

১০.৭ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের আরেকজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর যেমন পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল বিশেষের সাধারণ লোকের জীবনচিত্রকে তুলির টানে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তেমনি পূর্ববঙ্গবাসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও পূর্ব বাংলার অঞ্চল বিশেষের সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনচিত্র অঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তার সময়কালে ফ্রয়েডীয় মনোবিকার তত্ত্ব সাহিত্যিক মহলে খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তাঁর উপন্যাসে রয়েছে বিজ্ঞানচেতনা, ফ্রয়েডের প্রভাব ও মার্ক্সবাদের প্রভাব। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জননী' (১৯৩৫)। একই সময়কালে প্রকাশিত হয়েছিল 'দিবারাত্রি কাব্য' (১৯৩৫)। তাঁর রচিত আরো কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস হচ্ছে, 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', প্রভৃতি উপন্যাসে মানবমনের গোপন অনুভূতির প্রতিফলন ঘটেছে। জীবনের জটিলতা নামক উপন্যাসে, এক বেকার মধ্যবিত্ত যুবকের যন্ত্রণার চিত্র ফুটে উঠেছে। পরিশেষে বলা যায়, সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানবজীবনের চিত্র অঙ্কন করে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত সর্বমোট গল্পসংখ্যা ২০০। তার মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত গল্প হচ্ছে, 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প', 'মিহি ও মোটা কাহিনী', 'সরীসৃপ', 'সমুদ্রের স্বাদ' ইত্যাদি। দুই বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের পটভূমিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটগল্প লেখা শুরু করেছিলেন। এই সময় সমাজে

মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণতা, স্বপ্নভঙ্গ, এক নিরাশার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। জীবনে বেঁচে থাকতে হলে যে সংগ্রাম করতেই হবে— তাঁর ছোটগল্পগুলি সেই বাস্তব সত্যের পরিচায়ক।

১০.৮ জগদীশ গুপ্ত

বাংলা কথা সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন, তিনি বাংলা কথাশিল্পে বিপরীত স্রোত নির্মাণ করেছেন কিংবা বলা উচিত তিনি স্রোতের বিরুদ্ধে চলে আপন স্বাতন্ত্র্য ও মহিমাকে প্রতিপন্ন কতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি স্বল্পালোচিত ও বিরল পাঠক লেখক হলেও তাঁর তীক্ষ্ণ ধারালো নতুন ভাবসমৃদ্ধ রচনাগুলি বিদগ্ধ পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

তিনি অন্তত ৩৭টি গ্রন্থ রচনা করেছেন যেগুলি তার সৃজন প্রতিভার পরিচায়ক। তার গল্পগ্রন্থ হল- 'বিনোদিনী' (১৯২৭), 'রূপের বাহিরে' (১৯২৯), 'শ্রীমতী' (১৯৩০), 'পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক', 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী (১৯৩৫), 'মেঘাবৃত অশনি' (১৯৪৭), জগদীশ গুপ্তের স্ব-নির্বাচিত গল্প' (১৯৫৯) মৃত্যুর পর প্রকাশিত ইত্যাদি। তার বিশিষ্ট উপন্যাস হল- 'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯), 'লঘুগুরু' (১৯৩১), 'রোমন্থন' (১৯৩১), 'দুলালের দোলা' (১৯৩২), 'সুতিনী' (১৯৩৩), 'নিষেধের পটভূমিকায়' (১৯৫২), 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৯৬০) মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ইত্যাদি।

মানুষের মনের গভীরেও ঢুকেছিলেন জগদীশগুপ্ত এবং যে রত্ন আহরণ করেছেন তা আপাত সুন্দর না হলেও অত্যন্ত সত্য, আপন বৈশিষ্ট্যে অনন্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন- "মনোবিকলনের জটিলতার মধ্য দিয়ে জীবনরহস্য সন্ধানের পথিকৃৎ জগদীশ গুপ্ত। একদিকে রবীন্দ্রনাথের গল্প, অন্যদিকে প্রভাতকুমারের জনপ্রিয়তা-এ দুয়ের মাঝখানে জগদীশ গুপ্ত অবিশ্বাস্য দুঃসাহসে মনোলোকের গহনে নিঃসঙ্গ যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন"।

তাঁর রচনার ভাবনার মত আঙ্গিকেও আছে নতুনত্ব। তিনি নিছক মুগ্ধতার জন্য প্লট সৃষ্টি করেননি, প্রকৃতপক্ষে তিনি সচেতন ভাবে আঙ্গিক নির্মাণ করেননি। 'দুলালের দোলা' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন যে তার লেখায় 'প্লট' নেই— "আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র গল্প তৈরী করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে যেমন নতুনত্ব আছে তেমনি ভাষায় এবং প্রকাশরীতিতেও প্রথাবিরোধিতা আছে। তাঁর প্রকাশরীতি অনায়াস ও আপাতমধুর নয়, প্রচলিত সহজ পথে না চলে উপল-বন্ধুর পথেই তার যাতায়াত। তবু জীবনের যে ভাবনাকে তিনি তুলে ধরেছেন তা তিক্ত তীব্র অথচ অনিবার্য সত্য যা বুকের অনিবার্য দাহকে রক্তের অক্ষরে চিহ্নিত করে"।

১০.৯ আশাপূর্ণা দেবী

আশাপূর্ণা দেবীর নাম বাংলা সাহিত্যের দরবারে বিশেষ ভাবে খ্যাত। তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি মেয়েদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করে সেই পর্যালোচনাকে নিজ রচনায় স্থান দেন। স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে তাঁর রচনার মূল উপজীব্য ছিল বিশ শতকের বাঙালি সমাজ ও নারীমহল। যে নারীদের, আমাদের তথাকথিত সমাজ যুগ-যুগান্ত থেকে উপেক্ষিত করে আসছে

তাদের মনের অন্দরের কথাই লেখিকা মহাশয়া নিজ রচিত নানান কাহিনিতে তুলে ধরেন। একাধারে তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার এবং শিশুসাহিত্যিক। বিভিন্ন ধরণের ঘটনার সমাবেশকে অঙ্গীকার করে, তিনি যে ভাবে নিজ প্রতিবাদী সত্তার বহিঃপ্রকাশ করেন তার তুলনা কোনো ভাবেই চলেনা। তিনি নিজ লেখনীর জোড়ে স্বতন্ত্রতার বিশেষ স্বতন্ত্রতার দাবিদার। একজন গৃহবধূ হয়েই তাঁর সাহিত্যের যাত্রার আরম্ভ হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা অথবা পাশ্চাত্যের বিষয় সম্মন্ধে আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন নিতান্তই অনভিজ্ঞা কিন্তু তবুও তাঁর চিন্তন শক্তি ছিল প্রখর। এই চিন্তন শক্তিকে কাজে লাগিয়েই তিনি নিজের নানান ধরণের গৃহকর্মের মাঝে সময় বের করে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। লেখিকার অন্তরদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল অতুলনীয়। তিনি নিজের সারা জীবন যাবৎ নিজের এই পর্যবেক্ষণ শক্তির দ্বারা নীতিহীন সমাজকে প্রত্যক্ষ করেন এবং সমাজের বিভিন্ন সঘলনকে নিজ রচনার মাধ্যমে পাঠককুলের সাথে অতীব স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেন।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুল কথা' এই তিনটি উপন্যাস হলো তাঁর রচিত ত্রয়ী উপন্যাস যার জনপ্রিয়তা আজও অটুট রয়ে গিয়েছে। বলাবাহুল্য বাংলা সাহিত্যে এই রচনা তিনটিকে বিশ শতকের প্রেক্ষিতে শ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর রচিত উপন্যাস সকলের মধ্যে সমসাময়িক সমাজের প্রেক্ষাপটে ও বিত্ত ভেদে নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব, প্রেম, সংঘাত, সংঘর্ষ, প্রতিবাদ সমস্তই ফুটে উঠেছে। যা তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তাকে আরও দৃঢ় করে তোলে।

উত্তর কলকাতার মাতুলালয়ে আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম হয় ১৯০৯ সালের ৮ই জানুয়ারি। তাঁর পিতা ছিলেন হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং মাতা ছিলেন সরলাসুন্দরী দেবী। তাদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার বেগমপুরে। এবং ১৯২৪ সালে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয় কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা কালিদাস গুপ্তের সাথে। সে যুগে তাঁর পিতা বিভিন্ন জনপ্রিয় পত্রিকায় ছবি আঁকতেন, তিনি ছিলেন প্রফেশানাল কমারসিয়াল আর্টিস্ট।

আশাপূর্ণা দেবীর ছেলেবেলাটা কেটেছে উত্তর কলকাতাতেই। তাঁর ঠাকুমা নিস্তারিণী দেবীর ছিল পাঁচ পুত্র। আশাপূর্ণা দেবী নিজ ঠাকুমার একান্নবর্তী পরিবারেই বড়ো হয়ে উঠতে থাকেন। তবে আনুমানিক পাঁচ বছর বয়সে লেখিকার বসত-ভিটের পরিবর্তন হয়। তাঁর পিতা হরেন্দ্রনাথ আপার সার্কুলার রোডে নিজস্ব বাস ভবন যখন বানান তখনই তাঁর বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটে। তবে এতো কম বয়সেও শৈশবের নানান স্মৃতি তাঁর স্মৃতিপটে অক্ষুন্ন ভাবে রয়ে যায়। যার প্রতিফলন আমরা তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করি।

তাঁর নিজস্বী একটি বয়ান থেকে জানা যায় শৈশবকালে তিনি বেশ সুন্দর ছিলেন। দাদাদের সাথে ক্যারাম খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, মার্বেল খেলা এ সবই তিনি শৈশবকালে করেন। এছাড়া তাঁর প্রিয় বাড়ির দুই সদস্য ছিলেন তাঁর দিদি রত্নমালা ও তাঁর বোন সম্পূর্ণা। লেখিকার মতে তিনি এবং তাঁর তিন বোন ছিলেন 'এক মলাটে তিনখানি গ্রন্থ'। এর পরে লেখিকার ভাগ্যের পট পরিবর্তন ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠকুরের একটি চিঠির মাধ্যমে। দুঃসাহসিকতার বসে লেখিকার, রবীন্দ্রনাথের প্রতি লেখা এক চিঠির প্রতি উত্তর পাওয়ার পরেই মূলত তাঁর লেখক সত্তার বিশেষ

জাগরণ হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আশাপূর্ণা দেবী ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন সমস্ত রকম রক্ষণশীলতার উর্দ্ধে। এছাড়া নিজ মাতার আনুকূল্য সাহিত্য পাঠেও ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। তবে ছেলেবেলায় খুবই দুঃখজনক ভাবে তাঁর প্রথাগত ভাবে শিক্ষা লাভ করা হয়ে ওঠেনি। ঠাকুমা নিস্তারিণী দেবীর কঠোর অনুশাসনের তলে পৃষ্ট হওয়ার কারণ বশতই লেখিকা মহাশয়ার এমন দুর্গতি হয়। তৎকালীন সমাজের ন্যায় তাঁর ঠাকুমাও স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ বিরোধী ছিলেন, তিনি মনে করতেন বাড়ির কন্যারা স্কুলে পড়তে গেলেই তাদের চারিত্রিক পতন অবশ্যম্ভাবি। সে যুগে যেহেতু যে কোনো কন্যা সন্তানের জীবনের মোক্ষম লক্ষ্য ছিল বিবাহ, সেহেতু তাদের চরিত্রে কোনো রকম কোনো অনাকাঙ্খিত কালিমা থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল না। ফলত নারী শিক্ষার চল সেই সময় বলা বাহুল্য নগণ্যই ছিল। অন্যদিকে লেখিকার মাতা-ভক্ত পিতাও, মাতার সম্মানের কথা মাথায় রেখে নিজ কন্যাকে প্রথাগত শিক্ষা প্রদানে ছিল অপারগ।

তবে এমন অহিতকর পরিবেশে থেকেও আশাপূর্ণা দেবী শিক্ষা অর্জনে কখনো পিছুপা হননি। খুবই অল্প বয়সে নিজ আত্মসংকল্পের জোড়ে নিজের দাদার কাছে পড়া শুনেই তিনি নিজ জ্ঞানের বিস্তার করা শুরু করেন। অন্যদিকে বর্ণপরিচয়ও ছিল তাঁর শিক্ষা গ্রহণের আর এক সঙ্গী। তাঁর মাতা সরলাদেবী ছিলেন সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠিকা এই কারণে নিজ সাহিত্য পাঠের গুণ তিনি নিজের সন্তানদেরও প্রদান করেন। এছাড়াও সরলাসুন্দরী দেবী ছিলেন চৈতন্য লাইব্রেরি, জ্ঞানপ্রকাশ লাইব্রেরি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য সেই সুবাদেই আশাপূর্ণা দেবীর গৃহে গ্রন্থ সম্ভারের অভাব ছিলনা এবং তাঁর গৃহে 'সাধনা', 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র', 'বঙ্গদর্শন', 'সন্দেশ' ইত্যাদি পত্রিকা সকলের আনাগোনাও ছিল অবাধ। এই কারণেই প্রথাগত শিক্ষার আবেশ তাঁর জীবনে না ঘটলেও এ সমস্ত পুস্তিকাগুলি পঠন করে তাঁর মধ্যেকার সাহিত্যিক সত্তার সার্থক ভাবে বিকাশ ঘটে।

আশাপূর্ণা দেবী নিজের সারাটা সাহিত্য জীবন জুড়ে, নানান ধরণের সাহিত্য প্রকরণের আশ্রয় নিয়ে নানান প্রকারের রচনার করে যান। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস এ সবই তাঁর রচনা সম্ভারের অঙ্গ বিশেষ তবে এ সকল ধরণের প্রকরণের মাঝে আশাপূর্ণা দেবীর রচিত উপন্যাসগুলি বিশেষ স্বতন্ত্রতার অধিকারী। তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে এমন কিছু উপন্যাসের সৃষ্টি করে যান, যে উপন্যাসের আখ্যান এবং চরিত্র সকল কালের প্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যবাহী হয়ে থেকে গিয়েছে। ১৯৪৪ সালে লেখিকা মহাশয়া তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখেন। কমলা পাবলিসিং এর সম্পাদক বিশু মুখোপাধ্যায়ের তাগিদে তিনি 'প্রেম ও প্রয়োজন' নামক উপন্যাসটি লেখেন।

অল্প পরিসর ও সুতীক্ষ্ণ প্রেক্ষাপট যুক্ত ছোট গল্প লেখার জন্য লেখিকা মহাশয়া প্রথম থেকেই বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন তবে উপন্যাস জগতে পদার্পণ করার পরে তাঁর প্রতি পাঠককুল আরও কিছুটা আকর্ষিত হয়ে পরে কারণ উপন্যাসের মতন বৃহৎ প্রেক্ষাপটে লেখিকা মহাশয়ার অন্তঃস্থল আরও স্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুট হতে থাকে। তাঁর প্রত্যেক উপন্যাসেরই মূলে ছিল তৎকালীন সময়ের বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ এবং সেই সমাজেরই মানুষের জীবনযাত্রা। এছাড়া নারীদের কথাও তাঁর উপন্যাসে উপেক্ষিত হয়নি।

এ সব কিছু মিলিয়েই তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টি খুবই ভালো ভাবে জানতে পারি যে তৎকালীন যুগের সাপেক্ষে,কালের সাথে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরের রূপ পরবর্তীত হলেও এর ভিতরের রূপ সেই আদিকালের মতনই রক্ষনশীল রয়ে যায়, এর পরিবর্তন কোনো ভাবেই হয় না। লেখিকা এই রক্ষণশীল মনোভাবের উপর আঘাত হানতেই, নিজ রচিত উপন্যাসগুলিতে এমন কিছু চরিত্রের নির্মাণ করেন যাদের মধ্যে ছিল অতিপ্রাসঙ্গিক-প্রতিবাদী ভাবের বাহুল্যতা। নিম্নে তাঁর লিখিত উপন্যাসের নাম সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা হল- 'অনির্বান' (১৯৪৫) 'মিত্তির বাড়ি' (১৯৪৭), 'অগ্নিপরীক্ষা' (১৯৫২), 'যোগবিয়োগ' (১৯৫৩), 'কল্যাণী' (১৯৫৪), 'নির্জন পৃথিবী' (১৯৫৫), 'অতিক্রান্ত' (১৯৫৭), 'প্রথম লগ্ন' (১৯৫৯), 'উত্তর লিপি' (১৯৬০), 'তিন ছন্দ' (১৯৬১), 'মায়াজাল' (১৯৬২), 'বহিরঙ্গ' (১৯৬৩), 'উত্তরণ' (১৯৬৪), 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৪), 'সুরভী স্বপ্ন' (১৯৬৫), 'দুই মেরু' (১৯৬৬), 'সুবর্ণলতা' (১৯৬৭), 'বকুল কথা' (১৯৭৪), 'এঘর অঘর' (১৯৯৫)।

বাংলা সাহিত্য জগতে আশাপূর্ণা দেবীর প্রায় ২৪২ টির মতন উপন্যাসের অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং এই উপন্যাসগুলি রচনার ক্ষেত্রে লেখিকা মহাশয়ার লেখনীর কিছু বিশেষ বিচিত্রতা তথা স্বকীয়তা পরিস্ফুট হতে লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে সেই স্বকীয়তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্টতা তুলে ধরা হল—

১। উপন্যাস রচনায় ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছিল তাঁর পরিশীলিত মনোভাব এবং প্লট পরিবেশনেও তিনি ছিলেন বেশ সংযত প্রকৃতির।

২। এছাড়া তাঁর লেখনীতে ছিল তৎকালীন যুগের ছাপের পাশাপাশি আধুনিকতার ছোঁয়া।

৩। তাঁর কলমের জোড়ে তাঁর লিখিত উপন্যাসের নারী চরিত্রেরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বেড়াজাল ভঙ্গ করে অন্দরমহল থেকে, বাইরের মুক্তাঙ্গনে বেরিয়ে আসে।

৪। যে কোনো পরিবারের মধ্যে নারীদের গুরুত্ব যে কোনো ভাবেই নগণ্য নয় এই বার্তাও তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে স্পষ্ট। তদুপরি তিনি প্রকৃতপক্ষে নিজ রচনার মাধ্যমে পরিবারের মধ্যে নারীদের মূল্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেন।

৫। তাঁর উপন্যাসের মেয়েদের মধ্যে কুণ্ঠিত রূপ, প্রণয়ে ভীরুতা, লোকলজ্জার ভয় এসব দেখা গেলেও এর সাথে তাদের সাহসিনী রূপও প্রস্ফুটিত হতে লক্ষ করা যায়।

৬। তাঁর উপন্যাসে উল্লিখিত পুরুষ চরিত্রগুলি বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় গৃহপালিত, মাতৃলালিত ও পত্নীচালিত।

৭। লেখিকা নারী চরিত্রের বিভাজন মূলত দুই ভাবে করেন, যাদের মধ্যে একদল ছিল রক্ষনশীল মনোভাবাপন্ন আর একদল ছিল ব্যতিক্রমী অর্থাৎ যারা রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধ পক্ষ। এমনি ব্যতিক্রমী বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে, সত্যবতী (প্রথম প্রতিশ্রুতি) এবং সুবর্ণলতা (সুবর্ণলতা) চরিত্র দুই বিশেষ তৎপর্যের অধিকারিণী।

৮। যেকোনো পরিবারের অন্দরমহলের মধ্যেও যে সমাজ ভাঙা ও গড়ার কাজ চলে এ বার্তাও লেখিকা তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' নামক উপন্যাসের মাধ্যমে প্রদান করেন।

৯। নারীদের অন্তর্জগতের কথা ছাড়াও বাঙালি পরিবার নানান ইতিবাচক ও নেতিবাচক অধ্যায়ও আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস সকলের বিশেষ উপজীব্য হয়ে উঠেছিল।

নিম্নে তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কার সকলের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল :

- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত — লীলা পুরস্কার (১৯৫৪)
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত — জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৬৩)
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত — ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক (১৯৬৬)
- পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত — রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (১৯৬৬)
- ভারতসরকার প্রদত্ত — জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৭৬)
- ভারত সরকার প্রদত্ত — পদ্মশ্রী (১৯৭৬)
- জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি.লিট (১৯৮৭)
- বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি.লিট (১৯৮৮)
- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত — হরনাথ ঘোষ পদক (১৯৮৮)
- বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট (১৯৮৮)
- বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশিকোত্তম (১৯৮৯)

সাহিত্যজীবনের সূত্রপাতের শুরুর দিকে সংসারের চাপের জন্য প্রায় দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধরে আশাপূর্ণা দেবীর নিজ সাহিত্য রচনার ধারাকে শিশুসাহিত্য রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। অন্যদিকে মাত্র পনের বছর বয়সে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয় তবে স্বামী কখনো তাঁর সাহিত্য চর্চায় বাঁধা হয়ে দাঁড়াননি।

গৃহবধূ হিসেবে তিনি প্রথম দিকে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য লেখা লিখতে বিশেষ কুণ্ঠিতই বোধ করতেন তবে শেষ পর্যন্ত সম্পাদক মহল এবং প্রকাশক মহলের চাপে পরে তিনি নিজের সমস্ত রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বড়দের জন্য প্রথম ছোটগল্প 'পত্নী ও প্রেয়সী' (১৯৩৬) রচনা করেন। তাঁর লেখনীর মধ্যে থাকা মূল নির্যাস ছিল মেয়েদের জগতের মূল বাস্তব চিত্র। প্রসঙ্গত আশাপূর্ণা দেবীর আগে, সাহিত্যিক জগতের অনেকেই মহিলাদের কেন্দ্র চরিত্র বানিয়ে নানান লেখা লেখেন তবে আশাপূর্ণা দেবী তাদের থেকে আলাদা ছিলেন, এর একটাই কারণ তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি মেয়েদের জগৎটাকে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন, যেখানে নারীদের প্রকৃত প্রতিবাদ মুখ্য হয়ে ওঠে। তিনি কোনো ভাবেই নিজের লেখার মাধ্যমে নারীদের করুণার পাত্রী বানানোর চেষ্টা করেননি। পরিশেষে বলা যায় স্বশিক্ষিতা আশাপূর্ণা দেবী নিজের অবরুদ্ধ জীবনকে পাত্তা না দিয়ে যে ভাবে সাহিত্য জগতের এক উচ্চস্থান নিজের নামে বরাদ্দ করেন তা সত্যই অশেষ প্রশংসার দাবিদার। তবে স্বাধীনতার গণ্ডি অতিক্রম না করতে পারার কারণে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ঘাটতি তাঁকে তাঁর প্রতিভা প্রকাশে বিশেষ বাঁধা প্রদান করে। কিন্তু নানান বাঁধা বিঘ্নতার মধ্যেও লেখিকা আমাদের সত্যবতী, সুবর্ণলতা প্রমুখদের মতন এমন কিছু চরিত্র উপহার দিয়ে যান যার জনপ্রিয়তা বাংলা সাহিত্যে স্বকাল এবং চিরকালের প্রেক্ষিতে অমর হয়ে রয়ে যাবে।

১০.১০ অধ্যায় সংক্ষেপ

অধ্যায়টিতে বাংলা কথাসাহিত্যের পূর্বসূত্র আলোচনার পাশাপাশি বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম পুরোধা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, এবং আশাপূর্ণা দেবীর রচনাকর্ম এবং তাঁদের বিভিন্ন রচনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।



১০.১১ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায় পাঠ করে -

- বাংলা কথাসাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারলাম।
- বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম কথাসাহিত্যিক তথা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবীর রচনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারলাম।



১০.১২ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৪, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মে ২০১২) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ); কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (প্রথম প্রকাশ, ১৪০২, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪২৯); সাহিত্য প্রকরণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, একাদশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪) সাহিত্য টীকা; কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ



১০.১৩ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। মূলত শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ্য শাসিত ও জমিদার শাসিত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন। ...তাঁর উপন্যাসসমূহ প্রকাশকাল অনুযায়ী উল্লেখ করা হল... এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য : ১০.৩ অংশ)

২। কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ...তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হচ্ছে— ...গ্রাম বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের ছবি নিয়ে, বিভূতিভূষণ ছোট গল্প রচনা করেছিলেন। ...—এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য : ১০.৪ অংশ)

৩। উত্তর শরৎযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নিজসৃষ্টি কর্মরাজির মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।...তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হচ্ছে —...সেগুলির মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ হচ্ছে... —এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য : ১০.৫ অংশ)



১০.১৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বলাইচাঁদের প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরুন।

২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও ছোটগল্পের পরিচয় দিন।

৩। জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যকৃতির পরিচয় দিন।

৪। বাংলা সাহিত্যের আশাপূর্ণা দেবীর কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ১১ : আধুনিক বাংলা কবিতা-৩

বিন্যাস ক্রম

১১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১১. অধ্যায় পরিচিতি
১১.৩ স্বাধীনতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতা
১১.৪ শক্তি চট্টোপাধ্যায়
    ১১.৪.১ কাব্য পরিচয়
১১.৫ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
    ১১.৫.১ কাব্য পরিচয়
১১.৬ শঙ্খ ঘোষ
    ১১.৬.১ কাব্য পরিচয়
১১.৭ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
    ১১.৭.১ কাব্য পরিচয়
১১.৮ কবিতা সিংহ
    ১১.৮.১ কাব্য পরিচয়
১১.৯ শক্তিপদ ব্রহ্মচারী
    ১১.৯.১ কাব্য পরিচয়
১১.১০ রণজিৎ দাস
    ১১.১০.১ কাব্য পরিচয়
১১.১১ অধ্যায় সংক্ষেপ
১১.১২ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১১.১৩ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১১.১৪ অতিরিক্ত পঠন
১১.১৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- স্বাধীনতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আধুনিক কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক কাব্যে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল , কীভাবে তা সমান রাজনীতি — অর্থনৈতিক পালাবদলের সাথে সাথে তার রূপ বিষয় ও ফর্ম বদল করেছে তার একটি আভাস পাবেন।
- অধ্যায়টি পাঠ করে বাংলা সাহিত্যের এমন অনেক আধুনিক কবিদের সম্পর্কে জানতে

পারবেন, যারা বিশ শতকের শেষভাগ থেকে একুশ শতকের কিছু সময় অব্দি কবিতা লিখে গেছেন।

১১.২ অধ্যায় পরিচিতি

এই অধ্যায়টিতে মোট সাতজন আধুনিক কবিকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। অধ্যায়টি পাঠের উদ্দেশ্য হল- বাংলা কাব্যের বিশাল ভুবনে কত বিচিত্র বিষয় ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন কবিরা লিখে গেছেন তার একটি ধারণা পাওয়া। এই সাতজনের মধ্যে রয়েছেন দুজন উত্তরপূর্বের কবিও । কবিদের সম্পর্কে এবং তাঁদের কাব্য সম্পর্কে জানলে তৎকালীন বাংলার সময় সমাজ সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

১.৩ স্বাধীনতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতা

১৯৪২ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় মানব সমাজে শুরু হয় মূল্যবোধের ভাঙন পারস্পরিক সম্পর্ক হীনতা, হিংসা-বিদ্বেষ, হাসাহাসি, রক্তপাতের ফলে চিরাচরিত বিশ্বাসে ফাটল ধরে। কলঙ্কিত হয় মানব সভ্যতা অন্যদিকে যুদ্ধের ফলাফলে ভারতে তখন অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততা, নেমে আসে মহামন্বন্তর। চোরাবাজারি, মুনাফালোভী সম্পদশালীরা মানবসমাজে ডেকে আনেন দীনতা ও দুর্ভিক্ষ। ফলে সুন্দর ও কল্যাণ যা এত দিন ছিল বাংলা কবিতার আরাধনার বিষয়, তা বদলে গিয়ে এক শ্রীহীন নগ্ন জীবন যাত্রার মুখোমুখি হন আধুনিক বাঙালি কবিরা। ফলে অবিশ্বাস, হানাহানি, মানুষের প্রতি মানুষের পাশবিক আচরণ এইসবই উঠে এল কবিতার বিষয় হয়ে। রবীন্দ্র পরবর্তী কবি জীবনানন্দ দাশ যে অবক্ষয়িত মূল্যবোধহীন সমাজের ছবি দেখে বেদনাহত হয়েছিল তাঁর উত্তরসূরি হয়েই নতুন প্রত্যয় এবং প্রত্যাহ্বান নিয়েই হাজির হলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীলের মত কবিরা। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে ঘটে গেছে স্বাধীনতা এবং দেশভাগের মতো দুর্ঘটনাও। তাই নতুন অভিজ্ঞতায় সময়ের দাবি মেনেই এলেন বাংলার বুকে আরেক দল নতুন কবি। ভারতবর্ষের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক সংকট, তেভাগা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি তাদের কবিতায় প্রভাব ফেলেছে। পাশাপাশি যোগ হয়েছে কবিদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ। রবীন্দ্রদ্রোহিতা দিয়ে যে আধুনিক কবিতার পথচলা শুরু হয়েছিল, পরিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই পথ নিয়েই তার বাঁক বদল করে চলেছে।

১১.৪ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৩ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহড়ু গ্রামে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। পিতা ছিলেন রামনাথ চট্টোপাধ্যায়, মাতা কমলা দেবী। ১৯৫১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর মির্জাপুরে সিটি কলেজে ভর্তি হন কমার্স নিয়ে। তারপর কমার্স ছেড়ে দিয়ে প্রেসিডেন্সিতে প্রথমে ইংরেজি এবং পরে বাংলা নিয়ে স্নাতক হবার চেষ্ঠা চালালেও অনিয়মিত উপস্থিতির জন্য তাও হয় না। পরবর্তীতে কবি বুদ্ধদেব বসুর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগে ভর্তি হয়েও তা অসমাপ্ত রেখে দেন। তাঁর পেশাগত জীবনেও তিনি কোথাও স্থায়ী ছিলেন না। শেষের

দিকে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক রূপে কাজ করেছেন। ১৯৬৫ সালে মিনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের সাথে তাঁর বিবাহ হয় তাঁদের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। ১৯৫৬ সালে সালে 'যম' কবিতার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় তাঁর আত্মপ্রকাশ। এরপর সুনীল গাঙ্গুলীর 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি এই পত্রিকার প্রধান হয়ে উঠেন। ধীরে ধীরে পঞ্চাশের দশকের একজন শক্তিশালী ও জনপ্রিয় কবি হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

১১.৪.১ কাব্যপরিচিতি

শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রকৃত অর্থেই জীবনরসের সার্থক কবি। অন্তঃসারশূন্য সময়ের অন্ধকার গলিতে দাঁড়িয়েও যিনি নিজের জ্বালা যন্ত্রণা জ্যোৎস্নায় ধুয়ে আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়ান ফিরে আসেন এই নষ্ট, ধ্বস্ত সমাজ ও আলো ছায়ার মিশ্রিত মানুষের কাছে। তাঁর মানস লোকেও ছায়া পড়েছিল আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর এই সমাজের। কিন্তু তিনি এই জীবন ও জগতকে এক তারে বেঁধে নিয়ে নিজের মতন শব্দ ছুঁড়ে ছুঁড়ে মনের ভেতরের রূপ সঙ্গীতের মতো মূর্চ্ছনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কবিতায় গাম্ভীর্যের কৃত্তিমতা নেই কোথাও। সহজ মনের নির্যাস সহজ ভাষায় রূপায়িত হয়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্যে' (১৯৬১), 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' (১৯৬৫), 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে' (১৯৬৬), 'পুরোনো সিঁড়ি' (১৯৬৭), 'সোনার মাছি খুন করেছে' (১৯৬৭), 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৯৭০), 'পাতাল থেকে ডাকছি' (১৯৭৭), 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' (১৯৭৮), 'আমি চলে যেতে পারি' (১৯৮০), 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?' (১৯৮২) ইত্যাদি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রথম থেকেই তাঁর অনন্য মেজাজ এবং রুচির পরিচয় দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ' কবিতার 'জরাসন্ধ' কবিতাটিতেই তিনি আমাদের এক আত্মবীক্ষণের মধ্যে দিয়ে এক ধ্বস্ত মূল্যবোধহীন সময়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন আমাদের—

"পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশেরগন্ধ সব আমার
অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি সারি তোর ভাঁড়ারের নুন মশলার পাত্র
হল না, আমি যখন অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না তখন
তোর জরায় ভর করে এই আমায় কোথায় নিয়ে এলি ।"

জীবনানন্দ যেমন বলেছিলেন—

"পৃথিবীর গভীর গভীরতম অসুখ এখন/মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।" ঠিক একই ভাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতেও জটিল সময়ের জীবন যন্ত্রনায় আক্রান্ত হৃদয়ের ছবি পাওয়া যায় ।

"মানুষ যে ভাবে কাঁদে, তেমনি কি কাঁদে পশুপাখি?/একা থাকি, বড় একা থাকি।/ভিতরে ভিতরে একা, অরণ্যের মধ্যিখানে একা/ঘরে ও বাহিরেও একা ....." (মানুষ যে ভাবে কাঁদে, মানুষ বড়ো কাঁদছে)

কিংবা 'রক্তের দাগ' কবিতায় বলেছেন—

"বিষণ্ন রক্তের দাগ রেখে গেছে অন্ধকারে ফেলে
মুণ্ডহীন তরুণের উজ্জ্বল বিমূঢ় এক দেহ।
খোলা ছিলো গলির গৃহস্থ জালো আর
কোষমুক্ত তরবারি ঘাতকের হিংস্র সাংঘাতিক....."

(রক্তের দাগ, ঈশ্বর থাকেন জলে)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মনে করতেন 'শক্তি মূলত প্রেমের কবি'। পঞ্চাশের সব কবিদের মতই শক্তি প্রেম ও সুন্দরের উপাসক ছিলেন। তিনি প্রকৃতি প্রেমিক, সংসার ছুট পর্যটক কবি। মানুষ ও প্রকৃতির সাথে তাঁর কবিতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। প্রকৃতি তাঁর কাছে সুন্দর, মধুর আবার হিংস্র ভয়াবহ। শক্তির প্রেম ভাবনার মধ্যে যেমন আছে আবেগ, আকুতি, প্রকৃতির মুগ্ধতা, তেমনি আছে উদ্দামতা, পাপবোধ এবং বিপন্নতা। 'ধর্মে আছি জিরাফেও আছ', 'সোনার মাছি খুন করেছি' ইত্যাদি কাব্যের কবি প্রেমের বিপন্নতা, বিরহ সংশয় ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে।

"ছেড়ে দিয়েছি বলেই আমি সোনার মাছি জড়িয়ে আছি
দীর্ঘতম জীবন এবার তোমার সঙ্গে ভোগ করছি
এইতো রোমাঞ্চকর যামিনী- সোনায় কোনো গ্লানি লাগে না
খুন করে নীল ভালোবাসায় চমকপ্রদ জড়িয়ে গেলাম।"

(নীল ভালোবাসায়, সোনার মাছি খুন করেছি)

—শক্তির কবিতায় জীবন পিপাসা এবং নিত্য ভাবনা একই সঙ্গে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তীব্র জীবনাকাঙ্খা তাঁকে মৃত্যুর বিষণ্ণতা থেকে ফিরিয়ে এনেছে বারবার-"যেতে পারি/যে কোন দিকেই আমি চলে যেতে পারি/কিন্তু কেন যাবো/সন্তানের মুখ ধরে একটি চুম খাব।" (যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো?) রাজনীতিবিদদের ভণ্ডামি, অসাধুতাও কবির মনকে আক্রান্ত করে। 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাতেও কবির এই আত্মকেন্দ্রিক বিবেকহীন সমাজের প্রতি ক্ষোভঝরে পড়ে। এটি একটি সাংকেতিক কবিতা আধুনিক যুগের মানুষের মধ্যে যে পারস্পারিক বোঝা পরার অভাব দেখা দিয়েছে, তাঁকে কেন্দ্র করেই যুগ সচেতন কবির এই কবিতা— "দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া/কেবল শুনি রাতের কড়া নাড়া/অবনি বাড়ি আছো?"

সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মতো দায়বদ্ধ সমাজ সচেতনতা হয়তো শক্তির বাক্যে নেই। কিন্তু একথা বলতে পারি,শক্তির কবিতায় সাম্প্রতিক কালের সমান, সমাজের মানুষ তাঁর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্বপ্নভাবনা নিয়ে উপস্থিত ষাটের থেকে সত্তর দশক অব্দি দেশ জুড়ে যে অস্থিরতা তা শক্তির নানা কবিতায় রূপায়িত হয়েছে। জীবনানন্দের অনুসারী হয়েও নিজস্ব বোধও ভাবার স্বতন্ত্র শক্তি, বাংলা সাহিত্যে স্বাধীন অধিকারী। প্রতিনিয়ত আত্মদহনে গলিয়ে তাঁর কাব্যবোধকে নিঃসন্দেহে শাণিত করেছেন। তাই তাঁর রচনা নিজেই একক ও শক্তিমান।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১১.৫ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

টুকরো টুকরো কথা দিয়ে মালা গেঁথে গেঁথে যিনি বাংলা কবিতায় গড়ে তুলেন একের পর এক ছবি, তিনিই কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বাংলা সাহিত্যের এক দারুণ চিত্রকার কবি জন্মের শতবর্ষ পেরিয়ে যাবার পর যিনি আজও বাঙালি পাঠকের কাছে জনপ্রিয়। তাঁর কবিতায় ছিল বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ, প্রতিবাদ, আবার ছিল স্বপ্ন ও আশা, সময়ের প্রতিধ্বনি, সময়ের বাস্তবতার প্রতিফলন। তাঁর জীবন ও সাহিত্যের বিশ্লেষণে বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলন এক সময়ের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯২৪ সালের ১৯ অক্টোবর, বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার চান্দা গ্রামে কবির জন্ম। শৈশব কেটেছে নিতান্ত সাদামাঠা পরিবেশে। পিতা নীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মাতা প্রফুল্ল নন্দিনি দেবী। নীরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রাথমিক লেখা পড়া ফরিদপুরে শেষ করে ১৯৩০ সালে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় প্রথমে বঙ্গবাসী স্কুলে এবং পরে মিত্র ইন্সটিটিউসনে ভর্তি হন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ইতিহাসে অনার্স নিয়ে সেন্ট পল কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় 'শ্রীহট্ট' পত্রিকার সম্পাদনা করেন সংবাদ পত্রের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মায়।

১১.৫.১ কাব্য পরিচয়

"ও পাখি, তুই কেমন আছিস, ভাল কি? এই তোমাদের জিজ্ঞাসাটাই মস্ত একটা চালাকি।"- এই উচ্চারণ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। যার কবিতা সহজ সরল, তাঁর কবিতার মূল বিষয় বস্তু হল সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি শোষণ, অবিচার এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীলনির্জন' প্রকাশ পায় ১৯৫৪ সালে। তারপর একে একে প্রকাশিত হয়— 'অন্ধকার বারান্দা' , 'সময় বড় কম', 'ঘুমিয়ে পরার আগে', 'আগ সকালে' প্রভৃতি।

জটিল সময়ে দাঁড়িয়েও আপাত শান্তমিত ভাবনার প্রকাশ দেখা যায় তাঁর কবিতায়। দুঃখে তিনি যন্ত্রণা পান কিন্তু এত ভালোবাসা পেয়েও আবার তিনি আবেগে মাতাল হয়ে ওঠেন। নিপুণ ভঙ্গিতে ধ্বস্ত সময়ের বারুদের গন্ধ যেমন পৌঁছে দেয় এভাবে— "তৈমুর এখানে আসা দস্যুর মতন, জীবনের/কামনাকে হত্যা করে, একটানা অদ্ভূত আহ্বানে/মৃত্যুকে সে ডাকে, তার লোভাতুর আতর্কিত টানে! ছিঁড়ে আসে প্রাণের মৃণাল, ত্রস্ত জীবনের সুর।/দুরন্ত আঘাতে থেমে যায় ভয়বিহ্বল মনের/সমস্ত কপাট বন্ধ, এসে পরে তখন তৈমুর।" (তৈমুর , নীল নির্ণয়) তেমনি আবার আশ্চর্য আন্তরিকতার বসেই রচনা করেন 'উলঙ্গ রাজা'র মতন একটি নিটোল কবিতা। 'রাজা তোর কাপড় কোথায়?' শেষ পংক্তিটির মাধ্যমে তিনি তথাকথিত প্রচলিত systemকে ধাক্কা দিয়ে চাটুকারিদের নির্লজ্জতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। তোষামোদকারীদের স্বরূপ উন্মোচনে তিনি বলেছেন— "নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায়, জমে উঠেছে স্তাবক বৃন্দের ভিড়।"

'কলকাতার যীশু' কবিতাটিতে আবার প্রতীকি চেতনায় সমকালে বাস্তব অর্থাৎ নষ্ট জীবনকে চিত্রিত করেছেন কবি। কবিতায় শিশু হল হারিয়ে যাওয়া সচল ও সজীব মূল্যবোধের প্রতীক যে শিশুকে কবি ক্রমাগত খুঁজে চলেছেন। যে একদিন এসে এই গতানুগতিক ধ্যান ধারণা থেকে মানুষের মুক্তি ঘটাবে। এখন তারাও যেন স্থির চিত্রটির মতো শিল্পীরই জেলে নগ্ন

হয়ে আছে। স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখেছে টালমাটাল রাস্তার একপার থেকে অন্যপারে হেঁটে চলে যায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক শিশু। জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁত ঘষটানি ভ্রুক্ষেপ না করে মানবতার বিশ্বকে পেতে শিশুটি চলমান জীবনকে থামিয়ে দিয়ে পার হচ্ছে। এই চিত্র রচনা আসলে কবির মানবতাকে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্খা।

যতই সমকালীন বাস্তবতা নিয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধ ঝরে পড়ুক না কেন, কবিরা কোথাও না কোথাও একা, নিঃসঙ্গ সেই একটি মনের পরিচয় পাওয়া যায় কবির 'আমি এবং একলাবকুল' কবিতায়—

"বকুল ঝরাছে। আমি একলা দেখতে পাচ্ছি বকুলও খুব একলা ফুল
বকুল, একলা বকুল, আমরা দুজনের ধায় ঝরে যাচ্ছি কার্যত শ্মশানে।"

তাই এই একাকীত্ব, অসহায়তা, অন্ধকার জীবন পেরিয়ে কবি পৌঁছাতে চান এক সুন্দর প্রভাতের দিকে। মনের শান্তি ও সুস্থতা চান। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অন্ধকারে বারান্দার' দেয়াল কবিতায় তিনি সমস্ত প্রতিকূলতা ভেঙে আলোর দিকে এগোতে চান। মুক্তি পিপাসু মন দিয়ে কবি প্রেম ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে চান। অন্ধকার আলো দিতে হলে আর কিছু দিতে হয়। প্রেম দিতে হয়। চারিদিকে বার বার প্রেমহীনতা দেখে কবির মন ক্ষত বিক্ষত হয়। তাই প্রকৃতির কাছে তিনি চেয়েছিলেন সুশ্রদ্ধা। "আকাশে গৈরিক আলো। হেমন্ত দিনের মৃদু হাওয়া/কৌতুকে আঙ্গুল রাখে ঘরের কপাটে/জানালায়। পশ্চিমের মাঠে/মানুষের স্নিগ্ধ কণ্ঠ।" (হলুদ আলোর কবিতা, অন্ধকার বারান্দা)

বিধ্বস্ত সমাজ, মূল্যবোধহীন পরিস্থিতিতেও কবি কিন্তু আশাবাদী। নিরাশা তাঁকে গ্রাস করতে পারে না। তাই এত আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপর মানবসমাজে দাঁড়িয়েও তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান না— "আজকে তুমি কৃপণ বড়, দিচ্ছ না কিছুই, তাই যেখানে বাগান করো, ফুটছে না বেল জুঁই, উঠছে না গান তাই বাতাসের , আকাশ থমকে আছে। হাত পেতেই তাই আমি ফের মানুষ তোমার কাছে।" (মানুষের কাছে, যাবতীয় ভালোবাসি)।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মূলত আনন্দ মায়াসত্তার অধিকারী এক মগ্নচৈতন্যের কবি। তিনি কখনও বাধা সংকুল জীবন থেকে পালিয়ে যাননি। বরং দেশ কাল মানুষের সাথে থেকে আত্মবীক্ষণের মধ্যে দিয়ে একান্ত নিজস্ব কবিতা ভুবন গড়ে তুলেছেন। এইজন্যই নীরেন্দ্রনাথের কবিতা প্রকৃতি, সময় ও মানুষের দর্পণ। এক আশ্চর্য বিশুদ্ধ বোধ থেকে কবি তাই উচ্চারণ করেন- "আমি চতুর্দিকে চোখ রেখে রেখে পৃথিবীর পায়ের ডগার থেকে মস্তক অব্দি যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, প্রতিটি নিঃশ্বাসে যা কিছুতে হাত রাখছি , কিংবা বাঁ পায়ে লাথি মেরে হাঁটছি, যা কিছু তাই কবিতা।" (তাহাই কবিতা, নক্ষত্র জলের জন্য)।

১১.৬ শঙ্খ ঘোষ

বাংলা সাহিত্যের একজন অসামান্য কবি শঙ্খ ঘোষ। জন্ম হয়েছিল অধুনা বাংলাদেশে চাঁদপুরে। পেশাসূত্রে তিনি কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালরের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের যোগ্য উত্তরসূরি শঙ্খ ঘোষের প্রথম কবিতার নাম 'দিনগুলি রাতগুলি'।

কবিতাটি ১৯৫৩ সালে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মননে, মেধায় উন্নত এবং ভাষার দিক দিয়ে স্বচ্ছ ও মূর্চ্ছনায় পাঠক মনকে যিনি আনন্দিত ও বশীভূত করেছেন সেই কবি মানুষটি হলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। বাংলা কাব্য জগতের তিনি নিজেই একজন প্রতিষ্ঠান। এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

১১.৬.১ কাব্য পরিচয়

পূর্ববর্তী কবিদের মতোই শুদ্ধ মানবতা বোধে কবি ছিলেন প্রখর। শত বিশৃঙ্খলতায়ও তিনি বিশ্বাসহীনতার বশবর্তী হতে চাননি। বিশ্বাসহীন জীবন যে তার পছন্দ নয় একথা বোঝাতে চেয়েছেন-

"নিয়মের যদি নিয়ম সাজায়
দগ্ধ হাওয়ার কৃপণ আঙ্গুলে-
তাহলে শুকনো জীবনের মূলে
বিশ্বাস নেই, সে জীবন ছাই"

(আড়াল, দিনগুলি রাতগুলি)

পৃথিবীর চলমান গতির মধ্যে দিয়ে নিজেকে সংযুক্ত রাখার মধ্যেই যে আছে সত্যের ঠিকানা, সর্বোপরি একথা বোঝাতেই বলেন— "যে যে রক্ত লাগে এই প্রাণের প্রয়াসে বিমুখ হয় না মগ্ন পৃথিবীর প্রাণের প্রভাবে" (ঘনমাত্মা, দিনগুলি রাতগুলি)। শঙ্খ ঘোষের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'দিনগুলি রাতগুলি' (১৯৫৬), 'এখন সময় নয়' (১৯৬৭), 'নিহিত পাতাল ছায়া' (১৯৬৭), 'আদিম লতাগুল্মময়' (১৯৭২), 'মুর্খ বড় সামাজিক নয়' (১৯৭৪), 'বাবরের প্রার্থনা' (১৯৭৬), 'মিনি বুক' (১৯৭৮) প্রভৃতি।

পৃথিবীর অশুভ শক্তির উত্থান দেখে কবি আতঙ্কিত হয়েছেন। তাই এই অশুভ শক্তির গ্রাস থেকে মানুষকে মুক্ত করতে নানা ইঙ্গিতে প্রকৃতির কাছে ফিরে গেছেন। 'নিহিত পাতাল ছায়া' কাব্যে বলেছেন— "কত শীত হেমন্ত বশে আছি তোমার প্রতীক্ষায়, এসো-/ বলে ভিজে অন্ধকারে মনহীনতার গন্ধে টেনে নিতে নিতে/শুষে নেয় আমার সমস্ত উদ্ভিদ, আমার অন্তরাত্মা।" (প্রতীক্ষা)

কবি শঙ্খ ঘোষ সমাজ দায়বদ্ধ কবি। তাই সমাজের বিশৃঙ্খলা সমাজের স্বেচ্ছাচারিতাকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন সুশৃঙ্খল নিয়ম মাফিক জীবনের মধ্যে আছে জীবনের চরম সার্থকতা। 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যের 'রাধাচূড়া' কবিতায় তাই বলেন— "খুবই যদি বাড় বেড়ে ওঠে/দাও ছেঁটে দাও সব মাথা/কিছুতে করোনাসী মাছাড়া/থেকে যাবে ঠিক ঠাণ্ডা চুপ/ঘরেরও দিব্যি শোভা হবে/লোকেও বলবে রাধাচূড়া।" 'রাধাচূড়া' গাছের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তিনি জীবনের সুশৃঙ্খল নিয়মে পক্ষপাতিত্ব করেছেন কবি এখানে। গভীর সংবেদনশীল কবি শঙ্খ ঘোষের তাই যতই সমাজের অত্যাচার, মিথ্যাচার দেখেছেন কবি, ততই গর্জে উঠেছেন। বলেছেন- "কে চায় সুন্দর কথা দু একটি সত্যি কথা বল" (কথা প্রহর জোড়া ত্রিতাল)

বর্তমান সময়ের অবক্ষয়হীন চরম মুল্যবোধহীন সময়ে দাঁড়িয়েও কবি স্বপ্ন দেখার কথা বলেন এখানেই কবির বিশেষত্ব। স্বপ্নহীন জীবন যে অর্থহীন একথা বোঝাতেই তিনি বলেন— "তারই মাঝখানে আমি স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখি/দেখি ওরা হেঁটে যায় পৃথিবী সুন্দরতর করে/ নক্ষত্রবিলাসে নয়, দিনানুদিনের আলপথে/ আর যতদূর যায় ধানে তারে যায় ততদূর।" (হেতালের লাঠি, মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে) 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' কাব্যগ্রন্থের ৩০ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেন—

"সীমান্ত পেরিয়ে যেই পার হই প্রথম খিলান
ঘর থেকে ঘর আর হাজার দুয়ার যায় খুলে।"

সাহসী নাবিকের মতোই সমস্ত অন্ধকারের ধ্বস্ততা পেরিয়ে কবি মুক্তির প্রহর গুণেন। দেশ বিভাজনের যন্ত্রণাও কবিকেও ব্যথিত করে তার অন্তরে যে স্বদেশ প্রেম কতটা জায়গা জুড়ে রয়েছে, তা বোঝা যায় যখন দুই বাংলার রক্তাক্ত দাঙ্গার কথাও তিনি তার কবিতায় তুলে আনেন। রবীন্দ্র অনুগামী হয়েও বাংলা কাব্য ভুবনের পড়ে কবি নিজেই খুঁজে নিয়েছেন নিজের ঠিকানা। তীক্ষ্ণ জীবন বোধ দিয়ে সময় ও সমাজের আসল চেহারাকে যেমন তুলে এনেছেন, তেমনি এই বিধ্বস্ত সময় থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন। জীবন রসের সার পেয়ে ছিলেন বলেই প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে তিনি উচ্চকণ্ঠে 'ত্রিতাল' কবিতায় বলতে পারেন— "মদ খেয়ে তো মাতাল হত সবাই/কবিই শুধু নিজের জোরে মাতাল।"

১১.৭ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ শতকের শেষ ভাগের একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'নীল লোহিত' নামে বাঙালি পাঠকের কাছে তিনি পরিচিত। অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরের মাদারিপুরের ডাঁসা উপজেলায় ১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। মাত্র ৪ বছর বয়সেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৫৩ সাল থেকেই তিনি 'কৃত্তিবাস' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। 'একা এবং কয়েকজন' দিয়ে ১৯৫৮ সালে তাঁর কাব্য জীবনের শুরু। কিন্তু শুধু কবিতা নয়, উপন্যাস এবং গদ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও সুনীলের স্বতঃস্ফূর্ত পদক্ষেপ।

১১.৭.১ কাব্য পরিচয়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থগুলি হল 'একা এবং কয়েকজন' (১৯৫৭), 'আমি কি রকম ভাবে বেঁচে আছি' (১৯৬৪), 'বন্দী জেগে আছো' (১৯৬৯), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭০), 'হঠাৎ নীরার জন্য' (১৯৭৮) প্রভৃতি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আপাদমস্তক একজন প্রেমিক কবি। কলকাতার নাগরিক জীবনের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে তিনি প্রায়শই স্বাদ পেতে চান প্রীতি ভালোবাসাময় জীবনের। তাই কখন প্রেমহীন জীবনের অনুভবে হয়ে উঠেন তিনি বিদ্রোহী, আবার কখন প্রেমের ভাবনায়, স্বপ্নে তিনি এক উচ্ছল যুবক। প্রেমিক কবি হয়েও তিনি যেন এক স্বতন্ত্রধারার রোমান্টিক কবি। বিশ শতকের আধুনিক চিন্তা চেতনার প্রেক্ষাপটে কবি আর্দশবাদী প্রেমের বন্ধনে যাননি। বরং

শারীরিক প্রতিবন্ধকময় বাস্তব প্রেমকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। কবিমনের ভেতরের একই সঙ্গে কখনও জন্ম নিচ্ছে পাপবোধ ও দুঃখ। আবার কখনও মনের উগ্র কামনা বাসনা হেতু নিজেকেই চরম আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাই তাঁর কবিতায় বারবার এসেছে ঘাত-প্রতিঘাত, এসেছে নানা বাঁক, সর্বোপরি ছন্দের নানা ভাঙ্গাগড়া। 'একা এবং কয়েকজন' কাব্যগ্রন্থ প্রায় কবির একাকীত্ববোধ এবং যন্ত্রণার কথা। দেশভাগের যন্ত্রণা, অনিশ্চয়তা তাঁর কবি মনকে প্রথম থেকেই প্রভাবিত করেছিল পূর্ববঙ্গের নিঃসর্গ প্রকৃতি ছেড়ে কলকাতার নাগরিক জীবন তাঁর অন্তরে বেদনার সঞ্চার করেছিল ফলের এই কাব্যগ্রন্থটি কবির অন্তর্গত একাকি বেদনা বোধেরই ফসল। "কাল রাত্রে ঘুম হয়নি, একা এক দ্বিতীয় জগতে বোধিহীন, নিষ্পাপ, আদিগন্ত, রুক্ষ তপ্তবালি/পায়ে ঠেলে ঠেলে হেঁটে নিজের বানানো সরুপথে ভেবেছি নিজেরই ছায়া সত্যি নয় নিষ্ঠুর হেঁয়ালি।"

তবু এই একাকীত্ব থেকে বাচার উগ্র ইচ্ছে জেগে উঠে তাঁর জীবনকে ভালবাসে বলেই। প্রেমিক কবি তাই উচ্চারণ করেন- "আমি তো এখনো ভাবি এ জীবন উদ্ভাসিত হবে দিকে দিকে/সমুদ্র আকাশ হবে, তৃণ হবে মহা বনস্পতি।" (দুই হৃদয়) এইস্বপ্ন মাখা ভাবনাই কবিকে শেষ পর্যন্ত একজন যুবক থেকে প্রেমিক শিল্পীতে পরিণত করে— "প্রত্যেক অনুতে নারী, নারীর ভিতরে নারী, শূন্যতায় সহাস্যসুন্দরী/ তুমিই গায়ত্রী ভাঙা মনীষার উপহাস, তুমি যৌবনের/ প্রত্যেক কবির নারী, দুনিয়ার সব দাপাদাপি ক্রুদ্ধলোভ/ভুল ও ঘুমের মধ্যে তোমার মাধুরী ছুঁয়ে নদীর তরঙ্গ/পাপীকে চুম্বন করো তুমি, তাই দ্বার খোলে স্বর্গের প্রহরী।" (প্রবাসের শেষে)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একটি বিখ্যাত কবিতা 'উত্তরাধিকার'এ তিনি যে জীবন দেখেছেন তা উপহার হিসেবে দিয়ে যেতে চান তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকে—

"নবীন কিশোর, তোমায় দিলাম ভুবন ডাঙার মেঘলা আকাশ
তোমাকে দিলাম বোতামহীন ছেঁড়া শার্ট আর ফুসফুস ভরা হাসি।"

(উত্তরাধিকার)

'কেউ কথা রাখেনি' কবিতায় আবার ব্যক্ত করেন জীবনের এক অমোঘ সত্যের কথা, ছেলে বেলা থেকেই কবি দেখে এসেছেন কেউ কথা রাখেনি— এত সহজ একটি সত্যকে যে কীভাবে শিল্পে রূপায়িত করা যায়, তার দেখা মেলে এই কবিতায়— "কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো কেউ কথা রাখেনি/ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমী তাঁর আগমনীর গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিল/শুক্লাদ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে/তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবস্যা এসে চলে গেল কিন্তু সেই বোষ্টুমী তো আর এলো না পঁচিশ বছর প্রতিক্ষায় আছি।"

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে আমরা রোম্যান্টিক কবি হিসেবেই চিহ্নিত করতে পারি তাঁর মানব সুন্দরী নীরাকে নিয়ে তিনি একটি গোটা কাব্যগ্রন্থই রচনা করেছিলেন— 'হঠাৎ নীরার জন্য'। বাংলা কাব্যে যা একটি ঐতিহ্য পরিণত হয়েছে। নীরা কখনও তাঁর কাছে একজন রক্তমাংসের নারী, কখনও আবার আনন্দময়ী এক বিশ্বপ্রকৃতি। নারীকে এই দ্বৈতচেতনার মধ্যে অনুভব করে কবি নৈরাশ্য এবং হতাশা পেতে মুক্তি চেয়েছেন বার বার। উল্লেখ করতে পারি এই কাব্য গ্রন্থের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

১। "বাসস্টপে দেখা হলো তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ/দেখেছি ছুঁরির মতো বেঁধে থাকতে সিন্ধুপারে- দিকচিহ্নহীন-/বাহান্ন তীর্থের মতো এক শরীর, হাওয়া ভিতরে/তোমাকে দেখেছি কালস্বপ্নে, নীরা, ঔষধি স্বপ্নের নীল সুসময়ে।" (হঠাৎ নীরার জন্য)

২। "নীরার অসুখ হলে কলকাতার সবাই বড় দুঃখে থাকে/সূর্য নিভে গেলে পর, নিয়নের বাতিগুলি হঠাৎ জ্বলার আগে জেনে নেয়... 'নীরা আজ ভালো আছে'?" (নীরার অসুখ)

৩। "কখনো কখনো মনে হয়, নীরা তুমি আমার/জন্মদিনের চেয়েও দূরে-/তুমি পাতা-ঝরা অরণ্যে একা একা হেঁটে চল তোমার মসৃণ পায়ের নিচে পাতা ভাঙার শব্দ/দিগন্তের কাছে মিশে আছে মোষের কাঁঠের মতন পাহাড়।" (নশ্বর)

প্রাণশক্তিতে ভরপুর প্রাচুর্যই ছিল কবি সুনীলের কাম্য। দুর্বার গতিতে জীবনের দিকে হেঁটে গেছেন তাই কবি নির্দ্বিধায়, কখনো অতীত রোমন্থনের মধ্যে দিয়ে, কখনও ভবিষ্যতের স্বপ্নাকাঙ্খায়।

১১.৮ কবিতা সিংহ (১৯৩১-১৯৯৮)

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের একজন নারীবাদী লেখিকা হলেন কবিতা সিংহ। বাংলা সাহিত্যে মূলত কবি হিসেবেই তিনি পরিচিত। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি একেবারেই স্বতন্ত্র। কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলেও তাঁর কলমে প্রকাশিত হয়েছে শক্তিশালী গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের কলকাতার ভবানীপুরে তাঁর জন্ম। পিতা শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ, মাতা অন্নপূর্ণা সিংহ।

নারী সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর আর একটি পরিচয় রয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে তিনি বাংলা কথিকা বিভাগের সহকারী প্রযোজক রূপে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। 'কবিতা সিংহের কবিতা' প্রবন্ধে মঞ্জুশ্রী সান্যাল লিখেছেন— "পঞ্চাশের দশকের নারী মাধুর্যের মোহাঞ্জন মুছে ফেলে সত্যের পরাক্রমী উচ্চারণে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে দৃঢ় দ্রোহ নিয়ে কবিতার মঞ্চে যিনি আলোড়ন সৃষ্টি করলেন তিনিই কবিতা সিংহ।" সেই ঘুণের কাব্যিক পটভূমিতে এমন একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সত্যিই ব্যতিক্রমী নিদর্শন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ১৯৪৬ খ্রি. 'নেশন' পত্রিকায় তাঁর প্রথম ইংরেজি কবিতা প্রকাশিত হয়। মায়ের অনুপ্রেরণায় ছয় বছর বয়স থেকেই কবির কবিতা লেখার সূচনা। 'সুলতানা চৌধুরী' ছদ্মনামে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। সমাজের নানা অত্যাচার, বৈষম্য, নারী-পুরুষের বিভেদ ইত্যাদি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়।

১১.৮.১ কাব্য পরিচয়

সারাজীবনে অসংখ্য কবিতা লিখলেও তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মাত্র তিনটি- 'সহজ সুন্দরী' (১৯৬৫), 'কবিতা পরমেশ্বরী' (১৯৭৬) ও 'হরিণা বৈরী' (১৯৮৩) তাঁর 'সহজ সুন্দরী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি তাঁর দীর্ঘ আঠারো বছরের কবিতার সংকলন। বইটির সূচনায় তিনি লিখেছেন—

"বছর দুই আগে অতি কষ্টে
'প্রথম কবিতার বইয়ের'জন্যে যে

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলাম সেটিও খোয়া গিয়েছে। সুতরাং সুহৃদয়ের অনুগ্রহে ইতস্তত যে কটি কবিতা পেয়েছি নির্বিচারে সেগুলিকেই গ্রন্থভুক্ত করতে হল।"

কবিতা সিংহ মূলত একজন প্রতিবাদী কবি। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা পরমেশ্বরী'তে কবি জানিয়েছেন-

"সাধারণত আমার লেখার উৎস ক্রোধ, প্রতিবাদ, যে পর্যায়ে ক্রোধটি তীব্রতর ছিল, এই গ্রন্থের প্রায় অধিকাংশ কবিতাই সেই পর্যায়ের।"

জীবনযুদ্ধে হেরে না যাবার প্রত্যয় নিয়েই সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন কবিতা সিংহ তাঁর কবিতার অক্ষরে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও সহজ সরল ছিল না, না ঘরে, না কর্মক্ষেত্রে। জীবন থেকে তুলে আনা অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি সাজিয়ে তুলেছেন তাঁর কাব্যভুবন।

এইসব অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হরিণা বৈরী' কাব্যে দ্বিধাহীন ভাবে উচ্চারিত হয়েছে মানুষের জীবন, বেঁচে থাকা, সত্তার গভীরে লুকিয়ে থাকা নানা প্রশ্নের দোলাচলতা। নিজের সত্তার সাথে বোঝাপড়া করতে তিনি জীবনকে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী কবিতা লিখেছেন। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৭ খ্রি.। এটি উৎসর্গ করেছেন তিনি কবি শঙ্খ ঘোষ'কে। এই কাব্যগ্রন্থে কবি তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু পছন্দের কবিতাকে স্থান দিয়েছেন। এছাড়া তখনো প্রকাশিত না হওয়া 'বিমল হাওয়ার হাত ধরে'-র বেশ কিছু কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত করে কিছু কবিতা এবং 'কাব্যনাটক' — এর নয়টি কবিতাকে স্থান দিয়েছেন।

কবির প্রেক্ষাপট যেহেতু বাস্তব অভিজ্ঞতা, তাই তাঁর কবিতায় বাস্তব জীবন এবং সমাজের দুঃখ-যন্ত্রণা, বঞ্চনার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তিনি লক্ষ করেছেন, দিনের পর দিন নানা বৈষম্য ও বঞ্চনা নিয়ে মেয়েরা জীবন কাটিয়ে দেয়। মেয়েদের এই বঞ্চনার ইতিহাস খুঁজতে খুঁজতে কবি পৌঁছে যান উনিশ শতকের পটভূমিতে। যে শতকে নারীর জন্য বরাদ্দ ছিল কেবল অন্দরমহল, নিয়ম শৃঙ্খলার বেড়াজাল, অনুশাসনের বন্ধন। অন্যদিকে পুরুষেরা মত্ত থাকতেন রক্ষিতা বিলাসে। উল্লেখ করতে পারি কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

১। "ভিজে ঠোঁটে গান করো স্রেফ গঙ্গাজল/ মদ ভেবে একা একা খালাসি টোলায়।" (শক্তি, হরিণাবৈরী)

২। "না, আমি হবো না মোম!
আমাকে জ্বালিয়ে ঘরে তুমি লিখবে না।/
হবো না শিমুল শস্য সোনালী নরম!
বালিশের করোষ্ণ গরম।" (না, সহজসুন্দরী)

৩। "আমরা ভ্রূণ না ভ্রূণা
জন্ম দিও না মা।
মা আমার জেনে শুনে কখনো উদরে
ধরো না এ বৃথা মাংস।" (ভ্রূণা, কাব্যনাটক)



জেনে রাখা ভালো

- ষাটের দশকের যে চারজন কবিকে হাংরি আন্দোলনের জনক মনে করা হয়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁদের একজন।
- 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যগ্রন্থের জন্য কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯৭৪ খ্রি. সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।
- 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থের জন্য কবি শঙ্খ ঘোষ ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার তথা 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার' লাভ করেন।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কবি কবিতা সিংহের যে সোচ্চার প্রতিবাদ তার শিকড় রয়েছে তাঁর পারিবারিক পরিস্থিতিতে। পরিবারে নারী-পুরুষের ব্যবধানই কবিকে করে তুলেছে প্রতিবাদী। তাঁর কাব্য বৈশিষ্ট্যের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আধুনিক সময়েও নারী-পুরুষের নানা বিভেদচিন্তা, চেতনাহীন পরিস্থিতিতে কবিতা সিংহের কবিতা আমাদের কাছে হয়ে উঠেছে প্রাসঙ্গিক।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। কবিতা সিংহের কবিতায় যে যন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে, তা নিজের ভাষায় প্রকাশ করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১১.৯ শক্তিপদ ব্রহ্মচারী (১৯৩৭-২০০৫)

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী আসামের বরাক উপত্যকার একজন অন্যতম বিশিষ্ট কবি। তাঁর কবিতা সর্বভারতীয় স্তরে প্রশংসিত এবং দুই বাংলায় বহু চর্চিত তাঁর কবিতা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৭ খ্রি. ২০ এপ্রিল বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার হরিগড় মহকুমার সোনাইতা গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৫৬ খ্রি. পুরোপুরি পাকিস্তান ছেড়ে আসামের শিলচরে গুরুচরণ কলেজে পড়াশোনা করেন। এরপর শিক্ষকতা করতে করতেই ১৯৬১ খ্রি. স্নাতক এবং ১৯৬৮ খ্রি. স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হন। প্রথম হাইলাকান্দি এস. এস. কলেজে অধ্যাপনা এবং পরে স্থায়ীভাবে গুরুচরণ কলেজে চাকুরি শুরু করেন। তরুণ বয়স থেকেই চলতে থাকে তাঁর কবিতাচর্চা। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের 'আজাদ' পত্রিকায়। মূল্যবোধের অবক্ষয়, সমাজের নানা বিপর্যয় এবং দেশভাগ, দাঙ্গা, যুদ্ধ ইত্যাদি তাঁর কবিতাকে স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছেন। কবি শক্তিপদের কবিতা নিঃসন্দেহে উত্তরপূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে এক অনন্য কাব্যভাষায়। তাঁর বেশিরভাগ কবিতা আত্মজৈবনিক। কবি বিমল চৌধুরী প্রসঙ্গতই রসিকতা করে লিখেছেন-

"শক্তিপদ ব্রহ্মচারী/পদ্য লিখে দম্ভভারী।"

১১.৯.১ কাব্য পরিচয়

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী তাঁর সাহিত্য জীবনে সম্পাদনা করেছেন দুটি কাব্যপত্রিকা- 'অতন্দ্র' (১৯৬৩-৬৮) এবং 'সংক্রান্তি' (১৯৮৫)। এই পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে তিনি একটি শক্তিশালী কবিগোষ্ঠীও গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলো হল- 'সময় নদীর হৃদয়' (১৯৭১), 'এই পথে অন্তরা' (১৯৭৬), 'অনন্ত ভাসানে' (১৯৮৪), 'কাঠের নৌকা' (১৯৯৪), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৯৫), 'লঘু পদ্য' (২০০০), 'দ্বন্দ্ব অহর্নিশ' (২০০৪), 'শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর নির্বাচিত কবিতা সংকলন' (২০০৬) ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে তাঁর অনেকগুলো সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ।

কবি শক্তিপদ যেহেতু বরাক উপত্যকার শিলচর শহরের বাসিন্দা ছিলেন আজীবন। তাই তাঁর স্মৃতিসত্তায় দেশভাগের যন্ত্রণা সবসময় জাগরূক ছিল। শুধু তাই নয়, আসামের দুই উপত্যকার ভাষা-সংস্কৃতির দ্বন্দ্বও তাঁর কবিসত্তাকে সবসময় উদ্বেলিত করেছে।

তাঁর কবিতার অনেকটা জায়গা জুড়ে যেহেতু দেশভাগ, তাই এক্ষেত্রে ইতিহাসকে একটু ফিরে দেখতেই হয়। দেশভাগ ও স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বরাক উপত্যকা 'সুরমা উপত্যকা' নামে পরিচিত ছিল এবং শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে যে শ্রীহট্ট আসাম থেকে পৃথক হয়ে যায়। দেশভাগজনিত কারণে হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু ক্যাম্পে নাম লিখিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। চলে আসেন আসামে। বিশেষ ভাবে বরাক উপত্যকার তিন জেলাতে তাঁদের পুনর্বাসন হয়। রাষ্ট্রনৈতিক বিচারে যদিও এই উপত্যকা আসামের, কিন্তু সাংস্কৃতিক বিচারে বাংলার। তাই বাংলা ভাষা-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি রক্ষার্থে অন্য ভাষার আগ্রাসন থেকে বাংলাকে বাঁচাতে রক্তাক্ত হয় বাঙালি। বরাকের ভাষা আন্দোলন একথারই প্রমাণ। কবি তাই তাঁর কবিতায় সমস্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন এভাবে—

"যে কেড়েছে বাস্তুভিটে, সে-ই কেড়েছে ভয়
আকাশ জুড়ে লেখা আমার আত্মপরিচয়।"

কবি বিশ্বাস করতেন, মানুষের পরিচয় কোনো ভূগোলে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। মানুষের পরিচয় মানবিকতায়। কবি তাই তাঁর চেতনায় হিংসা জয়ী যুদ্ধে জয়ী হতে চান। জাতি হিংসা মানুষের সভ্যতায় এক কলঙ্কময় অধ্যায়। কবি তাঁর জীবনে এই হিংসা দেখেছেন বারবার। সাক্ষী হয়েছেন ১৯৬১-র ভাষা আন্দোলনের। তাই মৈত্রীর বাণী প্রচারে তিনি কবিতা লিখেছেন-

"হিংসা জয়ী যুদ্ধে যাব, আর হবে না ভুল
মেখলা পরা বোন দিয়েছে একখানা তাম্বুল।" (উদ্বাস্তুর ডায়েরি)

'সময় শরীর হৃদয়' কাব্যগ্রন্থে দেশত্যাগের বেদনা ব্যক্ত করেছেন কবি 'আত্মতর্পণ' কবিতায়। বলেছেন, যদিও জন্মভূমি ত্যাগ করে তিনি অনেক কষ্টে আছেন, কিন্তু দাঙ্গা যুদ্ধ থেকে এই বেশ ভালো—

"বেশ আছি, স্যাঁতসেতে মেঝে আর বাঁশে ছাওয়াঘর
দক্ষিণপূর্বের কোণে ছোট্ট এক চৌকি নড়বড়।"

'এই পথে অন্তরা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবির খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই

কাব্যে সময় সচেতনতা আছে, আছে অতীতের নস্টালজিয়া, আবার নারীপ্রেমের তীব্র অনুভূতিও আছে। 'বহুদিন অসুখে ভুগিনি' কবিতায় ঝরে পড়ে কবির আক্ষেপ- "বহুদিন অসুখে ভুগিনি/মনে হয় এইবার আমাকেও যেতে হবে অসুখের/বিষণ্ণ প্রদেশে হাসপাতাল! হাসপাতালে।"

কবি তাঁর কবিতায় অতীতের স্মৃতিচারণায় সর্বদা সজীব। বাল্যকালের স্মৃতিমাখা গ্রাম, বাস্তুভিটে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর কবিতায়। 'অনন্ত ভাসানে' কাব্যগ্রন্থের 'একটি গ্রামীণ পদ্য' কবিতায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা কয়েকটি হল— 'বাবা', 'বহুদিন হল তোমাকে লিখিনি', 'একটি কবিতা পড়ে', 'মনসামঙ্গল' ইত্যাদি। কবি এই কাব্যের 'নারী বিষয়ক'কবিতায় লিখেছেন- "ভালোবাসা ছুঁয়ে আছে নারী/তার ডানদিকে সামান্য স্তনের আভা/দুই ঠোঁটে কামাক্ত বিস্ময়।" নারীকে তিনি কামের সামগ্রী না ভেবে মানুষ হিসেবে ভেবেছেন কবিতায়। এছাড়া তাঁর 'কাঠের নৌকা' কাব্যগ্রন্থের 'উনিশে মে ১৯৬১' শিলচর নামে একটি বিখ্যাত কবিতা স্থান পেয়েছে। যা ষাটের দশকে আসামের উত্তাল পরিস্থিতির জ্বলন্ত সাক্ষী।

ষাটের দশকের ভাষা আন্দোলন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অস্থিরতা কবিকে প্রভাবিত করেছিল স্বাভাবিক ভাবেই। 'যখন ব্যক্তিগত কারণে চিন্তাগ্রস্ত' কবিতায় তাই বলেন-

"তোমাতে নই আমাতে নই, বিষয়ে আছি লিপ্ত
লাগামছেঁড়া তিনটে ঘোড়া ভীষণরকম ক্ষিপ্ত।"

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য- "বরাকভূমিকে যে কবি দ্বিতীয় মাতৃভূমি হিসেবে গ্রহণ করেন তাঁর মনের ভেতরেও থেকে যায় এক প্রবাসীর মর্মবেদনা।' এই বেদনাকেই তাঁর কবিতায় শক্তিশালী রূপে এবং শিল্পে চিত্রায়িত করেন কবি, পাঠক যা সহজেই গ্রহণ করে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিয়ে দেশভাসের যন্ত্রণা পরিস্ফুটি হয়েছে তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১১.১০ রণজিৎ দাশ (১৯৪৯)

কবি শঙ্খ ঘোষ পরবর্তী সময়ে আশির দশকে বাংলায় যে কয়েকজন আধুনিক কবি খ্যাতি লাভ করেন, রণজিৎ দাশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। (১৯৪৯) খ্রি.আসামের কাছাড় জেলার শিলচরে তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের ঢাকার বিক্রমপুরে। তাঁর ছেলেবেলা এবং পড়াশুনা কেটেছে শিলচরেই। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিজ্ঞানে স্নাতক হন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর কবিতা লেখার শুরু। তাঁর প্রকাশিত প্রথম কবিতা 'ছন্নছাড়া'। 'আমাদের লাজুক কবিতা' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

তাঁর মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। তিনি বীরেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় স্মরণ কমিটি কর্তৃক বীরেন্দ্র পুরস্কার, এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বাংলা অ্যাকাডেমি পুরস্কারেও ভূষিত হন। ২০১৩ খ্রি. 'রণজিৎ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। (১৯৭১) খ্রি. কবি স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আসেন।

১১.১০.১ কাব্য পরিচয়

নগর জীবনের অমোঘ জীবন জিজ্ঞাসাকে সহজভাবে কাব্যে উপস্থাপন রীতিই রণজিৎ দাশের কবিতাকে ভাব ও বিষয়ের দিক থেকে উচ্চমার্গে উন্নীত করেছে। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল—

'আমাদের লাজুক কবিতা' (১৯৭৭), 'জিজ্ঞাসীদের তাঁবু' (১৯৮৪), 'সময়, সবুজ ডাইনি' (১৯৮৭), 'বন্দরের কথ্যভাষা' (১৯৯৩), 'ঈশ্বরের চোখ' (১৯৯৯), 'সন্ধ্যার পাগল' (২০০৪), 'সমুদ্র সংলাপ' (২০০৭), 'শহরে নিস্তব্ধ মেঘ' (১৯৯৯), 'রণজিৎ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (২০১৩), 'ধানখেতে বৃষ্টির কবিতা' (২০১৩), 'অসমাপ্ত আলিঙ্গন' (২০১৬), 'বিষাদসিন্ধুর কিছু লেখা' (২০১৮)।

যে অভিজ্ঞতা এবং চোখে দেখা জীবনে আমরা বাল্যকাল থেকেই অভ্যস্ত, সেই জীবনকেই আসামান্য কাব্যরীতিতে প্রকাশ করেছেন কবিতায় কবি রণজিৎ। 'বিনাপ্রেমে নাহি দিব সূচ্যগ্র শরীর' অথবা 'সংসার সুখের হয় রমণের গুণে' এমন সব সত্য এবং দৃঢ় উচ্চারণে বাংলা কবিতাকে যিনি দিয়েছেন সমৃদ্ধি। একই সঙ্গে রণজিৎ রোমান্টিক কবি। তাঁর ভাবজগতে সুন্দর এসেছে অন্যতর সুন্দর হয়ে। শব্দচয়নে তিনি তৈরি করেন অভিনব বিহ্বলতা। কবির কবিতা সত্যের মুখে দাঁড়িয়ে চেতন থেকে অবচেতনের অন্ধকারকে নাড়িয়ে দেয়। কবি বলেন- "মানুষ দুর্বোধ্য প্রাণী, কখনো সাপের মুখে/কখনো ব্যাঙের মুখে চুমু খায়,/বেহালা বাজায় কবিতা দুর্বোধ্য হলে তবু সে কেন যে ক্ষেপে যায়।" (মানুষ দুর্বোধ্য প্রাণী, সমুদ্র সংলাপ) এ যেন আমাদের চেতনায় এক চপেটাঘাত। 'আমাদের লাজুক কবিতায়' এভাবেই কবি বিষণ্ণ সময়ের ছবি ফুটিয়ে তোলেন-

"আমাদের লাজুক কবিতা, তুমি ফুটপাতে শুয়ে থাকো কিছুকাল/
তোমার লাজুক পেটে লাথি মেরে হেঁটে যাক বাজারের/
থলে হাতে বিষণ্ণ মানুষ।"

মানবচরিত্র নিয়ে তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণ—

"দুরকম বন্ধু আছে পৃথিবীতে, একজন
ভিজিটিং আওয়ারে আসে, ফিরে যায় সূর্যাস্তের আগে
অন্যজন বসে থাকে হাসপাতালের গেটে
অনন্ত দুঃখের রাত জাগে।"

কবির কবিতা যেন পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয় আইডিয়ার মোড়কে, দার্শনিক উপলব্ধির আধারে। অথচ তাঁর ভেতরে থাকে অসাধারণ সত্যবচন। 'শহরে নিস্তব্ধ মেঘ' কাব্যের 'ডিপ্রেশন' কবিতায় দুঃখের পক্ষাবলম্বন করেছেন কবি— "মাঝে মধ্যে ডিপ্রেশন, ছোট ছোট স্পেন্স এ, সমুদ্র এবং/মনের পক্ষে ভালো। একটা দুটো ছোট্ট ঝড়ে নিম্নচাপও শোকদুঃখ সাফ হয়ে যায়।/ তখন আবার সমুদ্র জাহাজের এবং মন যৌন্তার সুনীল জলপথ হয়ে ওঠে।"

এরকম অসংখ্য ছন্দহীন ভাবমূলক কবিতা রয়েছে কবির। স্বল্প পরিসরে এই কবির যথার্থ মূল্যায়ন হয়তো করা গেল না। কিন্তু তাঁর কবিতার নিবিড় পাঠে আপনারা উপলব্ধি করতে

পারবেন যে, বাংলার কেন্দ্রভূমিতে জন্ম এবং বেড়ে না উঠেও বাংলার তিন ভুবনে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। নিজেকে তিনি আধুনিক কবি বলতে নারাজ। মেধা এবং মননে, জ্ঞানে-বুদ্ধিতে আবার গভীর অনুভবে, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় রণজিৎ দাশ বাংলা সাহিত্যের ভুবনে আজও লিখে চলেছেন নির্দ্বিধায়।

১১.১১ অধ্যায় সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে কয়েকজন কবির কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো, তাঁরা প্রত্যেকে পঞ্চাশ থেকে আশির দশকের কবি। বিংশ শতাব্দীর নানা সংশয়, অশান্তি, অস্থির পরিস্থিতির পর্যায়ক্রম পেরিয়ে এসেও যাঁরা সত্য ও সুন্দরের সন্ধানী। বিশ্বাসহীনতা থেকে বিশ্বাসের দিকে তাঁদের যাত্রা। শত দুঃখকষ্টেও যাঁরা আশাবাদের আলো জ্বালিয়ে রাখেন কবিতায়। আড়ালে-আবডালে তাঁরা ব্যঞ্জনায় প্রতীকধর্মী স্বভাবে উচ্চারণ করেছেন মূল্যবোধহীন সমাজ, উৎশৃঙ্খল প্রজন্মের অবনতির কথাও। কিন্তু ইশারায় নির্দেশ করেছেন এক সুন্দর, সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রার দিকে। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যা এক সুন্দরের পূজারী, কল্যাণের পথযাত্রী।



১১.১২ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

অধ্যায়টি পাঠ করে বাংলা সাহিত্যের এমন অনেক আধুনিক কবিদের সম্পর্কে জানতে পারলাম, যারা বিশ শতকের শেষভাগ থেকে একুশ শতকের কিছু সময় অব্দি কবিতা লিখে গেছেন। এই অধ্যায়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, রণজিৎ দাশ ও তাঁদের কাব্য পরিচয় বিষয়ে জানতে পারলাম। এই সাতজনের মধ্যে রয়েছেন দুজন উত্তরপূর্বের কবিও। এই অধ্যায়টি পাঠ করে স্বাধীনতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আধুনিক কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারলাম, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক কাব্যে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, কীভাবে তা সমান রাজনীতি— অর্থনৈতিক পালাবদলের সাথে সাথে তার রূপ বিষয় ও ফর্ম বদল করেছে তার একটি আভাস পেলাম।

১১.১৩ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর সংকেত

১। শক্তি চট্টোপাধ্যায় জীবন রসের পথিক। ...তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম ...মৃত্যুচেতনার কবি ...জীবনপিপাসু কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ...সমাজ সচেতন কবি শক্তি। —এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য-১১.৪)

২। বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নারী জীবনের দুঃখ যন্ত্রণার কথা প্রতিবাদী সুরে ফুটিয়ে তোলা কবি কবিতা সিংহ। ...উনিশ শতকের বঞ্চনা ...সাম্প্রতিক সময়ের অত্যাচার ...পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।— এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য-১১.৮)

৩। আসামের উদ্বাস্তু জীবন ...ভাষিক আন্দোলন ...অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ...আবার একধরণের মৈত্রীর বন্ধনের বাণী ...দেশভাগের স্মৃতিচারণা ...সবমিলিয়ে শক্তিপদের কবিতা। এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য-১১.৯)



১১.১৪ অতিরিক্ত পঠন

- গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ (১৯৩০) বঙ্গের মহিলা কবি; কলকাতা-২৪
- চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ (১৯৯৮) কবিতা কী ও কেন; কলকাতা : দে'জ
- চৌধুরী, শীতল (২০১৯) আধুনিক বাংলা কবিতা; কলকাতা : প্রজ্ঞা বিকাশ
- ত্রিপাঠী, দীপ্তি (২০১৩) আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়; কলকাতা : দে'জ
- মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার (চতুর্থ সংস্করণ ২০২১); বাংলা কবিতা পর্বে পর্বান্তরে; কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ



১১.১৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখুন।

৩। কবি রণজিৎ দাশের কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ করুন। তাঁর কবিতার মূল সুর সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। 'সুনীল গাঙ্গুলি একজন প্রেমিক কবি'- আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ১২ : আধুনিক বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ-৩

বিন্যাস ক্রম

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১২.২ পরিচিতি
১২.৩ সৈয়দ মুজতবা আলী
১২.৪ শিবনারায়ণ রায়
১২.৫ সুজিৎ চৌধুরী
১২.৬ সুকুমারী ভট্টাচার্য
১২.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ
১২.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১২.৯ অতিরিক্ত পঠন
১২.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১২.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী-

- প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাবন্ধিক শিবনারায়ণ রায়ের গদ্যশৈলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাবন্ধিক সুজিৎ চৌধুরীর প্রবন্ধের নানা দিক সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রবন্ধের নানা দিক সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১২.২ পরিচিতি

সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা হল প্রবন্ধ সাহিত্য। 'প্রবন্ধ' বা 'Essay' এক বিশেষ ধরনের গদ্য রচনা। সংস্কৃত ভাষায় প্রবন্ধ বলতে 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন'কে বুঝিয়ে থাকে। গদ্য হল প্রবন্ধ শিল্পের স্বাভাবিক মাধ্যম। এখানে থাকবে বিষয় ও উপস্থাপন রীতির বৈচিত্র্য। প্রবন্ধকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা-বস্তুনিষ্ঠ, তন্ময়, আনুষ্ঠানিক প্রবন্ধ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ, মন্ময়, ভাবপ্রধান প্রবন্ধ। বিশ শতকের প্রাবন্ধিকদের নানা দিকে লেখকদের ধারণা ছিল বলেই তাঁদের রচনায় পুরাণ প্রসঙ্গ, সমাজ এবং উত্তর পূর্বের নানা দিক ধরা পড়েছে। প্রাবন্ধিকদের লেখার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের সেই সব দিক এক নতুন রূপ পেয়েছে।

১২.৩ সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)

জীবন

তিনি করিমগঞ্জে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম সৈয়দ সিকন্দার আলী। তাঁর বাবা ছিলেন সৈয়দ আহ্‌মদ মতওয়াককালীর বংশধর। মা আমতুন মান্নান খাতুন ছিলেন জমিদার মোহ্‌সেন চৌধুরীর কন্যা। ধর্মপ্রাণ পারিবারিক পরিমণ্ডলে মুজতবা আলী বেড়ে ওঠেন। বাবার চাকরি বদলি হওয়ার সূত্রে ১৯০৫ সালে চলে আসেন হবিগঞ্জ মহকুমার চাড়ডাঙ্গা গ্রামে। ১৯০৮-এ তিনি সুনামগঞ্জ এবং তারপর ১৯১২ সালে বাবার সঙ্গে মৌলবীগঞ্জে বাস করা শুরু করেন। ১৯১৫ সালে তিনি মৌলবীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। তারপর ১৯১৮ সালে সিলেটের সরকারি হাই স্কুলে ভর্তি হন। 'চাচা কাহিনী'র সূত্রে সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবন কাহিনি সম্পর্কে জানা যায়। ১৯৩২ সালে তিনি জার্মানীতে পি-এইচ.ডি অর্জন করেন। দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বহুভাষাবিদ সৈয়দ মুজতবা আলী ফরাসী, জার্মান, ইটালি, আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি ইত্যাদি মিলিয়ে ১৫টির বেশি ভাষা তিনি জানতেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস

- 'অবিশ্বাস্য' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১)
- 'শবনম্' (রাখী পূর্ণিমা, ১৩৬৭),
- 'শহর ইয়ার' (ভাদ্র ১৩৭৬),
- 'তুলনাহীন' (বৈশাখ ১৯৭৪),

গল্প সংকলন গ্রন্থ

- 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৬১)
- 'বহু বিচিত্র' (১৯৬২)
- 'হাস্য মধুর' (১৯৬৬)
- 'পছন্দসহ' (১৯৬৭)
- 'রাজা উজীর' (বৈশাখ ১৩৭৬)

ছোটোগল্প গ্রন্থ

- 'চাচাকাহিনী' (আষাঢ় ১৩৫৯)
- 'টুনিমেম' (চৈত্র ১৩৭০)

প্রবন্ধ গ্রন্থ

- 'পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (বৈশাখ ১৩৬০)
- 'চতুরঙ্গ' (ভাদ্র ১৩৬৭)
- 'কত না অশ্রুজল' (নববর্ষ ১৩৭৮)
- বিদেশে (১৯৭১)

- 'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন' (চৈত্র, ১৩৮৮)

ভ্রমণ সাহিত্য (ভ্রমণ কাহিনি)

- 'দেশে বিদেশে' (বৈশাখ ১৩৫৬)
- 'জলে ডাঙায়' (মাঘ ১৩৬০)
- 'মুসাফির' (অগ্রহায়ণ ১৩৭৬) ইত্যাদি

রম্য রচনা

- 'ময়ূরকণ্ঠী' (চৈত্র ১৩৫৯)
- 'পঞ্চতন্ত্র' (আষাঢ় ১৩৫৯)
- 'ধূপছায়া' (পৌষ ১৩৬৪)
- 'দ্বন্দ্ব-মধুর' (বৈশাখ ১৩৬৫)
- 'ভবঘুরে ও অন্যান্য (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯)
- 'হাস্য মধুর' (অগ্রহায়ণ ১৩৭১)

প্রবন্ধ ও বিষয়বস্তু

- সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য গদ্যকার ও সাহিত্যিক, যিনি সরস, মার্জিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত গদ্যরচনায় বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। তিনি বহুভাষাবিদ ছিলেন এবং বিশ্বজুড়ে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর রচনা স্বতন্ত্র স্বাদ ও গভীরতা পেয়েছে। তাঁর গদ্যের শৈলী 'মজলিশি বৈঠকী রীতি' নামে পরিচিত, যা এক ধরনের আলাপনধর্মী, বন্ধুত্বপূর্ণ, এবং হাস্যরসাত্মক ভঙ্গি বহন করে। এই রীতি পড়ে পাঠক যেন তাঁর সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছেন, কথাবার্তা চালাচ্ছেন এমন অনুভূতি পায়। এই গদ্যরীতি ইংরেজ লেখক চার্লস ল্যাম্বের গদ্যের সাথে তুলনীয়।
- ১৯৪৮ সালে তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'দেশে-বিদেশে' ধারাবাহিক ভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই ভ্রমণকাহিনিতে তিনি হাওড়া থেকে পেশোয়ার এবং কাবুল পর্যন্ত রেল ও মোটরযান ভ্রমণের বর্ণনা দেন। গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত - আদি পর্যায়ে যাত্রাপথের প্রাকৃতিক দৃশ্য, মধ্য পর্যায়ে কাবুলের শহর ও গ্রামের জীবনচিত্র এবং অন্ত্য পর্যায়ে বিদ্রোহগ্রস্ত কাবুল থেকে প্রাণভয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মর্মস্পর্শী কাহিনি। লেখাটি কৌতুকপূর্ণ, সাবলীল ও সহজ ভাষায় রচিত হওয়ায় পাঠক সহজেই আকৃষ্ট হন। ভ্রমণের মাধ্যমে লেখক মানব চরিত্রের সূক্ষ্মতা উপলব্ধি করেছেন এবং মানব আত্মার সন্ধান দিয়েছেন।
- তারপর তিনি রম্যরচনায় প্রবেশ করেন। 'পঞ্চতন্ত্র' সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি বিভিন্ন রম্যরচনা ও সমকালীন বিষয়ে বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। 'বইকেনা', 'কাইরো', 'নেতাজী', 'ভাষাতত্ত্ব', 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', 'বাবুর শাহ', 'কচ্ছের রান', 'অনুবাদ সাহিত্য', 'আধুনিকা', 'মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রা শ্রেয়' এবং 'চোখের জলের লেখক' এরকম বহু রচনা পাঠকমহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

- ‘ধূপছায়া’ গ্রন্থে তিনি মজলিশি বৈঠকী ভঙ্গিতে রম্যরচনা উপস্থাপন করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো হলো- ‘রসগোল্লা’, ‘বাঙালী’, ‘দেয়ালি’, ‘বাঁশবনে’, ‘ভাষার জমা খরচ’, ‘শিক্ষা প্রসঙ্গে’। এই রচনাগুলোতে সমাজ, ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
- ‘ভবঘুরে ও অন্যান্য’ গ্রন্থে অধিকাংশ রচনা রম্যরচনার। এখানে তিনি বৈঠকী মেজাজে রচনা উপস্থাপন করেছেন, যা তাঁর গদ্যের স্বকীয়তা ও পাঠকের সঙ্গে সংযোগকে আরো দৃঢ় করেছে। এখানে ‘রবীন্দ্রনাথ’, ‘ক্ষিতিমোহন সেন’, ‘শান্তিনিকেতন’, ‘ডি. এইচ. লরেন্স’ সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও বিষয়বস্তু নিয়ে রচনা রয়েছে।
- অন্য গ্রন্থ ‘দু-হারা’তে বিভিন্ন রসের গল্প উপস্থাপন করা হয়েছে, যেমন- ‘মধ্যপন্থা ওরফে মধ্যপন্থা’, ‘প্রেমের প্রথম ভাগ’, ‘অদৃষ্টের রঙ্গরস’, ‘আধুনিকের আত্মহত্যা’ ইত্যাদি। ‘ময়ূরকণ্ঠী’ গ্রন্থে তিনি সমাজের নানা সমস্যা ও বাঙালির মননের আমেজ রম্য ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে ‘রামমোহন রায়’, ‘গুরুদেব’, ‘শিক্ষা সংস্কার’, ‘বিশ্বভারতী’, ‘ফরাসী আমি’ প্রভৃতি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনায় বাংলা জাতি ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা স্পষ্ট। তিনি সামাজিক ত্রুটি, ভাষা ও শিক্ষার অবস্থা নিয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সবকিছুতেই হাস্যরস ও মানবিকতা বজায় রেখেছেন। তাঁর লেখনীতে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে গভীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানব আত্মার সূক্ষ্ম উপলব্ধি দেখা যায়।



জেনে রাখা ভালো

আত্মপ্রকাশ: সৈয়দ মুজতবা আলির প্রথম ছোটগল্প ‘ন্যাড়া’। গল্পটি ১৯২২ সালে বীরভূমের শান্তিনিকেতনের শালবীথিতলে অনুষ্ঠিত এক সভায় পাঠ করেন। পরে এই গল্পটি ‘বিশ্বভারতী ম্যাগাজিন’ এ প্রকাশিত হয়। এই ছোটগল্পের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য জগৎ-এ প্রবেশ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ ‘বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ’। তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ পূর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা’। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ‘অবিশ্বাস্য’। সৈয়দ মুজতবা আলী যে সব ছদ্ম নামে লিখতেন সত্যপীর, ওমর খৈয়াম, টেঁকচাঁদ, প্রিয়দর্শী, ইন্দ্রাণী সরকার, রায়পিথোরা। তিনি বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। যেমন- নরসিংহ দাস পুরস্কার (১৯৪৯), আনন্দ পুরস্কার (১৯৬) ইত্যাদি।

তাঁর রচনাবলির একাদশ খণ্ড রয়েছে। সেগুলো পড়ে আপনারা আরো তাঁর সম্পর্কে জানতে পারবেন।

রবীন্দ্র-জীবনীমূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থটির নাম হল ‘গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন’। এই প্রবন্ধ গ্রন্থটি রবীন্দ্র অনুধ্যানের উল্লেখযোগ্য স্মারক। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছেন, তারই সংকলন হল এই প্রবন্ধ গ্রন্থটি। তাঁর অপর একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ হল ‘চতুরঙ্গ’। লেখকের

চিন্তাশীলতা এবং মানবধর্মিতার প্রকাশ ঘটেছে এই প্রবন্ধ গ্রন্থে। এই গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি যথা- 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' 'রবি-পুরাণ', 'দিল্লি স্থাপত্য' এবং 'হরিনাথ দে স্মরণে'। 'মুসাফির' গ্রন্থটি একটি ভ্রমণ কাহিনিমূলক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের তিনটি কাহিনি রয়েছে যথা- 'মুসাফির', 'ক্রেতা', এবং 'দ্বীপের'। 'পঞ্চতন্ত্র' তাঁর একটি রম্য রচনা গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ৩৫টি রচনা রয়েছে, উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল- 'তোতা কাহিনি', 'আড্ডা', 'পঁচিশে বৈশাখ', 'বই কেনা', 'মার্জারনিধন কাব্য' প্রভৃতি। এই গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন সরলাবালা সরকার মহাশয়াকে। 'বড়বাবু' প্রবন্ধের বড়বাবু হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই প্রবন্ধগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল- রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। 'কত না অশ্রুজলে' এই গ্রন্থে তিনি স্মৃতিচারণার সূত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন যেমন- আনর্ফ্যাস্ক, বনে ভূত না মনে ভূত, ব্রেনড্রেন, দ্বন্দ্ব পুরাণ, মাভৈঃ প্রভৃতি। এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে ফনী দেব ও সাগরময় ঘোষকে। 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্টভাষা' প্রবন্ধটিতে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের উপর জোর করে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে লেখক প্রবন্ধটি রচনা করে প্রতিবাদ জানান।

প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্যশৈলী:

- তাঁর প্রবন্ধের একটি বিশেষ দিক আড্ডাবাজী ধরনের গল্প উপস্থাপন করা।
- তাঁর গদ্যের একটি বিশেষ দিক হল সাধারণ মানুষের জীবন অসাধারণ গদ্য ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত করে তোলা।
- শুধু দেশের কথা স্থান পাওয়া নয়, তাঁর গ্রন্থে উঠে এসেছে আফগানিস্তানের স্মৃতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, প্রভৃতি দিকগুলিও। ভ্রমণ কাহিনি বিষয়ে লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'জলে-ডাঙায়'।
- তিনি একজন অসাধারণ গদ্যশিল্পী তার পরিচয় পাওয়া যায় 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচাকাহিনি,'ও 'শবনম্' প্রভৃতি গ্রন্থে।
- তাঁর গ্রন্থের ভাষা বাক্য গঠন অতি সহজ ও সরল।
- তিনি গদ্যের বিষয় অনুযায়ী কাহিনি গম্ভীর করেছেন আবার কখনও বা তরল প্রকৃতির করেছেন।
- তিনি ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার করে মনের ভাবপ্রকাশ করতে ভালোবাসতেন।
- পরিহাস প্রবণতা তাঁর গদ্য ভাষার অপর বিশেষ বৈশিষ্ট।
- কখনও দেখা গিয়েছে খুবই পরিচিত শব্দকে তিনি তাঁর মতো করে গদ্যরচনায় প্রয়োগ ঘটাতে।
- তিনি বহুভাষাবিদ গদ্যশিল্পী ছিলেন বলেই তাঁর প্রতিফলন দেখা গিয়েছে তার রচনায়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। সৈয়দ মুজতবা আলীর অধ্যয়নের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১২.৪ শিবনারায়ণ রায়

শিবনারায়ণ রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯২১ সালের ২০ জুলাই, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার উদয়নপুর গ্রামে (বর্তমানে এটি দক্ষিণ পরগনার অন্তর্গত)। তাঁর পরিবার ছিল সংস্কৃতিপ্রবণ ও সাহিত্যরসিক; তাঁর মা রাজকুমারী রায় নিজেও কবিতা লিখতেন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। এই পরিবারিক পরিবেশ তাঁর মনন গঠনে বড় প্রভাব ফেলে।

শিবনারায়ণ রায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেন কলকাতার স্কুলে। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালেখি ও চিন্তাভাবনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর উচ্চ শিক্ষার ভিত্তিই তাঁকে পরবর্তীকালে এক বিশ্লেষণধর্মী প্রাবন্ধিক ও চিন্তাবিদ হিসেবে গড়ে তোলে।

শিবনারায়ণ রায় ছিলেন আধুনিক মননশীল প্রাবন্ধিক ও সমাজচিন্তক। ১৯৫২ সালে তিনি বিখ্যাত দ্বিমাসিক পত্রিকা 'উত্তরসূরী' সম্পাদনা শুরু করেন, যা পঞ্চাশের দশকে সাহিত্য-আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ ছিল। ১৯৫২-১৯৫৫ সালে কলকাতার এশিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কলেজে সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। এই সময় তাঁর সহকর্মী ছিলেন অম্লান দত্ত।

তাঁর লেখাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে দুই ধরনের আড্ডা। একটি ছিল কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসের 'আদর্শনিষ্ঠ র‍্যাডিক্যালদের' সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের আড্ডা, অন্যটি সাহিত্যিকদের নিয়ে বসত উত্তর কলকাতার পাইকপাড়ার আড্ডা, যেখানে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, গৌরকিশোর ঘোষ, সন্তোষ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রূপদর্শী গৌরকিশোর, রাজ্যেশ্বর মিত্রসহ অনেকে অংশ নিতেন।

শিবনারায়ণের প্রবন্ধের দুটি মূল ধারা ছিল: সমাজের গভীর বিশ্লেষণ ও সমালোচনা এবং বাংলা সাহিত্য ও ভাষার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে চিন্তা-চর্চা। তিনি বিশ্বাস করতেন, "আমি যে সমাজে বাস করি, তার মধ্যে বিস্তর ত্রুটি আমাকে ক্রমাগত পীড়িত করে।" বাংলার গদ্য রীতির ঐতিহ্য যথাযথভাবে গড়ে ওঠেনি বলে তিনি আশঙ্কিত ছিলেন। তাঁর মতে, সমাজের স্থবিরতা, সংস্কৃতির ইন্দ্রিয়প্রবণতা, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভীতি ও চালাকি এই সমস্যার মূল কারণ। শিবনারায়ণ রায় ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক হলেও ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং শিল্পকলায় তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর মা রাজকুমারী রায়ও (১৮৮২-১৯৭৩) কবিতা রচনা করতেন এবং বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হত।

প্রবন্ধ-গ্রন্থাবলি

'প্রবাসের জার্নাল' (১৯৫৯), 'সাহিত্য চিন্তা' (১৯৫৬), 'মৌমাছিতন্ত্র' (১৯৬০), 'নায়কের মৃত্যু' (১৯৬০), 'কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা' (১৯৭৩), 'গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অবক্ষয়' (১৯৮১, 'স্রোতের বিরুদ্ধে' (১৯৮৪), 'রবীন্দ্রনাথ, শেকস্পীয়র ও নক্ষত্র সংকেত' (১৯৮৮), 'খাড়াইয়ের দিকে' (১৯৮৮), 'রেনেসাঁস' (১৯৯২), 'স্বদেশ, স্বকাল, স্বজন' (১৯৯৬), 'বিবেকী বিদ্রোহের পরম্পরা' (২০০০), 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' (সাহিত্য-১ম খণ্ড), 'প্রত্যয় অন্বেষা ও অনুচিন্তন'।

তাঁর বাবা উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী (১৮৬৭-১৯৫৯) ছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক এবং প্রাচীন ভাষা সাহিত্য ব্যাকরণ বিষয়ে বেশ কিছু মূল্যবান বই-এর রচয়িতা।

তিনি নানা বিষয়ে পঞ্চাশটিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস এবং সমাজ-সংস্কৃতি। এমন কি তিনি কিছু কাব্যগ্রন্থও প্রকাশ ঘটিয়ে সাহিত্য চিন্তা,নায়কের মৃত্যু, কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়র ও নক্ষত্র সংকেত, খাড়াইয়ের দিকে, স্বদেশ, স্বকাল, স্বজন, বিবেকী বিদ্রোহের পরম্পরা, বাঙালিত্বের খোঁজে ও শিল্পসাহিত্যে ছিল তাঁর গভীর অধ্যয়ন ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী চিন্তা। যা ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে, যেমন বলা যায় -'সাহিত্যচিন্তা' (১৯৫৬), 'মৌমাছিতন্ত্র' (১৯৬০), 'কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা' (১৯৭৩), 'গণতন্ত্র সংস্কৃতি ও অবক্ষয়' (১৯৮১), 'রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়র ও নক্ষত্র সংকেত' (১৯৮৩), 'স্রোতের বিরুদ্ধে' (১৯৮৪), 'রেনেসাঁস' (১৯৯২), 'স্বদেশ স্বকাল স্বজন' (১৯৯৬) এবং 'Radicalism : Philosophy of democratic Revolution' (1946), 'Socialism in India' (1965), 'The Intelligentsia' (1986)।

প্রাবন্ধিক শিবনারায়ণ রায়ের গদ্যশৈলী:

- শিবনারায়ণ রায় ছিলেন সমালোচনামূলক এবং বিশ্লেষণাত্মক রচনাশৈলীর জন্য খ্যাত। সেই মেধা দিয়ে তিনি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন।
- তাঁর রচনায় তত্ত্বের প্রাধান্য ছিল যা অবশ্যই পাঠককে সমৃদ্ধ করে তুলে।
- তিনি সম্পাদক ছিলেন বলেই তার প্রভাব পড়েছে প্রবন্ধ সাহিত্যেও। যা অবশ্যই মননশীল সাহিত্য হয়ে উঠেছে।
- বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর রচনার বিষয় ছিল মানবতন্ত্রের ভিত্তি। তাই নাস্তিক্য, যুক্তিবাদ মানবতাবাদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।
- তাঁর লেখা সমকালীন পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে প্রকাশিত হত।
- তাঁর লেখায় প্রতিফলন ঘটেছে নতুন ভাবনা, চিন্তনের অকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা সুপ্ত ভঙ্গিমা।
- তিনি রচনায় শুধু পাশ্চাত্যের হোমার, দান্তে, শেক্সপিয়র, গ্যাটে, ব্লেক, মিল্টন প্রমুখের সৃষ্টির জগত তুলে ধরার পাশাপাশি বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্যের মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল এমনকি তাঁর সমকালের জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ মনীষার সৃষ্টির ঐশ্বর্য ও দর্শন যুক্তি ও মননের নতুন ভাষা ও ভাবনায় বাঙালি পাঠককুলকে নতুন পাঠবীক্ষায় উন্নীত ও দীক্ষিত করতেও পেরেছেন।
- তিনি শুধু রচনার দিক দিয়ে নয়, তিনি প্রাণে, ধ্যান-ধারণায় রেনেসাঁসের প্রতীক পুরুষ হিসাবেও পরিচিত ছিলেন।
- দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, রামমোহন, ডিরোজিও সকলের লেখার বিষয় করে নিয়ে সমাজ পরিবর্তনের যুক্তিসম্মত কথা লিখে মননশীল প্রবন্ধ রচনা করেছেন।
- তাঁর অভিমত ছিল যে রাষ্ট্র থেকে প্রেম ও সৃষ্টি নির্বাসিত, সেখানে স্বাধীন চিন্তা নিষিদ্ধ। সেখানে বৈচিত্র্য অবলুপ্ত। সেখানে স্বাতন্ত্র্যের শাস্তি দাসত্ব অথবা মৃত্যু।
- সাংস্কৃতিক পথ ধরে, সেই নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। প্রাবন্ধিক শিবনারায়ণ রায়ের প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১২.৫ সুজিৎ চৌধুরী

ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস, সমাজ, লোকতত্ত্ব, লোকপুরাণ, লোকায়ত ধর্ম ও ভাষাসাহিত্যে গভীরভাবে নিমগ্ন সুজিৎ চৌধুরী 'দ্যা গোল্ডেন বাও' খ্যাত (The Golden Bough A Study in Comparative Religion, 1890 (retitled The Golden Bough : A Study in Magic and Religion) স্কটিশ নৃবিজ্ঞানী জেমস ফ্রেজার, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ববিদ দামোদর ধর্মানন্দদাস কোসাম্বী (Myth and Reality), রামশরণ শর্মার চিন্তার (Material culture and Social Formations in Ancient India) দ্বারা অনুপ্রাণিত গবেষণা ও মননের মাধ্যমে ইতিহাসচর্চাকে জীবন্ত ও প্রাসঙ্গিক করে তোলার পাশাপাশি একজন মননশীল প্রাবন্ধিক হিসেবেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্যজগতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।

পরিচিতি ও শিক্ষাজীবন

সুজিৎ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর অবিভক্ত ভারতের সিলেট, সুনামগঞ্জের বানিয়াচঙ গ্রামে। পিতা স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক বিধুভূষণ চৌধুরী, মাতা সুপ্রভা চৌধুরী। প্রাথমিক শিক্ষা পাইলগাও, এরপর করিমগঞ্জ সরকারি স্কুল, করিমগঞ্জ কলেজে স্নাতক এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির পর 'ফোকলোর গবেষণা' বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি লাভ। করিমগঞ্জ রবীন্দ্রসদন মহিলা কলেজে অধ্যাপনা থেকে অবসরের পর সিমলার 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ' (১৯৯৩-৯৫), এবং অতঃপর আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র সেন্টার ফর রিসার্চ ইন নেশন্যাল মুভমেন্ট অ্যান্ড নেশন্যাল ইন্টিগ্রেসন'-এ ভিজিটিং ফেলো (১৯৯৮-২০০০) হিসেবে বরাক-সুরমা উপত্যকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামীদের উপর গবেষণা করেন। প্রয়াণ ৯ মার্চ, ২০০৯, ব্যাঙ্গালুরুতে।

সুজিৎ চৌধুরীর গবেষণা ও রচনার প্রধান ক্ষেত্র

আঞ্চলিক ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বচর্চা

ঔপনিবেশিক কালে অবিভক্ত ভারতের সিলেট-কাছাড় সহ দক্ষিণ আসামের প্রান্তিক ভূমির ইতিহাসচর্চায় ইতিপূর্বে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, রাজমোহন নাথের মতো পথিকৃতেরা যে কাজের সূচনা করে একটি বিশেষ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, সেখানে স্বাধীনতা-উত্তরকালে তাদের উত্তরসূরি হিসেবে সুজিৎ চৌধুরী এ চর্চার ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

এ পর্বের গুরুত্বপূর্ণ রচনা:

- প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য: কিংবদন্তীর পুনর্বিচার (২০০০)
- শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস (২০০৩)
- Folklore and History : A Study of Folk cults of the Barak valley (1997, New Delhi)
- The Bodos : Emergence and Assertion of an ethnic minority, Shimla-2007
- মিজো বিদ্রোহের সামাজিক পটভূমি, শিলচর ১৯৯৭

সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র, বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠক সুজিৎ চৌধুরীর সাহিত্যমনস্কতা পরিস্ফুট হয়েছে নানান প্রবন্ধে। তাছাড়াও সাহিত্যরস সমৃদ্ধ পুরাতত্ত্ব, প্রত্নলিপি এবং লোকসাহিত্য নির্ভর প্রাচীন, মধ্যযুগের সমাজ ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ, নিবন্ধাদির মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

প্রসিদ্ধ রচনা ও প্রবন্ধ:

- হারানো দিন হারানো মানুষ, (দুই খণ্ডে আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা)
- অপু ট্রিলজি, সত্যজিৎ ও বিভূতিভূষণ
- কপালকুণ্ডলা: পাঠকের প্রতিবেদন
- বঙ্গজ আধুনিকতার দ্বৈত রূপ ও বিভূতিসাহিত্য
- শ্রীহট্টে অর্যব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সূচনা: নিধনপুর লিপি
- ইতিহাস ও জীবনানন্দ
- দেশভাগের অলিখিত উপন্যাস
- চর্যাপদ, কৃষ্ণকথা ও মঙ্গলকাব্যঃ অনালোচিত প্রেক্ষিত
- বরাক উপত্যকার বাঙালি: অস্তিত্ব ও অবয়বের সংকট
- বাস্তুহারার জবানবন্দী
- বরাক উপত্যকার দুঃখিনী বর্ণমালা
- বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষা

মূল ভাবনা ও তাত্ত্বিক কাঠামো

ক) নির্বাসন ও স্মৃতি

সুজিৎ চৌধুরীর রচনায় অনুরণিত হয়েছে প্রাদেশিক বিভাজনের যন্ত্রণাবোধ - বিশেষ করে ১৮৭৪ সালে শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চল বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসাম প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে। "যদি নির্বাসন দাও, তবে তা মাথা পেতে নেব- কিন্তু নিজের দেশেই পরবাসী হওয়ার এই গ্লানি থেকে আমাদের মুক্ত করো।" (বাস্তুহারার জবানবন্দী, ২০০৬)

খ) লোকসংস্কৃতি, লোকপুরাণ, উপ-আখ্যানিক ধর্মাচার ও গৌনধর্ম

তাঁর Folklore and History বইয়ে পশুপাখি বিষয়ক প্রতীক (animal motifs) ও লোকাচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক পর্বে ভ্রাম্যমাণ জনগোষ্ঠীর ধর্মচর্চা এবং ধর্মাচারকে তিব্বতী, অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজ ও জাতিগঠনের প্রাথমিক সূত্র সন্ধান করেছেন। মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর দেবত্বে উত্তরণ নিয়ে ("স্বর্ণ গোধিকার সন্ধানে") তাঁর বিশ্লেষণে উঠে এসেছে একটি ভিন্নতর লোকায়ত ধর্ম ও সংস্কৃতি পাঠ। বরাক উপত্যকায় লৌকিক উপদেবতা 'বাদসা উপাসনা' (syncretic cult) নিয়ে তাঁর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণও এ পর্যায়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

ভাষা ও সাংস্কৃতিক রাজনীতি বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি

বরাক উপত্যকার ভাষিক-সাংস্কৃতিক পরিচিতি নিয়ে বিভ্রান্তিকর কিছু অপপ্রচারের ("এই ভাষা আসলে বাংলাই নয়") প্রেক্ষিতে সুজিৎ চৌধুরীর যুক্তিসম্মত ও ঐতিহাসিক প্রতিরোধ লক্ষণীয়: "এই ধরনের বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া, বিশেষত সাহিত্য সংস্কৃতির মঞ্চ থেকে, শুধু ক্লান্তিকর নয়, আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকরও বটে।"(বরাক উপত্যকার সমাজ ও রাজনীতি, ২০০৭)

রবীন্দ্রপ্রভাব ও ঐতিহ্যচর্চা, শিক্ষাভাবনা

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও বাণী সুজিৎ চৌধুরীর ইতিহাসচর্চায় একটি Leit motif হিসেবে কাজ করেছে। বারবার উদ্ধৃত হয়েছে একটি রবীন্দ্র কবিতার পঙক্তি : "মমতা-বিহীন কালস্রোতে বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে নির্বাসিতা তুমি সুন্দরী শ্রীভূমি।" আজীবন ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে এই শ্রীভূমিকেই তিনি পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছেন।



জেনে রাখা ভালো

পুরস্কার ও সম্মাননা, বিশেষ বক্তৃতা

- নরসিংহ দাস পুরস্কার (দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়), ২০০৩
- সাহিত্য অকাদেমি অনুবাদ পুরস্কার, নতুন দিল্লি, ২০০৪
- বিভূতিভূষণ শতবার্ষিকী বক্তৃতা (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), ২০০৩
- জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবার্ষিকী বক্তৃতা, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯

বিশ শতকের প্রথমপর্বে শ্রীহট্ট-কাছাড়ে ইতিহাসচর্চার পথিকৃত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এবং অন্যান্যদের পর যখন ধারণাটা প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই গিয়েছিল যে, এ প্রান্তিক ভূমিতে আঞ্চলিক ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও সমাজচর্চার সম্ভাবনা প্রায় নিঃশেষ, তখনই সুজিৎ চৌধুরীর আত্মপ্রকাশ। অসীম সম্ভাবনায় ভরপুর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটির বহুস্তরীয় সম্প্রসারণ ঘটিয়ে তিনি ভারতের উত্তরপূর্ব ভূমির প্রান্তিক অঞ্চলে সমাজগঠনের

সূত্র অনুসন্ধানে প্রাক্-কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রাক্-ঐতিহাসিক পর্বে উত্তরণের সূত্র উদ্‌ঘাটন করে অনবদ্য বাংলা গদ্যে যে সন্দর্ভ রচনা করেছেন, নিজস্ব প্রসাদগুণে তা হয়ে উঠেছে এক সাহিত্যপদবাচ্য সৃজনও। এ পর্বের উল্লেখযোগ্য বই হল 'প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য: কিংবদন্তীর পুনর্বিচার', এবং 'শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস।'

সাহিত্য বিষয়ক যে সব প্রবন্ধ সুজিৎ চৌধুরী লিখে গেছেন তা একান্তই এক মুগ্ধ পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত, সেখানে ব্যক্তিগত পাঠানুভবের উষ্ণতা রয়েছে, সেইসঙ্গে রয়েছে বৌদ্ধিক দীপ্তির উদ্ভাসনও। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধে তাঁর ইতিহাসচেতনা বা ইতিহাসমগ্নতাও অন্তর্লীন।

তাঁর দুই খণ্ডে রচিত 'হারানো দিন হারানো মানুষ' একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকৃতি হিসেবে দেশ বিদেশে সমাদৃত। দেশ, মাটি হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়েও ভেতরে ভেতরে এক আজীবন শিশু এ লেখক মনের মধ্যে লালন করে গেছেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া দেশকে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালীন খণ্ডিত যে নির্বাসিতা ভূমিতে তিনি পা রেখেছেন তাকেই আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে করে তুলেছেন আবহমান বাংলার সঙ্গে সম্পৃক্ত নিজস্ব 'রূপসী বাংলা', যার বর্তমান পরিচিতি বরাক উপত্যকা। রাষ্ট্রনৈতিক মানচিত্রের ভ্রূকুটিকে অস্বীকার করে একটি অখণ্ড ভূমির হাজার বছর পেছনে প্রত্নকথার সন্ধানে তাঁর বিচরণ। একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে যে নিধনপুরের ময়ূরশাল্মলী বন, কালাপুর-চন্দ্রপুরী বিষয়া এবং ভাটেরার সমভূমিতে তাঁর অবিরাম পথ চলা, এ থেকে আহরিত প্রত্নকথা, তত্ত্বকথা বিজ্ঞসভায় উক্ত হয়েও যা কিছু রয়েছে অনুক্ত, তা-ই ভিন্নতর রূপে ফুটে উঠল দুই পর্বে রচিত আত্মজীবনী 'হারানো দিন, হারানো মানুষ' গ্রন্থে। ঐতিহাসিক হিসেবে নির্বাসিতা বাংলার একটি বাহ্যিক অবয়ব নির্মাণ করে, দ্বিতীয় পদক্ষেপে একজন লোকসংস্কৃতিবিদ হিসেবে অঞ্চলটির লোকযান, লোকশ্রুতি, লৌকিক আচার এবং সংস্কারের মধ্যে তিনি খুঁজে নিলেন সমাজ বাস্তবতার অন্তরঙ্গ চিত্র এবং আবিষ্কৃত এ নিসর্গে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেই আত্মচরিত লেখার ছলে হাজির করলেন জীবন্ত মানুষ, পাখপাখালি, জীবজন্তু, সরীসৃপ, মৎস্য, বৃক্ষ, লতাপাতা, বনস্পতি, মূল্যবান পত্র, পুষ্প এবং ধান্য সম্পদের সমাহার।

বিদগ্ধ এ ইতিহাসবিদের মর্মস্পর্শী আত্মচরিত পড়লে মনে হয় তিনি যেন বিভূতিভূষণের সেই নিশ্চিন্দিপুর-হারানো অপু। বাস্তুচ্যুতির অনুভূতি তাঁকে পীড়িত করেছে, কিন্তু রচনাকৃতিতে এ দুঃখবোধ বাজারজাত করা, বা এর দায়ভার কারও উপর চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি অগ্রসর হননি। কিশোর মনের উপর দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দুঃসহ একটা চাপ অবশ্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে এ আত্মচরিতের অক্ষরে অক্ষরে।

তবে সূচনা থেকেই হিংসাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদের পথ পরিহার করে একজন মুক্তমনা হিসেবেই তাঁর আত্মপ্রকাশ। কুশিয়ারা-বরাকের নির্বাসিতা ভূমিতে পা রেখে তিনি ধর্মীয় বিদ্বেষ আর হিংসার অনুশীলনের মূলোৎপাটন করতেই কলম ধরেছেন। তিনি কলম ধরছেন মিথ্যা সাংস্কৃতিক অহমিকা এবং ভাষিক হানাহানির বিরুদ্ধেও। চোখের সামনে প্রিয় জন্মভূমি বিদেশ হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্যেও তাঁর আর্তনাদে বিষাদ আছে, কিন্তু বিষবাষ্প নেই। উপমহাদেশের এ প্রান্তভূমির অমানবিক হাতবদলের কাহিনি, যা সুজিৎ চৌধুরীর লেখনীতে ধরা পড়েছে তা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্যকৃতির এক অনুপম নিদর্শন। খণ্ডিত ভূমিতে 'বাস্তুহারার' মর্মস্পর্শী আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে এমনই একটি নিবন্ধে -

'মাঝে মাঝে মনে হয় হৃদয়ের ভাষা পড়ার মানুষ এদেশে নেই।... অপমান অবিচার-হিংসা-দ্বেষের নাগপাশে নিঃশ্বাস নেওয়া যখন কঠিন হয়ে পড়ে, ডুকরে কেঁদে উঠে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, হে ভারতজননী, কী আমাদের পাপ? স্বাধীনতা বৃক্ষের ফলটি নিঃশেষে গলাধকরণ করার জন্য আমরা তো মাতৃ অঙ্গে কুঠারাঘাত করিনি। মাতৃঘাতী পরশুরামের ভূমিকায় যারা অভিনয় করেছেন, তারা তো তোমার ক্ষমাসুন্দর আশ্রয় পেয়ে গেল। মাতৃ অঙ্গচ্ছেদের দরুণ যে অনিবার্য রক্তক্ষরণ তার দায় পুরোটা আমরাই মিটিয়েছি। সে রক্তমূল্যের বিনিময়েও কি তোমার মাটিতে পা রাখবার অধিকার আমাদের জন্মায় না?'

ইতিহাসের একটি দুঃসহ ভার তিনি কলমের এক আঁচড়ে নামিয়ে দিয়েছেন— 'যদি নির্বাসন দাও তবে তা মাথা পেতে নেব-নির্বাসিত জীবনের দুর্যোগতম মুহূর্তেও আমরা মাতৃপরিচয় তবু ভুলব না, কারণ আমাদের ভারতীয়ত্ব শুধুমাত্র মানচিত্রনির্ভর নয়, এই ভূখণ্ডের মহত্তর ধ্যানরূপ আমাদের হৃদয়ে স্থাপিত। তবু, তবু হে ভারতজননী, নিজবাসভূমে পরবাসী সেজে থাকার দুর্বহ গ্লানি থেকে আমাদের উদ্ধার করো।' ('বাস্তুহারার জবানবন্দী', সময়ের পদাবলি, করিমগঞ্জ, ২০০৬)

ঐতিহাসিক সুজিৎ চৌধুরী ছিলেন কথাসাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠক। বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিভূতিভূষণ নিয়ে তাঁর বিশেষ পাঠ রয়েছে। বাংলার লোকজীবনের অন্যতম কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর মননের বিশেষ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। এ দুজন কথাকার সম্বন্ধে তিনি বলেন 'বাংলার দুজন সেরা কথাসাহিত্যিক যখন গ্রামজীবনকে অবলম্বন করে কাহিনি রচনা করেন তখন ধরে নেওয়া যায় গ্রামজীবনের লোকায়ত প্রবাহটি তাঁরা অনুধাবন করেছেন।' ইছামতী, হাঁসুলিবাঁক পাঠে সুজিৎ চৌধুরীর অভিপ্রায় হল ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা অনুধাবন। সাহিত্য বিচারে এর অবস্থান কোথায় সে বিচারে না গিয়েও বলা যায় লোকসংস্কৃতি পাঠে এ অনুশীলন অবশ্যই অভিনব।

ব্যক্তি সুজিৎ চৌধুরী যে একসঙ্গে অনেক বিষয়ে মগ্ন থাকতে পারেন এর স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর -- 'কপালকুণ্ডলা: পাঠকের প্রতিবেদন', 'বঙ্গজ আধুনিকতার দ্বৈত রূপ ও বিভূতি সাহিত্য', 'অপু ট্রিলজি, সত্যজিৎ ও বিভূতিভূষণ', 'চর্যাপদ, কৃষ্ণকথা ও মঙ্গলকাব্য' ইত্যাদি রচনায়। তাঁর নিবন্ধ 'স্বর্ণগোধিকার উৎস সন্ধানে' আমাদের লোকসংস্কৃতিচর্চায় এক মাইলফলক বিশেষ। এখানে খেন, তিব্বত-বর্মী, অস্ট্রো-মঙ্গলয়েড এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত animal motif বিশেষ ভাবে চর্চিত হয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশবর্তী অঞ্চলে সরীসৃপের দেবত্বে উত্তরণের এ প্রক্রিয়া মঙ্গোলীয় এবং ইন্দো-চৈনিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আসাম-অরুণাচল প্রদেশ ও নদীমাতৃক বঙ্গদেশে একই প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়। এ হেন জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভের পাশেই রয়েছে তাঁর আত্মমগ্ন কবিতা পাঠ-- 'ইতিহাস ও জীবনানন্দ'। ("ছিন্ন চিন্তা, ভিন্নমত" ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, প্যাপিরাস, কলকাতা, গ্রন্থে সংকলিত।)

সাময়িক ঘটনার প্রেক্ষিতে সুজিৎ চৌধুরীর প্রচার পুস্তিকাগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ,

তীক্ষ্ণ বাকবৈদগ্ধ পাঠকদের চমকিত করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু, অনৃত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এ 'প্যামপ্লেট লিটারেচার'-এর পাঠমূল্য কম নয়। রাজনৈতিক অভিসন্ধি চরিতার্থ করতে বরাক উপত্যকায় প্রচলিত কথ্যভাষা যে মূলত বাংলাই নয় এরকম একটা অবাস্তব তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসকে তথ্য ও যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে তিনি সর্বশেষ যে শান্ত সংযত বাক্য প্রয়োগ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য-

"...এই ধরনের বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া, বিশেষত সাহিত্য ও সংস্কৃতির মঞ্চ থেকে, শুধু ক্লান্তিকর নয়, মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকরও বটে। একধরনের সংকীর্ণতাবোধ অনিবার্যভাবেই এই ধরনের বিতর্কে অন্তর্লীন থাকে যা সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার মৌলিক লক্ষ্যরে পরিপন্থী। "

সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণবাদের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর উচ্চারণ পাঠক মনে গভীর রেখাপাত করে-- "আমরা সচেতন যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অসমিয়া ও জনজাতীয় সংস্কৃতিকর্মীদের বড় একটি অংশ এই ধরনের সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণবাদের বিরোধী এবং ভ্রাতৃত্ববোধ, সমন্বয় এবং সহাবস্থানের ভিত্তিতে সমগ্র রাজ্যে একটি উদার ও উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টি করার সংগ্রামে তাঁরা নিয়োজিত। তাঁদের সেই মহৎ প্রয়াসের প্রতি আমাদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত সদাই প্রসারিত...।" ('বরাক উপত্যকার সমাজ ও রাজনীতি', ২০০৭, যুগশক্তি প্রকাশন, করিমগঞ্জ, গ্রন্থে সংকলিত)

শিক্ষাবিদ সুজিৎ চৌধুরী আসাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে (১৯৯৪) যে গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধটি লিখেছেন তা এ রাজ্য সহ সারা দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একটি আলোকদর্শীই বলা যায়- "সকলেই জানেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বরাক উপত্যকার বিশ্ববিদ্যালয়।... কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে তা সর্বভারতীয় বটে।... বিশ্বের অনুষঙ্গ তো তার ধারণার মধ্যেই অন্তর্লীন। খণ্ডের গণ্ডিতে থেকেও পর্যায়ক্রমে অখণ্ডের পথে যাত্রা করার উপাদান তো জন্মসূত্রেই সে বহন করেছে।" 'পথের পাঁচালী' প্রণেতা বিভূতিভূষণের বরাত দিয়ে তিনি শেষ কথাটি বলেছিলেন- "পথের পাঁচালীর অপু জন্ম নিয়েছিল পাড়াগাঁ নিশ্চিন্দিপুরে-নিজের সাধনায় সে পরিণত হয়েছিল বিশ্বনাগরিকে... প্রত্যন্ত বরাক উপত্যকা আর সংলগ্ন পার্বত্য এলাকারও যদি সাধনার জোর থাকে, তবে বিশ্বকেই অর্জন করতে পারবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিশ্ব অর্জিত হয় ভ্রমণে নয়, মননে। ("কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও আমাদের জ্ঞানচর্চা," ১৯৯৪, শিলচর)

গভীর ভাবে রবীন্দ্র-অনুরক্ত সুজিৎ চৌধুরীর শ্রীহট্ট-কাছাড়ের ইতিহাসগ্রন্থে বহু-উদ্ধৃত একটি রবীন্দ্রকবিতা এসেছে leit motif হিসেবে— 'মমতা বিহীন কালস্রোতে বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে নির্বাসিতা তুমি সুন্দরী শ্রীভূমি।' এখানেই ইতিহাসবিদ নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। রবীন্দ্র-কাব্যস্পর্শধন্য বাংলার এ সম্প্রসারিত ভূমি যে প্রকৃত অর্থেই নির্বাসিতা এ উপলব্ধি তাঁকে ইতিহাস রচনায় প্রাণিত করেছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে- নির্বাসনের কথা এখানে বলা হয়েছে তা ঘটেছে ১৮৭৪ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে শ্রীহট্ট-কাছাড় এবং সংলগ্ন গোয়ালপাড়া, খাসি জয়ন্তীয়া পাহাড়কে কেটে এনে নবসৃষ্ট আসাম প্রদেশ গঠন কালের এ ঘটনা যার অভিঘাত আজও অঞ্চলটিকে পীড়িত করছে। দক্ষিণ আসামের ইতিহাস-বর্জিত অঞ্চলটিতে হাজার বছর পূর্বে

আর্যাবর্তের আত্মপ্রকাশ এবং কৃষি সম্প্রসারণের ধারা যেমন তিনি অনুসরণ করেছেন তেমনি এ অঞ্চলে ভ্রাম্যমান অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, অ্যালপাইন, মঙ্গোলীয় ভোটব্রহ্ম এবং নর্ডিক জনগোষ্ঠীর বিচরণের ধারা অনুসরণেরও যে প্রয়াস তিনি পেয়েছেন এর পেছনে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৩০৯)' প্রণেতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতিও স্পষ্ট। কবি নির্দেশিত 'প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যরে অভিমুখিন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এক-কে নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি' করার নির্দেশই পালন করেছেন সুজিৎ চৌধুরী। আগামীদিনের ইতিহাসবিদের কাছে কবিগুরুর নিবেদন ছিল "যে আঘাত করিতেছে সেই আঘাত স্বদেশকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করতে অনুপ্রাণিত করবে... প্রবাসে নির্বাসনই আমাদের কাছে গৃহের মাহাত্ম্যকে মহত্তম করিয়া তুলিবে"-- সুজিৎ চৌধুরী কবিগুরুর এ বাক্যের মর্মার্থ যথার্থই উপলব্ধি করেছেন। তাঁর নির্দেশকে আত্মস্থ করে রচিত ইতিহাসগ্রন্থকে সাহিত্যের অঙ্গনে স্থান দিতে বোধকরি কারও সংশয় হবে না।

সর্বশেষে সুজিৎ চৌধুরীর একটি মহত্তম অনুবাদের উল্লেখ রাখাও প্রয়োজন। প্রায় শতাব্দী কাল অন-অনুদিত, আইরিশ কবি ডবলিউ বি ইয়েটস কৃত ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-র ভূমিকা-নিবন্ধটি (১৯১২) সুজিৎ চৌধুরী বাংলায় অনুবাদ করে এক ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করে গেছেন। বিদেশি কবির উচ্ছ্বাস তাঁর অননুকরণীয় অনুদিত গদ্যে ভাস্বর হয়ে আছে--

"মহান উচ্চতম এক সংস্কৃতির ফসল এই লেখাগুলোকে আবার মৃত্তিকাতে স্বতৎসারিত তৃণগুল্মের মতো স্বাভাবিক বলে মনে হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহমান এই ঐতিহ্যে ধর্ম আর কাব্য একীভূত হয়ে গেছে, তাতে সঞ্চিত হয়েছে জ্ঞানলব্ধ অথবা সহজিয়া রূপক আর আবেগময় অভিব্যক্তির সম্ভার। ...বাংলার সভ্যতার প্রবাহ যদি অবিচ্ছিন্ন থাকে যদি সব কিছু নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে, তবে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় যে কয়েক প্রজন্ম পর এই কবিতাগুলোর সূক্ষ্মতম নিদর্শনগুলোও পথের ভিক্ষুকদের মধ্যে পরিব্যপ্ত হবে। ...প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে রাজপথের পথিক আর নদীপথের মাঝিদের কণ্ঠে এগুলো গীত হবে। প্রেমিকেরা যখন একে অন্যের জন্য প্রতীক্ষায় থাকবে, এইগুলো গুনগুন করতে করতে আবিষ্কার করবে যে ঈশ্বরপ্রদত্ত ঐ ভালোবাসার গান এমন এক জাদুসাগর যেখানে স্নান করে নিজের তিক্ত অনুভূতিকে নবীকৃত যৌবনে রূপান্তরিত করা যায়...।" (গীতাঞ্জলি, নোবেল পুরস্কার বিতর্ক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, করিমগঞ্জ, আসাম, ২০০৭)

সুজিৎ চৌধুরী কেবল একজন ইতিহাসবিদ নন-তিনি একাধারে ভাষাতাত্ত্বিক, সৃজনশীল সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠক, লোকসংস্কৃতির মরমী অন্বেষক ও বিশ্লেষক। উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসে তিনি সূচিত করেছেন নতুন পাঠপদ্ধতি। আত্মপরিচয় ও ভাষা-রাজনীতির দ্যোতনা এবং সেই সঙ্গে অনুপম রচনাশৈলী প্রাণ সঞ্চার করেছে তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ এবং নিবন্ধে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। সুজিৎ চৌধুরীর সদ্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১২.৬ সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৯২১-২০১৪)

সুকুমারী ভট্টাচার্যের জন্ম ১২ জুলাই, ১৯২১ সালে মেদিনীপুরে। বাবা ছিলেন সরসী কুমার, মা সান্তাবালা দত্ত। স্বামী অধ্যাপক অমলকুমার ভট্টাচার্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে এম-এ ১৯৪৪ সালে পাশ করেন। তারপর দশ বছর পরে এম-এ ডিগ্রি পান সংস্কৃত সাহিত্যে। ১৯৬৬-তে সংস্কৃতি সাহিত্যে ডক্টরেট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কর্মজীবনের শুরুর দশ বছর কেটেছে লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে, তিনি এখানে ইংরাজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করাতেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সংগীত, সাহিত্য ও শিল্পকলায় আগ্রহী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত, পালি, গ্রীক, ফরাসি, জার্মান ইত্যাদি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। প্রবন্ধ সাহিত্য ধারার এক জনপ্রিয় ব্যতিক্রমী প্রাবন্ধিক হলেন সুকুমারী ভট্টাচার্য।

প্রবন্ধ পরিচয়

তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থর প্রথম খণ্ডে শেষ সংস্করণে তিনটি বই রয়েছে। 'প্রাচীন ভারত', 'প্রাচীন ভারতের নারী', এবং 'প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য।' 'প্রাচীন ভারত' প্রবন্ধ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল- 'প্রাগার্য সভ্যতা', 'আর্যরা : সাহিত্যযুগ', 'ব্রাহ্মণ সাহিত্যে সমাজ ও ধর্ম', 'আরণ্যক উপনিষদযুগ', 'বেদবিরোধী ধর্মধারা : জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম', 'মগধের অভ্যুত্থান', 'মৌর্যযুগ', 'মৌর্যবংশের পরে', 'কুষাণ সাম্রাজ্য', 'সাতবাহন যুগ', 'গুপ্তযুগ' প্রভৃতি।

'প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ' প্রবন্ধ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল- 'বৈদিক যুগে নারী', 'প্রাচীন ভারতে মাতৃত্ব', 'প্রাচীন ভারতে নারী অর্থনৈতিক অধিকার', 'শাস্ত্রে পণপ্রথা ও স্ত্রীধন', 'তনয়া', 'মহাভারতে ভার্গব- প্রক্ষেপণের সামাজিক কারণ', 'নারী সমাজের উপর হিংসাত্মক উপদ্রব', 'নারী ও নীরবতা', 'প্রাচীন ভারতবর্ষে 'শান্তি'র সংজ্ঞা', 'শম্বুক ও মায়াতি : সমাজে শূদ্রের অবস্থান বিষয়ে একটি বিচার', 'নিয়তিবাদ- এর কারণ ও প্রভাব। প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য প্রবন্ধ গ্রন্থের বেশকিছু প্রবন্ধ হল। যেমন- ঋগ্বেদের দিনের মানুষ, ঋগ্বেদে সৌরসূক্তে কাব্য, বৈদিক সমাজে নারীর স্থান, যাজ্ঞবল্ক্য ও উপনিষদের যুগ, প্রাচীন ভারতে গণিকা, মহাকাব্য মহাভারত, নারীর স্থান রামায়ণে ও মহাভারতে, কালিদাস কাব্যে কয়েকটি আদিকল্প, মৃচ্ছকটিক, শতক, কাব্যে অলংকারে সীমা, সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্লীলতা, দুঃখান্ত পরিণতি ও সংস্কৃত সাহিত্য, চৌরপঞ্চাশিকা, ইত্যাদি।

তাঁর প্রবন্ধগুলি থেকে নানা বৈচিত্র্য বিষয় ফুটে উঠতে দেখা যায়। তাঁর এক প্রবন্ধ থেকে বৈদিক যুগের সমাজ জীবনের একটি বিশেষ দিকের কথা ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছে। "বৈদিক যুগের মাঝামাঝি সময়েই সমাজে অল্প কিছু ধনী ও বিস্তর গরিব ছিল। গরুই ছিল প্রধান সম্পত্তি এবং গরু চুরি করে নিয়ে যাওয়ার কথা প্রায়ই পাওয়া যায়।"

সুকুমারী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধসংগ্রহ-২, এই প্রবন্ধে তিনি নানা বিবাহের দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি দু'টি প্রবন্ধগ্রন্থ বেদ আশ্রিত যথা- 'বেদে ক্ষুধা প্রসঙ্গ' ও 'বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য'। তাঁর 'বেদে ক্ষুধা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে যে সকল উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সেগুলি হল— 'খাদ্যের প্রার্থনা', 'খাদ্যাভাস' ও 'যাগযজ্ঞ', 'ক্ষুধার দার্শনিক উচ্চারণ', 'অন্ন ব্রহ্ম', 'খাদ্যের আখ্যান',

'শ্রেণিবিভাজন' ও 'বহমান ক্ষুধা'।

'বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য' প্রবন্ধ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল— 'বেদ রচনার গোড়ার দিক', 'সংশয়ের বীজ', 'মৃত্যু ও সংশয়', 'অবৈদিক সংশয়', 'শ্রেণি ও সংশয়', 'জিজ্ঞাসা ও সংশয়', 'অজানা উত্তর', 'নচিকেতার প্রশ্ন', 'সংশয় ও নাস্তিক্যের ধারা' প্রভৃতি।

'আপেক্ষিক মূল্যায়ণে রামায়ণ ও মহাভারত' প্রবন্ধ গ্রন্থের কিছু প্রবন্ধ হল— 'রামায়ণের সহজ আবেদন', 'মহাভারতের মহত্তম দ্বিধা', 'মহাভারতের নৈতিক অভিঘাত', 'ভীষ্ম : চিন্তার সংঘাত', 'দ্রোণ : 'চারিত্রিক দ্বন্দ্ব', 'কর্ণ' : সংবেদনার জটিলতা, 'জীবনদর্শনের পার্থক্য', 'অতিলৌকিকতা ও মানবিক সংশয়', 'দেবতা না মানুষ?' 'মহাভারত স্রষ্টার অর্ন্তদ্বন্দ্ব', 'সংশয়ের উজ্জ্বলতা', 'জীবনবোধের পুনর্মূল্যায়ণ', 'রামায়ণ : সহজ পথরেখা', 'মহত্তর সাধনার দিশা' প্রভৃতি।

'দাম্পত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল—

'কনকাঞ্জলি', 'ক্রীতদাসী', 'সম্পর্ক', 'যৌনতা', 'প্রেম', 'বিচ্ছেদ', 'শৃংখলা', 'অমৃত কলস', 'ভবিষ্যৎ প্রভৃতি'। তিনি তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন নারী জীবনের কথা। যা বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিকতা বহন করে। তাই তিনি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গেই বলেছেন-"... ইদানীং বহু সংসারে দাম্পত্য কলহ বাড়ছে, সেটা হল সংসারে গৃহকর্ম একা মেয়েটিকেই সামলাতে হয়।"

সুকুমারী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধসংগ্রহ-৩, এ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল—

'পুনরাবলোকনে বাল্মীকির রাম', 'নিয়তিবাদের স্বরূপ', 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ', 'আচার্য সুনীতিকুমার', 'গৌতম বুদ্ধ' ইত্যাদি।

'নিয়তিবাদের স্বরূপ' প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল—

'ভারতে নিয়তিবাদের জন্ম', 'জন্মান্তরবাদ থেকে নিয়তিভাবনা', 'কর্ম', 'কর্মফল ও নিয়তি', 'ভবিষ্যতের পূর্বাভাস', 'নিয়তি ও প্রতিকারের চেষ্টা', 'নিয়তি ও মুক্তি প্রচেষ্টা', 'দৈব ও আত্মশক্তি' ইত্যাদি।

'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল—

'অমৃতের পথে : রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু-প্রসঙ্গ', 'রবীন্দ্রকাব্যে মানুষ ও নৈতিকতা', 'রবীন্দ্রসাহিত্যে সংস্কৃত প্রভাব', 'রবীন্দ্রসাহিত্যে সংস্কৃত নাটক' প্রভৃতি।

সুকুমারী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধসংগ্রহ-৪, এ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল-

'বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা', 'বিবিধ প্রবন্ধ'

'বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা' প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল—

'ঋগ্বেদ সংহিতা প্রসঙ্গে', 'সামবেদ সংহিতা কথা', 'যজুর্বেদ সংহিতা কথা', 'অর্থববেদ সংহিতা কথা', 'ব্রাহ্মণসাহিত্য', 'আরণ্যক সাহিত্য', 'উপনিষদ্-কথা', 'বেদাঙ্গসূত্র' প্রসঙ্গে প্রভৃতি।

'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল—

'আচরণে যুক্তিবাদ', 'গীতগোবিন্দ কাব্য', 'কুন্তী', 'গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র' প্রভৃতি।

সুকুমারী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধসংগ্রহ-৫, এ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল—

'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা', 'গীতা কেন? হিন্দু', 'হিন্দুত্ব ও অন্যান্য '

'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' প্রবন্ধ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল—

'ভারতবর্ষে সমন্বয়ের ধর্মধারা', 'সাম্প্রদায়িকতা', 'সাম্প্রদায়িকতা'।

'হিন্দু, হিন্দুত্ব ও অন্যান্য'—

প্রবন্ধের কিছু প্রবন্ধ হল—

'প্রাচীন ভারত', 'ধর্ম', 'সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র', 'ভারতবর্ষে আগন্তুক- মুসলমান', 'প্রাচীন ভারতে ইতিহাস-চেতনা', 'ভারতবর্ষে ধর্মের ভূমিকা', 'আজকের নারী কি বেদপাঠ করতে পারে?', 'রামচরিত্রের পুনর্মূল্যায়ন', 'বর্তমান ভারতে ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা', 'সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি।



জেনে রাখা ভালো

পৃথিবীর প্রাচীন সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতবর্ষের দেব-কল্পনা ও চিন্তাধারার ইতিহাস অন্যতম প্রিয় বিষয় ছিল তাঁর। নারী-চেতনার উন্মেষ ও নারী-প্রগতির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তিনি। এশিয়াটিক সোসাইটিতে ফেলো হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি সুবিধা বঞ্চিত মেয়েদের জন্য 'সচেতন' নামে এক প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৮২ সালে। তাঁর কিছু গ্রন্থ হল- 'The Indian Theogory', ' Literatue in the Vedic Age', বাংলা অনুবাদে 'মৃচ্ছকটিক'। 'Buddist Sanskrit Literature'. 'Classical Sankrit Literature'.

১৯৫৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য পড়ানোর জন্যে ডেকে নিলেন বুদ্ধদেব বসু।

তাঁর লেখা 'প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য' গ্রন্থের জন্য আনন্দ পুরস্কার পান। ১৯৮৮ সালে।

প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধের বিষয় ও বৈশিষ্ট্য

- সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রাচীন ভারতের সামাজিক সহিষ্ণুতা, অর্থনৈতিক সংকট এবং ধর্মীয় চেতনার জটিলতা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি গান্ধীজির কথা স্মরণ করিয়ে দেন— 'ক্ষুধিতের সামনে স্বয়ং ভগবানও খাদ্য ছাড়া অন্য রূপে আসতে পারে না।' বেদের যুগের সমাজে খাদ্যের অভাব ছিল সর্বব্যাপী, মানুষ দেবতাদের কাছে অনুরোধ করত ক্ষুধা মেটাতে। এই খাদ্যাভাবের প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবনযাপন, সমাজ ও ধর্মীয় আচরণ গড়ে উঠেছিল।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের উত্থান তিনি গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। বর্ণ ও জাতির মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভাজন বৃত্তিনির্ধারিত হলেও, পরবর্তীতে শ্রেণি বিভাজনের মুখে সমাজের মূল পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় ধনী-দরিদ্র এবং শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যে পার্থক্য।

- সুকুমারী ভট্টাচার্য বেদের সময়ের অহিংসার আদর্শকে যজ্ঞ ও পশুহত্যার বিরোধ হিসেবে দেখিয়েছেন। পশু-হত্যা কমাতে এই অহিংসার বাণী দ্রুত জনপ্রিয়তা পায় এবং ধীরে ধীরে যজ্ঞের চলাচলও হ্রাস পায়।
- তিনি মহাভারতের নৈতিক ও দার্শনিক দ্বন্দ্বের ওপরও আলোকপাত করেছেন। মহাকাব্যের মূল থিম হিসেবে জীবনবোধ ও আদর্শের সংঘর্ষকে তুলে ধরেছেন, যেখানে দুটি ন্যায়সংগত বিকল্পের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা চিত্রিত হয়েছে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুচেতনা ও তাঁর অমৃতবিশ্বাসের পরিবর্তনও ভট্টাচার্যের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ও ক্ষতির বেদনা কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে ধীরে ধীরে তিনি ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত কোনো শক্তির প্রতি তাঁর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন।

প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্যের গদ্যশৈলী:

- তাঁর প্রবন্ধে উঠে এসেছে অভিজ্ঞতা, যুক্তিবোধ, ও স্বকীয়তা।
- বেদের যুগের সমাজচিত্র সেই সঙ্গে নানা অনুষঙ্গ এনে প্রবন্ধ সাহিত্যকে পাঠক সমাজে বাস্তব করে তোলেন।
- বেদের যুগের সমাজচিত্র ও সাহিত্যকে অজস্র অনুষঙ্গ সহ পাঠকের সামনে তিনি বাস্তব তুলে ধরেছেন।
- সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনায় বেদের জগৎকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মাত্রা দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।
- সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থে ক্রমবর্ধমান শ্রেণি বৈষম্যের ইতিহাস বর্ণিত করেছেন। এখানে নানা বিশিষ্ট বৃত্তির প্রয়োজন দেখিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে বর্ণগুলির মধ্যে ক্রমাগত অন্তর্বিবাহে রূপটিও দেখিয়েছিলেন।
- তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক হল মহাভারতের গভীর আলোচনা তুলে ধরেছেন প্রবন্ধে। সেখানে উঠে এসেছে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, নৈতিক অভিঘাত ইত্যাদি বিষয়গুলি।
- 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গে' রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা ও অমৃতবিশ্বাসের আলোচনা উঠে এসেছে তাঁর এই প্রবন্ধে।
- তাঁর প্রবন্ধে হিন্দু ধর্মে তথাকথিত উদারতা ও সহিষ্ণুতার আড়ালে, দেখা গিয়েছে নারী ও শূদ্র, সমাজের এই দুই প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের প্রতি বিদ্বেষমূলক বৈষম্য ও শোষণের নানা দিক।
- তাঁর প্রবন্ধে উঠে এসেছে বৈদিক সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ থেকে নানা তথ্য যা পাঠককে সমৃদ্ধ করে তুলে।
- মেয়েদের আত্মমর্যাদা ও সামাজিক সমতার কথা সুকুমারী ভট্টাচার্যের রচনায় দেখা গিয়েছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৪। সুকুমারী ভট্টাচার্যের গদ্য সাহিত্যেরে বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১২.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

সৈয়দ মুজতবা আলী, শিবনারায়ণ রায়, সুজিৎ চৌধুরী এবং সুকুমারী ভট্টাচার্য— এই চারজন প্রাবন্ধিক বাংলা গদ্যসাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁদের রচনায় যুক্তি, মনন, শৈলী ও ভাষার অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখায় যেমন রয়েছে হাস্যরস ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মনোমুগ্ধকর বর্ণনা, তেমনি শিবনারায়ণ রায়ের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে দার্শনিক গভীরতা ও চিন্তার স্বাধীনতা। সুজিৎ চৌধুরী ছিলেন বিশ্লেষণধর্মী ও গভীর পাঠপ্রবণ চিন্তাবিদ, যাঁর প্রবন্ধে একাধারে সাহিত্য, ইতিহাস ও সমকালীন সমাজের প্রতিফলন দেখা যায়। অপরদিকে, সুকুমারী ভট্টাচার্য নারী-চিন্তা, পুরাণ ও সমাজতত্ত্বের আলোকে প্রবন্ধ রচনায় এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

এই প্রাবন্ধিকেরা প্রত্যেকে তাঁদের নিজস্ব ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা কেবল প্রাবন্ধিকই নন, বরং সময় ও সমাজের সংবেদনশীল ভাষ্যকারও বটে। তাঁদের রচনাশৈলী ও মননচর্চা বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে এক অনস্বীকার্য অবদান রেখেছে। তাই বলা যায়, বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এঁদের ভূমিকা চিরস্মরণীয় ও অনুপ্রেরণাদায়ক।



১২.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে জানতে পারলাম।
- প্রাবন্ধিক শিবনারায়ণ রায়ের গদ্যশৈলী সম্পর্কে জানতে পারলাম।
- প্রাবন্ধিক সুজিৎ চৌধুরীর প্রবন্ধের নানা দিক সম্পর্কে জানতে পারলাম।
- প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রবন্ধের নানা দিক সম্পর্কে জানতে পারলাম।



১২.৯ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার; (২০১৮) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- গিরি, ড.সত্যবতী; (মার্চ ২০০৬ ও মজুমদার, ড. সমরেশ; (সম্পা) 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন', কলকাতা: রত্নাবলী

- চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল; (১৪১৮ বঙ্গাব্দ); সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্যপ্রসঙ্গ; কলকাতা : রত্নাবলী
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (২০১৭); আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : প্রজ্ঞাবিকাশ
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ; (২০০৮); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা কলকাতা : তুলসীপ্রকাশন
- চৌধুরী, সুজিৎ (২০০৫); হারানো দিন হারানো মানুষ দুই খণ্ড; শিলচর : যুগশক্তি
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী (২০১৪); প্রবন্ধসংগ্রহ (১-৫); কলকাতা : গাঙচিল
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী (১৪২২); প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য; কলকাতা: আনন্দ
- মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা; (১৩৫৬); সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাবলী (প্রথম খণ্ড); কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার; (২০১৪-২০১৫); বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- রায়, সবিতেন্দ্রনাথ ও চক্রবর্তী মণীশ; (১৪২১) গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন; কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
- রায়, শিবনারায়ণ; (২০০২); প্রবন্ধ সংগ্রহ (২); কলকাতা: আনন্দ
- শাকুর, আবদুশ; (২০২০); শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ: সৈয়দ মুজতবা আলী; ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য
- সরকার, পবিত্র; (২০১০); গদ্যরীতি পদ্যরীতি; বাংলাদেশ: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

১২.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। তিনি বাংলা সাহিত্যে সরস, মার্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত এক অননুকরণীয় রচনাধারার প্রবর্তন করেছিলেন। ...তাঁর রচনা রীতির বৈশিষ্ট্য ছিল মজলিশি বৈঠকী। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল: 'দেশে-বিদেশে' (১৩৫৬ , 'পঞ্চতন্ত্র, (১৩০৬) 'চাচাকাহিনী' (১৩৫৯), 'ময়ূরকণ্ঠী' (১৩৫৯), 'অবিশ্বাস্য' (১৩৬১), 'পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (১৩৬৩), 'জলে ডাঙায়' (১৩৬৩), 'ধূপছায়া' (১৩৬৪), 'দ্বন্দ্ব-মধুর' (১৩৮৫) 'চতুরঙ্গ' (১৩৬৭), 'শবনম্' (১৩৬৭) ...এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তুলতে হবে। (দ্রষ্টব্য ১২.৩ অংশ)

২। আধুনিক মননশীল প্রাবন্ধিক ছিলেন শিবনারায়ণ রায়। ...বর্তমানে বাংলায় মৌলিক চিন্তাসম্পন্ন এবং সাহিত্য শিল্পে সিদ্ধ লেখক লেখিকা নিতান্ত দুর্লভ ...তাঁর লেখাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল দুইটি আলাদা রকমের আড্ডা। ...তাঁর গদ্যগ্রন্থগুলি হল: 'প্রবাসের জার্নাল' (১৯৫৯), 'সাহিত্য চিন্তা' (১৯৫৬), 'মৌমাছিতন্ত্র' (১৯৬০), 'নায়কের মৃত্যু' (১৯৬০), 'কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা' (১৯৭৩), 'গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অবক্ষয়' ...এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তুলতে হবে। (দ্রষ্টব্য ১২.৪ অংশ)

৩। ...১২.৫ উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রখ্যাত লেখক সুজিৎ চৌধুরী। ...উত্তর-পূর্বের গদ্য শিল্পীদের মধ্যে সুজিত চৌধুরী তার গদ্য রীতির জন্য বিশেষ স্বতন্ত্রের দাবিদার ...গ্রামীণ ও শহুরে সমাজচিত্রের সাথে অতীত সমাজচিত্রের বিস্তর তফাৎ। আর এই তফাৎটা বুঝা যাবে 'হারানো দিন হারানো মানুষ' গ্রন্থটি পাঠ করলে। ...এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তুলতে হবে। (দ্রষ্টব্য ১২.৫ অংশ)

৪। প্রবন্ধ সাহিত্য ধারার এক জনপ্রিয় ব্যতিক্রমী প্রাবন্ধিক হলেন সুকুমারী ভট্টাচার্য। ...সুকুমারী ভট্টাচার্য উপস্থাপিত করেছেন ক্রমবর্ধমান শ্রেণি বৈষম্যের ইতিহাস। ...মহাভারতের গভীর আলোচনা করেছেন সুকুমারী ভট্টাচার্য। এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তুলতে হবে। (দ্রষ্টব্য ১২.৬ অংশ)



১২.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। শিবনারায়ণ রায়ের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩। সুকুমারী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৪। ভাষা ও সংস্কৃতি প্রশ্নে প্রান্তিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে সুজিৎ চৌধুরীর প্রবন্ধ সাহিত্যের পর্যালোচনা করুন।

৫। আসামে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে সুজিৎ চৌধুরীর অবদান কতখানি আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ১৩ : আধুনিক বাংলা নাটক-৩

বিন্যাস ক্রম

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১৩.২ পরিচিতি

১৩.৩ নাট্যকার বাদল সরকার

- ১৩.৩.১ জীবন ও নাট্যকর্ম
- ১৩.৩.২ উল্লেখযোগ্য নাটক
- ১৩.৩.৩ নাটকের বিষয়
- ১৩.৩.৪ নাট্যসাহিত্যে গুরুত্ব

১৩.৪ নাট্যকার উৎপল দত্ত

- ১৩.৪.১ জীবন ও নাট্যকর্ম
- ১৩.৪.২ উল্লেখযোগ্য নাটক
- ১৩.৪.৩ নাটকের বিষয়
- ১৩.৪.৪ নাট্যসাহিত্যে গুরুত্ব

১৩.৫ নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়

- ১৩.৫.১ জীবন ও নাট্যকর্ম
- ১৩.৫.২ উল্লেখযোগ্য নাটক
- ১৩.৫.৩ নাটকের বিষয়
- ১৩.৫.৪ নাট্যসাহিত্যে গুরুত্ব

১৩.৬ নাট্যকার মনোজ মিত্র

- ১৩.৬.১ জীবন ও নাট্যকর্ম
- ১৩.৬.২ উল্লেখযোগ্য নাটক
- ১৩.৬.৩ নাটকের বিষয়
- ১৩.৬.৪ নাট্যসাহিত্যে গুরুত্ব

১৩.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

১৩.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

১৩.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১৩.১০ অতিরিক্ত পঠন

১৩.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- বাংলা নাটকের আধুনিক গতিধারা বুঝতে পারবেন।
- নাট্যকার বাদল সরকার, উৎপল দত্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র প্রমুখ আধুনিক নাট্যকারদের নাট্য প্রচেষ্টা বিষয়ে বুঝতে পারবেন।
- আধুনিক বিভিন্ন নাট্যতত্ত্ব ও ন্যারেটলোজি বিষয়ে জানতে পারবেন।

১৩.২ পরিচিতি

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে উত্তর-আধুনিক নাট্য নির্মাণের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত বাংলা নাট্যসাহিত্যের এই ধারাটি যেমন বিশেষ বিশেষ নাট্য রীতির প্রচলনে সক্ষম হয়েছিলেন, সেইসঙ্গে পাশ্চাত্য নাট্য রীতির বিশেষ কিছু লক্ষণ সার্থক ভাবে তুলে ধরতে সফল হয়েছিলেন। আসলে এই সময়ের নাট্যকারেরা বাংলা নাট্যধারায় নতুনত্ব প্রচলনে উন্মুখ ছিলেন। এদের প্রত্যেকেরই নাট্য মস্তিষ্ক বেশ উর্বর ছিল। সেই উর্বরা শক্তিতেই এঁরা সকলেই বাংলা নাটকের ইতিহাসকে সমৃদ্ধশালী করেছিলেন।

১৩.৩ নাট্যকার বাদল সরকার

১৩.৩.১ জীবন ও নাট্যকর্ম

বাংলা নাট্য জগতের অন্যতম পথিকৃৎ বাদল সরকার ছিলেন এমন এক সৃষ্টিশীল নাট্যকার, যিনি বাংলা নাটকে নতুন রীতি ও ভাবনার সংযোজন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'বাকি ইতিহাস' প্রভৃতি নাটক শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর দিক থেকেই নয়, রচনাশৈলীতেও অভিনব। তাঁর নাট্যভাবনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল অ্যাবসার্ড নাটক, যার মাধ্যমে তিনি বাংলা নাটককে আন্তর্জাতিক নাট্য আন্দোলনের ধারার সঙ্গে যুক্ত করেন।

বাদল সরকারের জন্ম ১৯২৫ সালে, উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রিটে। তাঁর আসল নাম ছিল সুধীন্দ্র সরকার। পিতা মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক এবং পরবর্তীকালে ওই কলেজের অধ্যক্ষ। বাদল সরকারের শিক্ষাজীবন শুরু হয় ক্যালকাটা আকাদেমিতে, পরে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি ভর্তি হন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং ১৯৪৭ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরিতে যোগ দেন নাগপুরের এক প্রত্যন্ত এলাকায়।

কর্মজীবনে প্রবেশ করলেও নাটকের প্রতি তাঁর আগ্রহ ফিকে হয়নি। ১৯৫৩ সালে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি আবার নাট্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। মাইথনে কর্মরত অবস্থায় অবসর সময়ে নাটকের চর্চা শুরু করেন, যা ধীরে ধীরে তাঁর জীবনের মূল অভিমুখ হয়ে ওঠে। কলকাতায় ফিরে তিনি নাট্য প্রযোজনার কাজ শুরু করেন এবং একটি বিদেশি নাটকের ছায়ায়

তৈরি করেন তাঁর প্রথম মৌলিক নাটক 'সলিউশন এক্স'।

১৯৫৭ সালে তিনি ইংল্যান্ডে যান চাকরিসূত্রে এবং সেখানে লন্ডনের ফিল্ম সোসাইটির সংস্পর্শে এসে নাটকের প্রতি আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ১৯৫৯ সালে দেশে ফিরে তিনি সম্পূর্ণরূপে নাট্যকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর সেই নাট্যসাধনার ফসল হল একের পর এক মৌলিক ও অভিনব নাটক, যা বাংলা নাটকের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করে।

তাঁর উদ্যোগে গড়ে ওঠে নাট্যদল 'চক্র', যার জন্য তিনি নিজেই নাটক রচনা ও নির্দেশনা দিতেন। বাদল সরকারের নাটকে যেমন সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন দেখা যায়, তেমনি থাকে ভাবনা চিন্তার গভীরতা ও নাট্যরীতির নতুন রূপ।

১৩.৩.২ উল্লেখযোগ্য নাটক

আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা, হতাশাবোধ, বিচ্ছিন্নতাবোধ বাদল সরকারের নাটকের অন্যতম উপজীব্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল— 'সলিউশন এক্স' (১৯৫৬) (বিদেশি চলচ্চিত্র 'মাঙ্কি বিজনেস' অবলম্বনে), 'বড়ো পিসীমা' (১৯৫৮), 'শনিবার' (১৯৫৯), 'সমাবৃত্ত' (১৯৬১), 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৩), 'সারারাত্তির' (১৯৬৩), 'বল্লভপুরের রূপকথা' (১৯৬৩-৬৪), 'কবি কাহিনী' (১৯৬৩), 'বিচিত্রানুষ্ঠান' (১৯৬৪), 'বাকি ইতিহাস' (১৯৬৫), 'বাঘ' (১৯৬৫), 'পরে কোনোদিন' (১৯৬৬), 'যদি আর একবার' (১৯৬৬), 'প্রলাপ' (১৯৬৬), 'ত্রিংশ শতাব্দী' (১৯৬৭), 'পাগলা ঘোড়া' (১৯৬৮), 'বিবর' (১৯৬৮), 'সার্কাস' (১৯৬৮) (সমরেশ বসুর উপন্যাস অবলম্বনে), 'সাগিনা মাহাতো' (১৯৭০) (গৌরকিশোর ঘোষ-এর গল্প অবলম্বনে), 'আবু হোসেন' (১৯৭১) (গিরিশচন্দ্র ঘোষ-এর আবু হোসেন-এর নতুন নাট্যরূপ), 'স্পার্টাকুস' (১৯৭২) (হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর উপন্যাস অবলম্বনে), 'সুটকেস' (১৯৭২), 'বীজ' (১৯৭৩), 'মিছিল' (১৯৭৪), 'ভানুমতী কা খেল' (১৯৭৪), 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী' (১৯৭৪), 'ভোমা' (১৯৭৫) ইত্যাদি।

১৩.৩.৩ নাটকের বিষয়

'এবং ইন্দ্রজিৎ' বাদল সরকারের অন্যতম জনপ্রিয় নাটক, যা প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। নাটকটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের সমাজবাস্তবতা ও অস্তিত্বসংকটের প্রতিফলন। যুদ্ধের ভয়াবহতা, গণহত্যা, রাজনীতির ভণ্ডামি ও মানুষের একাকিত্ব এসবই সেই সময়কার সমাজজীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই সংকটময় বাস্তবতাই অ্যাবসার্ড নাটকের জন্ম দেয়, যেখানে জীবনের অর্থহীনতা, নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতাবোধ প্রধান হয়ে ওঠে।

বাদল সরকার এই নাটকে অ্যাবসার্ড নাট্যরীতি অনুসরণ করেছেন, যা প্রচলিত কাহিনি নির্ভর নাটকের ধারার থেকে একেবারে আলাদা। 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এ মূল চরিত্রগুলি হল অমল, বিমল, কমল, লেখক এবং ইন্দ্রজিৎ। চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে জীবনের নিঃসারতা, হতাশা, ক্লান্তি এবং মৃত্যু-কামনা প্রকাশ পেয়েছে। নাটকে কোনো সরল কাহিনি নেই, বরং প্রতিটি চরিত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এই নাটকে দেখা যায়, যুব সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও স্বপ্নহীনতা। কথোপকথনগুলি অনেক সময় অর্থহীন, পরস্পরের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, ঠিক যেমন অ্যাবসার্ড নাটকের নিয়ম। নাটকটি আমাদের দেখায়, কীভাবে ব্যক্তি মানুষ এক ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হতে হতে অবশেষে নিঃসঙ্গতায় ডুবে যায়।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' তাই শুধু একটি নাটক নয়, বরং এক সময়ের দলিল, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী যুগের অস্তিত্ব সংকট, হতাশা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের গভীর চিত্র তুলে ধরে। এটি বাংলা নাটকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেয় এবং বাদল সরকারকে অ্যাবসার্ড নাট্যধারার অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

বাকি ইতিহাস:

বাদল সরকারের এক উল্লেখযোগ্য নাটক 'বাকি ইতিহাস' ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং ৭ই মে নিউ আম্পিয়ার মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটির মধ্যে দুটি পৃথক কাহিনি রয়েছে, যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত সীতানাথের আত্মহত্যার ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত।

নাটকের দুই প্রধান চরিত্র বাসন্তী এবং শরদিন্দু, প্রত্যেকে আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যার ঘটনাটি ব্যাখ্যা করেন। বাসন্তী একজন নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যার কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করেন, যেখানে শরদিন্দু আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানে গিয়ে নিজের ভিতরের এক বিকৃত, আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষায় ভরা মানসিকতা প্রকাশ পায়।

'বাকি ইতিহাস' নাটকে আত্মহত্যা, শূন্যতা বোধ এবং অস্তিত্বের সংকটের গভীর চিত্রণ মর্মস্পর্শী ভাষায় ফুটে উঠেছে, যা দর্শককে অন্তর্দৃষ্টিমূলক ভাবনায় নিমগ্ন করে।

অন্যান্য নাটক:

বাদল সরকারের 'রাম শ্যাম যদু' (১৯৬২) নাটকটিতে নানা ধরনের সমাজবিরোধী চরিত্র যেমন জুয়াচোর, খুনি ইত্যাদি এক পরিবারের দুঃখময় জীবনের আবর্তে এসে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসে। দুঃখ-বেদনার মাঝেও পরিবারের বিশ্বাস, স্নেহ ও মমতার ফলে তারা পুনরায় নিজেরা মনুষ্যত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত হয়। নাটকটি মানবিকতার জয়গান।

'পাগলা ঘোড়া' (১৯৭১) নাটকটি সংকেত ধর্মী এবং বহুরূপী নাটক। এখানে 'পাগলা ঘোড়া' প্রতীকী অর্থে প্রদীপ্ত প্রেম, যৌবন ও জীবনের চাঞ্চল্যকে বোঝায়। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এই পাগলা ঘোড়ার বাস, কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়ণ করা সহজ নয়। নাটকে শশী, হিমাদ্রি, ছাতু ও কার্তিক চরিত্রের মাধ্যমে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও জীবনের ট্র্যাজেডি ফুটে উঠেছে। নাটকের শেষ অংশে একটি অনাত্মীয় তরুণীর মৃতদেহ সৎকারের সময় চার যুবকের নেশার ব্যর্থ জীবন গল্প বলার মাধ্যমে মানব জীবনের কাহিনি প্রকাশ পায়।

'বীজ' নাটকটি বাদল সরকারের অ্যাবসার্ড নাটকের একটি উৎকৃষ্ট রচনা। এতে যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতার সঙ্গে জীবন্ত যৌবন শক্তির সংঘাত উঠে এসেছে। নাটকের দৈত্যাকার জড় শক্তি মানুষের সুকোমল বৃত্তিগুলোকে দমন করতে চায়, কিন্তু মেয়েটির আবির্ভাব এবং তার বাণী

"বাঁচো" একটি বিপ্লবের আহ্বান। লক্ষ লক্ষ বীজের মতো সৃষ্টির স্পন্দন শেষ পর্যন্ত কৃত্রিম শক্তিকে পরাজিত করে।

বাদল সরকারের এই নাটকগুলোতে মানব জীবনের জটিলতা, সমাজের সংকট এবং আশা ও পুনর্জন্মের বার্তা পাওয়া যায়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। বাদল সরকারের নাট্যবিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন এবং তাঁর স্বাতন্ত্রের পরিচয় দিন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১৩.৩.৪ নাট্যসাহিত্যে গুরুত্ব

১। বাদল সরকার বাংলায় তৃতীয় ধারার নাট্যরীতির বিশিষ্ট প্রবক্তা।

২। বাদল সরকার বাংলা নাটকে অ্যাবসার্ড রীতির যথাযথ প্রয়োগ করেছেন তার নাটকে সমাজের বিচ্ছিন্নতা -অবক্ষয়— ক্লান্তি - মৃত্যু চেতনা - শূন্যতা বোধ ফুটে উঠেছে।

৩। বাদল সরকারের নাটকের সংলাপ অত্যন্ত আকর্ষণীয় কখনো সংলাপে কাব্যিক ভঙ্গিলক্ষ্য করা যায়।

৪। সমাজের অত্যাচারিত নিম্নবর্গের মানুষের কথা যেমন তিনি বলেছেন তেমনি বিশেষ করে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন সংকটকে খুব গুরুত্ব সহকারে দেখিয়েছেন।

১৩.৪ নাট্যকার উৎপল দত্ত

১৩.৪.১ জীবন ও নাট্যকর্ম

উৎপল দত্ত ছিলেন বাংলা নাট্যজগতের এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব-নট, নাট্যকার, নির্দেশক, সংগঠক-প্রতিটি ভূমিকাতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর জন্ম ১৯২৯ সালের ১৯শে মার্চ, তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বরিশালে। যদিও তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার শুরু শিলংয়ে, পরবর্তী শিক্ষা গ্রহণ করেন কলকাতার সেন্ট লরেন্স ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এবং ১৯৪৯ সালে ইংরেজি সাহিত্যে সাম্মানিক স্নাতক হন।

কলেজ জীবনেই তাঁর নাটকের প্রতি গভীর অনুরাগ তৈরি হয়। তিনি 'হ্যামলেট' নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে যেমন তিনি খ্যাতি অর্জন করেন, তেমনি নাট্যচর্চাতেও সমানভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'দি শেক্সপিরিয়ন' নাট্যদল। এরপর ১৯৫১ সালে তিনি যোগ দেন গণনাট্য সংঘে, যেখানে তাঁর নাট্যচর্চা আরও সামাজিক ও রাজনৈতিক মাত্রা পায়। কিছু সময় তিনি 'এটেল থিয়েটার' নামক গ্রুপেও কাজ করেন। নাট্য আন্দোলনের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা থেকেই ১৯৬৯ সালে তিনি গঠন করেন নিজের নাট্যদল 'পিপলস লিটল থিয়েটার'।

উৎপল দত্ত ছিলেন এক মার্কসীয় ভাবনাচিন্তায় বিশ্বাসী নাট্যব্যক্তিত্ব। তিনি আজীবন সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর নাটকের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন। তাঁর নাটকে বারবার উঠে এসেছে শ্রেণিসংগ্রাম, রাজনৈতিক চেতনা ও জনজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে উৎপল দত্তের নাম এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। তিনি ছিলেন একাধারে নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা, শিক্ষক ও সংগঠক। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও নিরলস কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বাংলা থিয়েটারকে এনে দিয়েছেন এক নতুন প্রাণ ও চেতনা।

১৩.৪.২ উল্লেখযোগ্য নাটক

উৎপল দত্তের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল 'ছায়ানট' (১৯৫৮), 'অঙ্গার' (১৯৫৯), 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৬১), 'রাতের অতিথি' (১৯৬৩), 'কল্লোল' (১৯৬৮), 'মানুষের অধিকারে' (১৯৬৮), 'বর্গী দেশে' (১৯৭০), 'সূর্যশিকার' (১৯৭১), 'লেনিন কোথায়' (১৯৭৬), 'বাজার পালা' (১৯৭৭), 'তিতুমীর' (১৯৭৮), 'অগ্নিশয্যা' (১৯৮৮), 'নীল সাদা লাল' (১৯৮১), 'একলা চলো রে' (১৯৮৯), 'টিনের তলোয়ার' (১৯৭৩), 'ব্যারিকেড' (১৯৭৭), 'রাইফেল' (১৯৬৮), 'দুঃস্বপ্নের নগরী' (১৯৭৫), 'মহাবিদ্রোহ', 'টোটা' (১৯৭৩), 'দাঁড়াও পথিকবর' (১৯৮০), 'বেইমানী', 'চাঁদির কৌটো', 'ঘুম নেই', 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'মে দিবস', 'দ্বীপ', 'ইতিহাসের কাঠগড়ায়', 'কংসের কারাগারে', 'মৃত্যুর অতীত', 'সভ্যনামিক', 'ঠিকানা', 'সন্ন্যাসীর তরবারি', 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', 'লাল দুর্গ' (১৯৯০), 'জনতার আফিম' (১৯৯১), 'ক্রুশবিদ্ধ কিউবা' (১৯৯২), 'ফুলবাবু' (১৯৯৩), 'নীলরক্ত' ইত্যাদি।

১৩.৪.৩ নাটকের বিষয়

উৎপল দত্ত বাংলা নাট্যজগতের এক অগ্রণী নাট্যকার, যিনি তাঁর নাটকে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম, সামাজিক অন্যায় ও রাজনৈতিক চিত্রকে প্রাণবন্ত করেছেন।

'অঙ্গার' নাটকটি মিনার্ভা মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয় ১৯৬৯ সালে। নাটকটির মূল উপজীব্য শ্রমিকদের সংগ্রাম ও অসহায়তা। আসানসোলের শেলডন কোলিয়ারির শ্রমিকদের জীবন, মালিকপক্ষের নির্মম অত্যাচার, শোষণ এবং এই শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। এটি শ্রমজীবীর যন্ত্রণাময় জীবন ও সংগ্রামের একটি বাস্তব চিত্র।

পূর্ব বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব ও বিদ্রোহের ওপর ভিত্তি করে রচিত 'ফেরারি ফৌজ' নাটকে শাসক শ্রেণীর অধীন কমিউনিস্টদের শাসন ও অত্যাচারের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। এটি বিদ্রোহ ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে কাজ করেছে।

'টিনের তলোয়ার' নাটকটি রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ উপলক্ষে ১৯৭৩ সালে অভিনীত হয়। ব্রিটিশ শাসনের নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে নাট্যকার এই নাটককে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। নাটকে ইংরেজ শাসনের অমানবিকতা এবং সমকালের নাট্যশালার অন্তঃপুরের নানা বিষয় উঠে এসেছে। নাটকটি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নাটকের গুরুত্বকে প্রমাণ করে।

উৎপল দত্তের অন্যান্য নাটকে সমাজের নানা অরাজকতা, কমিউনিস্টদের প্রতি শাসনের কঠোরতা, আদিবাসীদের জীবন সংগ্রামের চিত্র ইত্যাদি গভীর ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। তাঁর নাটকগুলো শুধু বিনোদনের জন্য নয়, বরং সামাজিক পরিবর্তন ও ন্যায়ের লড়াইয়ে উৎসাহ প্রদান করে।

১৩.৪.৪ নাট্যসাহিত্যে গুরুত্ব

১। উৎপল দত্তের নাটকে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

২। সমাজের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সমাজকে পরিবর্তন করবার হাতিয়ার হিসেবে উৎপল দত্ত নাটককে ব্যবহার করেছেন।

৩। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নানান প্রচেষ্টাকে তিনি প্রতিবাদী ভাষায় বিভিন্ন নাটকের মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। উৎপল দত্তের নাটকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১৩.৫ নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়

১৩.৫.১ জীবন ও নাট্যকর্ম

মোহিত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বাংলা নাটকের এক স্বতন্ত্র স্বর-নাট্যকার ও চিত্রনাট্যকার হিসেবে তিনি নাট্যজগতে নিজস্ব পরিচয় গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর জন্ম বাংলাদেশের বরিশাল শহরে। যদিও জীবনের প্রারম্ভেই তিনি পরিবারসহ বরিশাল ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং কলকাতার বিডন স্ট্রিট এলাকায় বসবাস শুরু করেন।

শৈশবেই নাটকের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মায়। তাঁর বাসস্থানের কাছাকাছি অবস্থিত চৈতন্য গ্রন্থাগারে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন এবং সেখানে বসে দেশি-বিদেশি বহু নাটক পড়তেন। এরই মাধ্যমে তাঁর নাট্যভাবনার বীজ রোপিত হয়।

১৯৫০ সালে মেট্রিক পাশ করে তিনি ভর্তি হন কলকাতার সিটি কলেজে। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্মজীবনের সূচনা করেন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর কলেজে অধ্যাপক হিসেবে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যজীবন ছিল বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময়। তিনি প্রায় শতাধিক নাটক রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় অ্যাবসার্ড নাটকের প্রভাব যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনই অনেক নাট্যসমালোচক তাঁর রচনাকে কিমিতিবাদী (surrealist বা প্রতীকী) নাটক হিসেবেও ব্যাখ্যা

করেছেন।

তিনি শুধু পূর্ণদৈর্ঘ্য নাটকেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না-একাঙ্ক নাটক, কাব্যনাটক ও ক্ষুদ্র নাটক রচনায়ও সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। নাট্যচর্চার পরিধি আরও বিস্তৃত করতে তিনি অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় নাটক অনুবাদও করেছেন, যা বাংলা নাটককে বৈশ্বিক সাহিত্য প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেইসব নাট্যস্রষ্টাদের একজন, যাঁরা নাটককে শুধু বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দেখেননি- বরং সমাজ, দর্শন, মানুষের গভীর মনস্তত্ত্বকে মঞ্চে তুলে ধরার এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

১৩.৫.২ উল্লেখযোগ্য নাটক

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকগুলোকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। সেগুলি হল—

১। প্রথম পর্বের অ্যাবসার্ড নাটক: 'কণ্ঠনালীতে সূর্য (১৯৬৩), 'নীলরঙের ঘোড়া' (১৯৬৪), 'মৃত্যুসংবাদ' (১৯৬৫), 'গন্ধরাজের হাততালি' (১৯৬৫), 'মেটামরফসিস' (১৯৬৫), 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকান্ড' (১৯৬৬), 'দ্বীপের রাজা' (১৯৬৭), 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' (১৯৬৭), 'নিষাধ' (১৯৬৮), 'পুষ্পক রথ' (১৯৬৮), 'উইল শেকস্পীয়র (১৯৬৯), 'বাঘবন্দি' (১৯৬৯), 'ক্যাপ্টেন হুররা' (১৯৭১), 'রাজরক্ত' (১৯৭০) ইত্যাদি।

২। দ্বিতীয় পর্বের নাটক: 'মৃচ্ছকটিক (১৯৭৫), 'মহাকালীর বাচ্চা' (১৯৭৭), 'স্বদেশি নকশা' (১৯৭৯), 'গ্যালিলেওর জীবন' (১৯৮০), 'কানামাছি খেলা' (১৯৮৩), 'ভূত' (১৯৮৩), 'আলিবাবা' (১৯৮৫), 'তোতারাম' (১৯৯০), 'সোক্রাতেস' (১৯৮৯), 'নোনাজল' (১৯৯১), 'বসন' (১৯৯১), 'সুন্দর' (১৯৯১), 'শমীবৃক্ষ' (১৯৯২), 'তখন বিকেল' (১৯৯২), 'গুহাচিত্র' (১৯৯৩), 'গজানন চরিত্র মানস' (১৯৯৪), 'মুষ্টিযোগ' (১৯৯৪), 'জন্মদিন' (১৯৯৭), 'অকটোপাশ লিমিটেড' (১৯৯৭), 'কাল বা পরশু' (১৯৯৭), 'বিপন্ন বিস্ময়' (১৯৯৮), 'সিদ্ধিদাতা' (১৯৯৯), 'হারুন রশিদ' (১৯৯৯), 'তুষাগ্নি' (২০০০১, 'জাম্বো' (২০০১), 'মিস্টার রাইট' (২০০৩), মিসেস সেরিয়ানো' (২০০৩), 'ঘুম' (২০০৩) ইত্যাদি।

৩। ছোটোদের নাটক: 'রিল' (১৯৬৫), 'বাইরের দরজা' (১৯৬৫), 'বৃত্ত' (১৯৬৮), 'বাজপাখি' (১৯৬৯), 'সোনার চাবি' (১৯৭৩), 'লাঠি' (১৯৭৭), 'মাছি' (১৯৭৮), 'ফিনিক্স' (১৯৮৪), 'রাক্ষস', 'জুতো' (২০০৩), 'দর্পণ', 'টাটু' ইত্যাদি।

৪। কাব্যনাট্য: 'ঋগ্বেদিক' (১৯৮৬)।

১৩.৫.৩ নাটকের বিষয়

বাংলা নাট্যজগতের এক বিশিষ্ট নাম মোহিত চট্টোপাধ্যায়, যিনি শুধু নাট্যকার নন, বরং সমাজের প্রতিচ্ছবি ও প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর। তাঁর নাটকে প্রতীক, রূপক, উদ্ভটতা, এবং

সাংকেতিকতার মাধ্যমে সমাজ, রাজনীতি, শোষণ, এবং মানবজীবনের দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে। তিনি নাটককে করে তুলেছেন জীবন ও সময়ের প্রতিবিম্ব।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বহুল আলোচিত ও জনপ্রিয় নাটক 'ক্যাপ্টেন হুররা' এক সাংকেতিক নাটক, যেখানে ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে একটি হোটেলকে কেন্দ্র করে, যা নাটকে রূপ পেয়েছে জাহাজের। এই জাহাজের ক্যাপ্টেন হোল্ডার-যার নামে নাটকের নামকরণ। নাটকের চরিত্রগুলি— সুনীল, ইরা, যুবক ও ফান্টুশ-অস্বাভাবিক ও উদ্ভট প্রকৃতির হলেও তারা একত্রিত হয়ে অচল জাহাজকে সচল করে নতুন পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। এই নাটকে দলবদ্ধ শক্তির জাগরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে।

নতুন নাট্যের (নব নাট্য) বৈশিষ্ট্য বহনকারী আরেকটি শক্তিশালী নাটক 'রাজরক্ত'। এখানে এক রক্তপিপাসু রাজার প্রতীকে শোষক শ্রেণিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজা সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণ করছে, আর সেই শোষণের বিরুদ্ধে মানুষ একত্রিত হচ্ছে। নাটকের মূল বার্তা- "সংঘবদ্ধ শক্তি ছাড়া মুক্তি নেই"। নাটকটি গণমুক্তির জয়গান হিসেবে বিবেচিত।

দ্বীপের রাজা নাটকে যন্ত্রসভ্যতা বনাম প্রাণীজীবনের সংঘাতকে প্রতীকী ও রহস্যময় ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানেও শেষপর্যন্ত সংঘবদ্ধ শক্তির জয়-ই নাটকের কেন্দ্রীয় বার্তা। সাংকেতিক নাট্যরীতির এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ এটি।

'আমার ছোট কথা' সংকলনের অন্তর্গত একটি একাঙ্ক নাটক 'বাইরের দরজা', যেখানে জীবনের দর্শন তুলে ধরা হয়েছে। অতীত ও ভবিষ্যতের দ্বন্দ্বে মানুষের মানসিক টানাপোড়েন এবং পথচলার দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে এখানে সংবেদনশীলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দর্পণ নাটকে মধ্যবিত্ত জীবনের চিরস্থায়ী সংকট ও অসহায়ত্বকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। সমাজের চাপে, ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সংকটে জর্জরিত মানুষদের ভেতরের টানাপোড়েন এখানে কেন্দ্রীয় বিষয়।

প্রতিদিনকার জীবনে ঘটে যাওয়া অজস্র ভুল, আত্মপ্রবঞ্চনা ও দায় এড়ানোর মনোভাব নিয়ে লেখা হয়েছে 'বর্ণপরিচয়' নাটকটি। এটি এক অর্থে মানুষের জীবনের প্রতিফলন এবং আত্মসমালোচনার দলিল। তবে নাটকের শেষে নাট্যকার মুক্ত জীবনের সম্ভাবনার বার্তা দিয়েছেন- একটি আশাবাদী পরিণতির মাধ্যমে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক শুধু রূপকথা নয়, বরং বাস্তবের কঠিন মুখোমুখি দাঁড়ানো এক শিল্পভাষা। তাঁর নাট্যভাবনায় সাংকেতিকতা, প্রতীক, উদ্ভটতা, এবং সংঘবদ্ধতার বার্তা ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার। মানুষের অস্তিত্বসংকট, শোষণ-বঞ্চনা, জীবনের দর্শন এবং সমাজচিত্র তাঁর নাটকে উঠে এসেছে গভীর ও ভাবনাপ্রবণ ভঙ্গিতে। বাংলা নাটকের ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

১৩.৫.৬ নাট্যসাহিত্যে গুরুত্ব

১। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে সমকালীন জীবন অনুভূতি যুব সংগঠনের চিত্র ব্যবস্থাপন করেছেন।

২। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখালেখিতে তার কবিসত্তার পরিচয় রয়েছে, ফলত তাঁর নাটকগুলি খুব সহজেই পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে।

৩। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা নাটকে অ্যাবসার্ড যথা কিমিতিবাদ'কে অনন্য মাত্রা প্রদান করেছেন।

১৩.৬ নাট্যকার মনোজ মিত্র

১৩.৬.২ জীবন ও নাট্যকর্ম

মনোজ মিত্র বাংলা নাট্যজগতের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর, তৎকালীন পূর্ববাংলার সাতক্ষীরা জেলায়। শৈশব ও কৈশোর কাটানোর পর তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করেন।

শিক্ষাজীবনের পর তিনি যুক্ত হন নাট্যচর্চার সঙ্গে। নাট্যকলার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও দক্ষতা তাঁকে নাট্যশিক্ষায়ও বিশিষ্ট স্থান এনে দেয়। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নাট্যরচনা ও অভিনয়-এই দুই ক্ষেত্রেই তিনি সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর নাটক যেমন প্রগাঢ় জীবনবোধ ও সমাজসচেতনতা প্রকাশ করে, তেমনি অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এক বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী শিল্পী। তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভার জন্য তিনি পেয়েছেন একাধিক সম্মানজনক পুরস্কার, যেমন—

- সংগীত নাটক একাডেমি পুরস্কার
- দীনবন্ধু পুরস্কার
- আনন্দ পুরস্কার

এছাড়াও আরও নানা পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন।

১৩.৬.৩ উল্লেখযোগ্য নাটক

নাটকগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে- পূর্ণাঙ্গ নাটক: 'চাকভাঙা মধু' (১৯৭২), 'নেকড়ে' (১৯৭৩), 'শিবের অসাধ্যি' (১৯৭৪), 'পরবাস' (১৯৭৫), 'কেনারাম বেচারাম' (১৯৭৭), 'নরক গুলজার' (১৯৭৭), 'সাজানো বাগান' (১৯৭৮), 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৮০), 'রাজদর্শন' (১৯৮২), 'নৈশভোজ' (১৯৮৬), 'অশ্বত্থামা' (১৯৮৬), 'কিনু কাহারের থিয়েটার' (১৯৮৮), 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' (১৯৯০), 'দম্পতি' (১৯৯০), 'পুঁটি রামায়ণ' (১৯৯০), 'শোভাযাত্রা' (১৯৯১), 'দর্পণে শরৎশশী' (১৯৯৩), 'গল্প হেকিম সাহেব' (১৯৯৪), 'আত্মগোপন' (১৯৯৪), 'দেবী সর্পমস্তা' (১৯৯৫), 'ছায়ার প্রাসাদ' (১৯৯৭), 'পালিয়ে বেড়ায়' (১৯৯৯), 'নাকছবিটা' (২০০০), 'মুন্নি ও সাতচৌকিদার' (২০০১), 'কুহুযামিনী' (২০০২), 'অপারেশন ভোমরাগঞ্জ' (২০০৩), 'রঙের হাট' (২০০৪), 'যা নেই ভারতে' (২০০৫), 'ব্রিজের

ওপর বাপি' (২০০৬) ইত্যাদি।

একাঙ্ক নাটক: 'মৃত্যুর চোখে জল' (১৯৫৮), 'পাখি' (১৯৬০), 'তক্ষক' (১৯৬৭), 'কালবিহঙ্গ' (১৯৬৮), 'টাপুর টুপুর' (১৯৭২), 'আমি বদন বলছি' (১৯৭৪), 'চোখে আঙুল দাদা' (১৯৭৬), 'সন্ধ্যাতারা' (১৯৭৯), 'বাবুদের ডালকুকুরে' (১৯৮১), 'তেঁতুল গাছ' (১৯৮১), 'সত্যিভূতের গল্প' (১৯৮১), 'কাকচরিত্র' (১৯৮২) , 'মঞ্চে চিত্রে' (১৯৮৫), 'পাকে বিপাকে' (১৯৮৫), 'ঘড়ি আংটি ইত্যাদি' (১৯৮৬), 'মহাবিদ্যা' (১৯৮৬), 'মদনের পঞ্চপণ্ড' (১৯৮৬), 'প্রভাত ফিরে এসো' (১৯৮৮), 'আঁখি পল্লব' (১৯৯০), 'টু-ইন-ওয়ান' (১৯৯২), 'রূপের আড়ালে' (১৯৯২), 'নিউ রয়্যাইল কিসসা' (১৯৯২), 'দন্তরঙ্গ' (১৯৯২), 'স্মৃতি সুধা' (১৯৯৩), 'বৃষ্টির ছায়াছবি' (১৯৯৩), 'আকাশ চুম্বন' (১৯৯৪), 'বনজোছনা' (২০০৬) ইত্যাদি।

ছোটোদের নাটক: 'চমচম কুমার' (১৯৮৫), 'জয় বাবা হনুনাথ' (২০০৪)। মানুষের লোভ হিংসা হাসি কান্না নিয়েই মনোজের নাটক।

১৩.৬.৪ নাটকের বিষয়

বাংলা নাট্যজগতে মনোজ মিত্র এক ব্যতিক্রমী ও গভীরমনা নাট্যকার, যিনি সমাজের বাস্তবতা, শোষণ-বঞ্চনার চিত্র এবং মানবিক অনুভূতির সূক্ষ্ম প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর নাট্যকর্মে। তাঁর রচিত নাটকগুলি কেবল বিনোদন নয়, সমাজের বাস্তব, শোষিত মানুষের জীবন, প্রকৃতি ও সংস্কারকে নাট্যমাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছে।

মনোজ মিত্রের বহুল প্রশংসিত একটি নাটক হল 'চাক ভাঙ্গা মধু', যার পটভূমি সুন্দরবন অঞ্চলের এক ওঝা পরিবার। নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে সমাজের প্রান্তে থাকা মানুষদের করুণ বাস্তবতা ঘিরে। শাহাজানের অত্যাচারে জর্জরিত ওঝা পরিবার তাদের সর্বস্ব হারিয়েছে। তাদের জীবন যেমন আদিম প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, তেমনি তাতে রয়েছে একধরনের নিষ্কলুষতা ও সরলতা।

নাটকের মূল চরিত্র বাদামি, যার সহজ-সরল মানসিকতা ও মানবিকতা নাটককে প্রাণবন্ত করে তোলে। সুদখোর অঘোর ঘোষকে সাপের কামড় থেকে রক্ষা করলেও, বাদামির এই মহানুভবতার কোনও মূল্য দেয়নি অঘোর, এবং তার ফলে সে নিজের কর্মফল ভোগ করে। নাটকটি শুধু সামাজিক শোষণের করুণ ছবি নয়, পাশাপাশি সুন্দরবনের লোকজীবন, সংস্কার ও লোকবিশ্বাসেরও চমৎকার চিত্র তুলে ধরে।

আরেকটি বিখ্যাত নাটক 'সাজানো বাগান'। এই নাটকে গ্রামীণ জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে আনা হয়েছে কৃষক ও জমিদার শ্রেণির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বাঞ্ছারাম, একজন হতদরিদ্র কৃষক, যিনি নিজের বাগানের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমতা পোষণ করেন। গ্রামীণ জমিদার তার বাগানটি হাতিয়ে নিতে নানা প্রলোভন ও কৌশল প্রয়োগ করলেও শেষ পর্যন্ত বাঞ্ছারামের দৃঢ়তা ও আবেগের কাছে জমিদার পরাজিত হয়।

নাটকটি একদিকে যেমন কৃষক সমাজের জমির প্রতি গভীর আত্মিক সম্পর্ক তুলে ধরে, অন্যদিকে জমিদারদের লোভ ও শোষণমূলক মানসিকতাকেও দৃশ্যমান করে তোলে।

মনোজ মিত্রের নাট্যভাবনার ভিন্ন এক দৃষ্টান্ত 'নরক গুলজার'। এই নাটকে স্বর্গ-নরকের নানা কল্পচিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি পৃথিবীর দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ মানিক ও ফুল্লরার জীবনের নিদারুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এটি একদিকে কাল্পনিক, অন্যদিকে সামাজিক বাস্তবতার নিখুঁত মেলবন্ধন। এই নাটকে রয়েছে করুণ রসের গভীর প্রভাব। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীতিশ ও শ্যামা, যাদের সুপরিকল্পিত জীবনের স্বপ্ন এক মুহূর্তে ভেঙে পড়ে। নাটকটি ব্যক্তিগত জীবনের চরম বাস্তবতা, স্বপ্নভঙ্গ ও জীবনের অনিশ্চয়তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে ফুটিয়ে তোলে।

মনোজ মিত্র পৌরাণিক কাহিনির আধুনিক রূপান্তরেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং পৌরাণিক চরিত্রকে আধুনিক চিন্তাধারায় রূপ দিয়ে লিখেছেন 'অশ্বত্থামা', 'তক্ষক', 'শিবের অসাধ্য' প্রভৃতি নাটক। এই নাটকগুলিতে পৌরাণিক রূপকের আড়ালে contemporary সমাজচিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

মনোজ মিত্রের নাটকগুলোতে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, গ্রামীণ জীবন, দারিদ্র্য, শোষণ-বঞ্চনা এবং মানবিক সম্পর্কের জটিলতা প্রতিফলিত হয়েছে গভীর মমত্ববোধ ও নাট্য দক্ষতার সঙ্গে। তিনি বাংলা নাটককে শুধু শহুরে থিয়েটার থেকে বের করে এনে গ্রামীণ বাস্তবতা ও প্রান্তিক মানুষের আবেগে যুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর নাট্যকর্ম বাংলা সাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন।

১৩.৬.৫ নাট্যসাহিত্যে গুরুত্ব

১। মনোজ মিত্র বাংলা নাটকের শেষে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অন্তরালে সমাজের বাস্তব চিত্রকে সুকৌশলে ব্যক্ত করেছেন।

২। শুধু নাটক লেখা নয়, মনোজ মিত্র বেশ কিছু নাট্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেমন- সুন্দরম, গন্ধর্ব, বাতায়ন ইত্যাদি।

৩। মনোজ মিত্র ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনের এক যশস্বী শিল্পী। 'সাজানো বাগান' এর বাঞ্ছারাম চরিত্রে অভিনয় করে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন।

৪। সর্বোপরি, একাধারে নাট্য রচনা এবং অভিনয় দুই দিকেই তিনি ছিলেন এক দক্ষ শিল্পী।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। মনোজ মিত্রের নাটকে সাধারণ গ্রাম্য মানব জীবনের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১৩.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

আধুনিক যুগের বাংলা নাট্যরীতির ইতিহাসে বিবিধ নাট্যকারেরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এবং নাট্যকারদের সৃষ্টিতে তাঁর সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই ধারাতেই বাদল সরকার, উৎপল দত্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্রের মতো নাট্যকারেরা তাঁদের নাটকে

নানান বৈচিত্র্যময় বিষয়ে স্থান দিয়েছেন। বিশেষ করে আধুনিক জীবন চেতনা, রাজনৈতিক চালচিত্র, গ্রামীন সমাজ জীবন ইত্যাদি।



১৩.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

১। বাদল সরকারের ব্যতিক্রমী নাট্যধারা বিশেষ করে বাংলা নাট্যসাহিত্যে অ্যাবসার্ড নাট্যশৈলী সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

২। উৎপল দত্তের নাটকের আলোচনায় পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ছবি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়েছি।

৩। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে কিমিতিবাদী নাট্যধারা সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

৪। মনোজ মিত্রের নাটকে সাধারণ গ্রাম্য সমাজের ছবি ফুটে দেখতে পাই।



১৩.৯ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। বাদল সরকারের অন্যতম জনপ্রিয় নাটক এবং ইন্দ্রজিৎ প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। ...নাটকের দুটি মূল চরিত্র বাসন্তী এবং শরদিন্দু খবরের কাগজে আত্মহত্যার কাহিনি অবলম্বনে দুটি নাটক রচনা করেছে খবরের কাগজে প্রকাশিত সীতা নাথের আত্মহত্যার কাহিনী অবলম্বনে শরদিন্দর বাসন্তী যে যার মতন দুটি গল্প তৈরি করে। ...নাটকটির নামকরণ সংকেত ধর্মী। ...এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১৩.৩.৩ অংশ)

২। পূর্ব বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব ও বিদ্রোহের কাহিনি কে অবলম্বন করে লিখেছেন ফেরারি ফৌজ ১৯৬১ নাটকটি ...নাট্য নিয়ন্ত্রন বিলের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে উৎপল দত্ত বেছে নিয়েছিলেন 'টিনের তলোয়ার' নাটকটিকে। ...এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১৩.৪.৩ অংশ)

৩। মনোজ মিত্রের একটি বহুজন সমাদৃত অন্যতম নাটক চাঁদ ভাঙ্গা মধু। ...আরেকটি অন্যতম জনপ্রিয় নাটক সাজানো বাগান কৃষক জীবনকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে। ...এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১৩.৬ অংশ)



১৩.১০ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-০৯
- ঘোষ, অজিতকুমার (১৩৬২ বাংলা); বাংলা নাটকের ইতিহাস; কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টারস অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড।

- চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল; (১৪১৮ বঙ্গাব্দ) সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ; কলকাতা : রত্নাবলী
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (২০১৭) কলকাতা : প্রজ্ঞাবিকাশ
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা, কলকাতা : তুলসী প্রকাশন
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (২০১৬-২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড



১৩.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। নাট্যসাহিত্যে বাদল সরকারের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

২। উৎপল দত্তের নাট্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। মনোজ মিত্রের নাট্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ১৪ : আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য-৩

বিন্যাস ক্রম

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১৪.২ পরিচিতি
১৪.৩ সুবোধ ঘোষ
১৪.৪ মহাশ্বেতা দেবী
১৪.৫ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
১৪.৬ সমরেশ বসু
১৪.৭ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪.৮ নবারুণ ভট্টাচার্য
১৪.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ
১৪.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১৪.১১ অতিরিক্ত পঠন
১৪.১২ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১৪.১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে জানতে পারবেন।
- বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে এই নির্বাচিত কথাসাহিত্যিকদের স্থান বিষয়ে সচেতন হবেন।
- নির্বাচিত এই সকল কথাসাহিত্যিকদের সাহিত্যকৃতি বিষয়ে জানতে পারবেন।

১৪.২ পরিচিতি

কল্লোলোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের রদবদল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আজ একটি অতিপরিচিত ঘটনা। এই রদবদলের যদিও বেশ কিছু সামজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বর্তমান। বিশেষত মধ্যবিত্ত সমাজের সামাজিক মসনদ অধিকার আরও তারই মনোভাবগত বহু রঙিন বৈচিত্র্য বাংলা কথাসাহিত্যের এই রদবদলের বিশেষ কারিগরি শক্তি। সেইসঙ্গে জটিল-গভীর জীবন জিজ্ঞাসা ও যাপনের রদ বদল বাংলা কথাসাহিত্যেরও রদবদলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আলোচ্য অধ্যায়ে গৃহীত কথাসাহিত্যিকেরা মূলত এক-একটি রদবদলের দ্রষ্টা পুরুষ, প্রকাশকও বটে।

১৪.৩ কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ ও তাঁর সাহিত্যকৃতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা পরবর্তী সময়ের দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, দেশবিভাগ,সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, মধ্যবিত্ত জীবনের চালচিত্র নির্মাণে সুবোধ ঘোষ হলেন একজন ব্যতিক্রমী স্রষ্টা। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটে 'অযান্ত্রিক' গল্পের মাধ্যমে। গ্রাম্য জীবন এবং শহুরে জীবনের দ্বন্দ্বময় ছবি, শিক্ষিত বেকারদের জীবনচিত্র, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার রূপ, ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ প্রভৃতি তাঁর কথাসাহিত্যের আখ্যানভাগকে নির্মাণ করেছে। যেহেতু জীবনের এক বিরাট সময় তিনি কলকাতা শহরের এক সরু গলিতে কাটিয়েছেন তাই তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে কলকাতার বাস্তব ও নির্মম চিত্র।

১৪.৩.১ ব্যক্তি পরিচিতি :

সুবোধ ঘোষের ১৯০৯ সালের ৪ই সেপ্টেম্বর বিহারের হাজারীবাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর আদি নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমার বহর গ্রামে। বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর শৈশব ও যৌবনের বেশির ভাগ সময় হাজারীবাগেই অতিবাহিত হয়েছে। পিতা সতীশচন্দ্র ঘোষ আর মাতা অনুকূলতা দেবী। দারিদ্র্যের কারণে পড়াশোনায় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি তিনি, তাই জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে নানা ধরনের কাজ করতে হয়েছে তাকে এবং এইসকল কাজই তাঁর পরবর্তী লেখার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। গল্প-উপন্যাস দুটি ধারাতেই তিনি তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের স্বাক্ষর রেখেছেন।

১৪.৩.২ সাহিত্যিক পরিচয় :

কল্লোলোত্তর কথাসাহিত্যের মধ্যে একজন অন্যতম শিল্পী হলেন সুবোধ ঘোষ। তিনি গল্পকার হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও উপন্যাস রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখেন। 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে মোট ১৫৭ টি গল্প এবং ৩০ টিরও বেশি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হল- 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪), 'শতকিয়া' (১৯৪৬), 'গঙ্গোত্রী' (১৯৪৭), 'একটি নমস্কারে' (১৯৪৭), 'সীমান্ত সরণি' (১৯৫৭), 'ত্রিযামা' (১৯৫৭), 'সুজাতা' (১৯৫৭), 'পুনর্নবা' (১৯৫৭), 'শ্রেয়সী' (১৯৫৭), 'বহুত মিনতি' (১৯৫৭), 'শুন বরনারী' (১৯৫৭), 'রূপসাগর' (১৯৫৭), 'শতকিয়া' (১৯৫৮), 'বর্ণালী' (১৯৫৯) 'মুক্তিপ্রিয়া' (১৯৬০), 'বসন্ত তিলক' (১৯৬৩), 'বন্ধু গোলাপ' (১৯৬৯), 'বাসবদত্তা' (১৯৭০), 'এসো পথিক' (১৯৭২), 'কালকেতু' (১৯৭৩), প্রভৃতি।

তাঁর ছোটগল্পের সংকলনগুলি হল : 'ফসিল' (১৯৪০), 'পরশুরামের কুঠার' (১৯৪০), 'শুক্লাভিসার' (১৯৪৪), 'গ্রাম যমুনা' (১৯৪৪), 'জতুগৃহ' (১৯৫০), 'মনভ্রমরা' (১৯৫৪), 'থিরবিজুরি' (১৯৫৫), 'কুসুমেষু' (১৯৫৬), 'ভোরের মালতি' (১৯৫৭), 'পলাশের নেশা' (১৯৫৭), 'মনোবাসিতা' (১৯৫৭), 'গল্পলোক' (১৯৫৭), 'চিত্তচকোর' (১৯৬০), 'অর্কিড'

(১৯৬২), 'রূপনগর' (১৯৬৩) 'ক্যাকটাস' (১৯৬৫) প্রভৃতি।

সুবোধ ঘোষ তাঁর ছোটগল্পের বিষয় বৈচিত্র্যের মত উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন ১৯৪০ সাল ও তার পরবর্তী সময়ের দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র যা শুধু গ্রামবাংলাকেই নয়, কলকাতা শহরও তার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি। এই দুর্ভিক্ষের ফলে আশ্রয়চ্যুত, সর্বস্ব খোয়ানো নিরন্নদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অসংগতি এবং হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু মিছিলের যন্ত্রণাময় চিত্র এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। ধনী ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে থাকা বিস্তর পার্থক্য উঠে এসেছে 'সুজাতা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে, যেখানে আমরা দেখি রমার জন্মদিন উপলক্ষে উপেনের বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের বন্দোবস্ত চলছে আর অন্যদিকে বুধন ও তার স্ত্রীর কলেরায় মৃত্যুর পর তার দেড় বছরের কন্যার অসহায় পরিণতি; অর্থাৎ ধনী শ্রেণির বিলাসবহুল জীবনযাপন ও তাদের আনন্দ উৎসবে বিপুল পরিমাণে অর্থব্যয় ও অপরদিকে আর্থিক অভাবে শ্রমিক শ্রেণির নির্মম পরিণতি আমাদের বুঝিয়ে দেয় দুটি পৃথক অর্থনৈতিক স্তরে অবস্থিত মানুষদের মধ্যে থাকা চরম পার্থক্যের কথা, যা এই উপন্যাসটিকে আলাদা মাত্রা প্রদান করে।

সুবোধ ঘোষের আরেকটি অন্যতম উপন্যাস হল 'শতকিয়া'। এই উপন্যাসটিতে আদিবাসী জনজাতির জীবনদর্শন, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার-বিশ্বাস, সর্বোপরি তাদের জীবনবোধের এক আলেখ্য প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাসাহিত্যে সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প পাঠক সমাজে এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি নিজেই বলেছে— "লেখক হবার আগে জীবনের আলো-ছায়া ও অন্ধকারের অনেক রূপ ও অনেক ঘটনা দেখবার অভিজ্ঞতা আমারও ছিল।" যার ফলে তাঁর ছোটগল্পে বৈচিত্র্যের শেষ নেই। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের সবরকম ঐতিহ্যই কোনো না কোনো ভাবে তাঁর বিষয়বস্তুর রূপরীতিতে উঠে এসেছে। তবে তাঁর গল্পের অনেক ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত একটা মুখোশ খুলে দেবার ভঙ্গি থেকে গেছে যা মানিক বন্দোপাধ্যায়ের গল্পের মধ্যেও পাই।



জেনে রাখা ভালো

সুবোধ ঘোষের গল্প লেখার সূত্রপাত হঠাৎ। একটি ঘরোয়া সাহিত্যবাসরে বন্ধুরা স্বরচিত গল্প পড়ার অনুরোধ জানান। এই উপলক্ষ্যেই তাঁর জীবনের প্রথম গল্প লেখা হয়। 'অযান্ত্রিক' একজন ট্যাক্সিচালক ও তার বাতিল হয়ে যাওয়া ট্যাক্সির প্রতি ভালোবাসার গল্প। স্বনামধন্য চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটক এই গল্পটিকে অবলম্বন করে কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

সুবোধ ঘোষ লিখিত 'ফসিল' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'অগ্রণী' পত্রিকায়। এই গল্প তাঁর ব্যক্তিক জীবনাভিজ্ঞতা প্রসূত। এছাড়াও এরমধ্যে অঞ্চলভিত্তিক অভিজ্ঞতা লব্ধ জীবন দর্শন স্পষ্ট। আগ্রাসন, নির্যাতন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, সাধারণের মুক্তির আকাঙ্খা এই সবই আলোচ্য গল্পের প্রাণকেন্দ্র। মধ্যবিত্ত জীবন সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পের এক বিশাল জায়গা

জুড়ে আছে । মানিকের মতোই তিনি মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতারণা, ভীরুতা, নীচতা, সুবিধাবাদ, মুখোশ গ্রহণ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতিকে সূক্ষ্ম ভাবেই তাঁর গল্পে অঙ্কন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর 'সুন্দরম', 'গোত্রান্তর', 'কাঞ্চন সংসর্গা', 'তিন অধ্যায়' প্রভৃতি গল্পের কথা বলা যেতে পারে। তাঁর আরেকটি অন্যতম গল্প হল 'পরশুরামের কুঠার' যা এক স্তন্যপীযূষদায়িনী জননীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। স্বার্থপর, ধনী ও মধ্যবিত্তের বিলাসী জীবনযাত্রার নির্মম চিত্র বাস্তবায়িত হয়েছে ধনীয়া নামক চরিত্রটির মাধ্যমে।

'অযান্ত্রিক' গল্পটির মধ্যে লেখক মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে থাকা সম্পর্কের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। বর্তমান সমাজে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কহীন নিঃসঙ্গ মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের সম্পর্ক হৃদয়ানুভূতির নয়, বরং এই সম্পর্ক ততদিনই স্থায়ী যতদিন যন্ত্র মানুষের চাহিদা পূরণ করতে তৎপর। কিন্তু এই গল্পে তার বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে। দাম্পত্য, প্রেম, ভালোবাসার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'ঠগিনী', 'শুক্লাভিসার', 'স্বর্গ হতে বিদায়'প্রভৃতি গল্পে।

সুবোধ ঘোষের কথনশৈলী তাঁর গল্পের আঙ্গিককে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর গল্পের শিল্পায়ন কৌশলও চমৎকার। শ্লেষ বক্রোক্তি, প্রতীকী ব্যঞ্জনা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি, বিদ্রূপ ব্যঙ্গ প্রভৃতি তাঁর সাহিত্যকে এক অভিনব সৌন্দর্যে বিভূষিত করেছে। জীবনবোধের এই অসামান্য শিল্পায়ন সুবোধ ঘোষকে এক আলাদা আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৪.৩.৩ কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের কৃতিত্ব :

১। কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের মধ্যে ছিল আধুনিকসত্তা এবং তার পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানী সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি তবে এই এসবের সাথে তাঁর মধ্যে ছিল পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য এবং তাদের গ্রহণযোগ্য গুণাবলি, যার প্রকাশ তাঁর লেখনীর মধ্যে স্পষ্ট।

২। কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের লেখায় নগর ও গ্রাম জীবনের দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তার প্রভাব স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে।

৩। তাঁর সাহিত্যিক নির্মাণে জীবনের গভীরতা, মানবিক সম্পর্ক এবং সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।

৪। সুবোধ ঘোষের সাহিত্যিক ভাষা প্রাঞ্জল ও আকর্ষণীয়। ভাষার সহজ অথচ যাদুকরী শক্তি তাঁর কথাসাহিত্যকে বিশেষ মাত্রা দান করে।

৫। কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ গল্পের বুনন এবং চরিত্র চিত্রণে ছিলেন সিদ্ধহস্ত।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষের সাহিত্যকৃতি আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১৪.৪ মহাশ্বেতা দেবী

বাংলা কথাসাহিত্যে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন মহাশ্বেতা দেবী। তিনি সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনাচরণ, দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, আচার, সংস্কার প্রভৃতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। কোল-সাঁওতাল-মুণ্ডা-শবর-সহিস প্রভৃতি জনজাতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখে তাদের কথাই জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। ফলত তাঁর এই প্রতিবাদী সত্তা তাঁকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে গল্প-উপন্যাস রচনায়, যা অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের থেকে তাঁকে আলাদা করে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে তিনি বৈচিত্র্য আনলেন।

১৪.৪.১ ব্যক্তি পরিচয়

১৯২৬ সালের ১৪ই জানুয়ারি ঢাকায় মহাশ্বেতা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মনীশ ঘটক ছিলেন বিখ্যাত কবি আর মাতা ধরিত্রী দেবীও ছিলেন সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত। রাজশাহির স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজিতে স্নাতক লাভ করেন। তারপরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাস করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা দিয়ে, এছাড়া তিনি ডাক বিভাগেও কাজ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৪-তে তিনি অধ্যাপনা জীবন থেকে অবসর নেন। ১৯৪৭ সালে তিনি বিবাহ করেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যকে। তাঁদেরএকমাত্র সন্তান ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক সদ্যপ্রয়াত নবারুণ ভট্টাচার্য।

মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের জন্য নানা কল্যাণমূলক কাজ করে গেছেন, যার জন্য তিনি নানা পুরস্কারও পেয়েছেন। ১৯৭৯ সালে সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৮৬ সালে ভারত সরকারের পদ্মশ্রী ও ২০০৬ সালে পদ্মভূষণ, ১৯৯৬ সালে জ্ঞানপীঠ, ১৯৯৭ সালে ম্যাগসাইসাই, ১৯৯৮ সালে রবীন্দ্রভারতী থেকে ডি.লিট, ১৯৯৯ সালে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট প্রভৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২০১৬ সালের ২৮শে জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

১৪.৪.২ সাহিত্যের পরিচয়

বিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলা কথাসাহিত্য যে ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েছে তার মূল পথ প্রদর্শক হলেন মহাশ্বেতা দেবী। তিনি তাঁর দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন— "আমি আমার লেখার কোনও পূর্বসূরী পাইনি। যেমন দেখেছি তেমন লিখছি।" তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসগুলি হল — 'নটী' (১৯৫৭), 'মধুরে মধুর' (১৯৫৮), 'যমুনা কি তীর' (১৯৫৮), 'রূপরেখা' (১৯৬০), 'তারার আধার' (১৯৬০), 'হাজার চুরাশির মা' (১৩৮১) বঙ্গাব্দ), 'ধানের শিষে শিশির' (১৯৭৬), 'স্বাহা' (১৯৭৭), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭), 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' (১৯৮০), 'তিতুমির' (১৯৮৬), 'সতী' (১৯৯০), 'ক্ষুধা' (১৯৯২) প্রভৃতি।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছোটগল্প সংকলনগুলি হল— 'সোনা নয় রূপা নয়' (১৯৬০), 'সপ্তপর্ণী' (১৯৬১), 'অবিশ্বাস্য' (১৯৭২), 'মূর্তি' (১৯৭৯), 'স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প'

(১৯৭৯), 'পাঁকাল' (১৯৮৩), 'দৌলতি' (১৯৮৪), 'ঘাতক' (১৯৮৯) প্রভৃতি। এছাড়া তিনি বেশ কিছু কিশোর গল্প সংকলনও লিখেছেন যেমন- 'গল্পের গরু ন্যাদোশ' , 'হারে-রে-রে', 'বাঘা শিকারী', 'জাতকের গল্প', 'মুনেশ্বর' প্রভৃতি ।

মহাশ্বেতা দেবী প্রায় সমস্ত গল্প— উপন্যাসে নীচু শ্রেণির কথাই তুলে ধরেছেন । কারণ এই নীচু শ্রেণির মানুষেরা সবসময় সমাজের আঞ্জালেই থেকে যায়, তাদেরকে নিয়ে কেউ কিছু লেখে না । কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী এই দলিতদের নিয়েই তাঁর সাহিত্যের রূপরেখা নির্মাণ করেছেন। তাঁর 'অরণ্যের অধিকার', 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর', 'সিধু কানুর ডাকে', 'শালগিরার ডাকে'ইত্যাদি এর প্রমাণ বহন করে । অরণ্যের অধিকারকে কেন্দ্র করে ১৮৯৯-১৯০০ সালে সংঘটিত মুণ্ডাদের বিদ্রোহ উলগুলান এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'অরণ্যের অধিকার' রচিত হয়েছে। তবে শুধু এই বিদ্রোহই নয়, মুণ্ডাদের উলগুলানের পেছনে প্রায় একশ বছর ব্যাপী সর্দারদের মুল্কুই লড়াই, তামাড় পরগনার বিদ্রোহ, পালামৌ বিদ্রোহ প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর' উপন্যাসটিতেও মুণ্ডা জনজাতির অবক্ষয়ের এক বিশ্লেষণী বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। বিশ শতকের সত্তরের দশকের উত্তাল পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর 'হাজার চুরাশির মা'অপর আরেকটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক উপন্যাস ।

উপন্যাসের মত তাঁর ছোটগল্পেও স্থান পেয়েছে শোষিত, বঞ্চিত, অসহায় আদিবাসী মানুষেরা। 'জন্মতিথি', 'বাণ', 'ব্রাহ্মণ''জাতুধান', ইত্যাদি গল্পে নিরন্ন মানুষদের করুণ প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে। আবার 'দ্রৌপদী'ও 'শিকার' গল্পে দুই নারী দ্রৌপদী ও মেরীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। নারী জাতির প্রতি অবমাননার প্রতিবাদএদের ভাষায় স্পষ্টরূপ লাভ করেছে। এই দুই অন্ত্যজ নারীর প্রতিবাদী সত্তা মহাশ্বেতা দেবীর অন্যান্য নারী চরিত্রের মধ্যেও নেই। সমাজের কুসংস্কার ও বঞ্চনা, নিদারুণ অত্যাচারের ছবি ফুটে উঠেছে মহাশ্বেতা দেবীর আরেকটি গল্প 'বাঁয়েন'-এ।

তীক্ষ্ণ, ঋজু, শাণিত ভাষা প্রয়োগে তাঁর চরিত্রগুলি বাস্তব হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যে। মহাশ্বেতা দেবীকে বলা যায় মানিক-সতীনাথ-তারাশঙ্করের মিলিত রূপ। বিচিত্র ও বিপুল অভিজ্ঞতা, প্রতিবাদী স্বভাব ও অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতি তার টান উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে । ফলে শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, ভারতীয় সাহিত্যও সমৃদ্ধ হতে পেরেছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যিক প্রতিভা বিষয়ে নীতিদীর্ঘ আলোচনা প্রস্তুত করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১৪.৫ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কথাশিল্পী হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রসংকট, কালোবাজারী, লুণ্ঠন, দুর্নীতিজনিত চরম অবক্ষয় তাঁর সাহিত্যের রূপরীতি গঠন করেছে । তারাশংকরের সাহিত্যে যেমন রাঢ়ভূমি তেমনি নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যে বরেন্দ্রভূমি প্রাধান্য বিস্তার লাভ করেছে। এককথায় বলা যায় তিনি তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের যোগ্য উত্তরাধিকার, যিনি শুধু কথাসাহিত্যে নয়, কিশোর সাহিত্যিক, নাট্যকার, সমালোচক, সাংবাদিক ও অধ্যাপক রূপেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

১৪.৫.১ ব্যক্তি পরিচিতি :

১৯১৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর জেলার বালিয়াডিঙ্গিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বরিশাল জেলার বাসুদেবপুরের নলচিরায়। পিতা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন দারোগা। ১৯৪১ সালেকলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল লাভ করায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'ব্রহ্মময়ী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯৬০ সালে তিনি ডি.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তারপর জলপাইগুড়ি (১৯৪২-৪৫) ও সিটি কলেজে (১৯৪৫-৫৫) অধ্যাপনা করার পর ১৯৫৬ সাল থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর প্রকৃত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নারায়ণ' তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম।

১৪.৫.২ সাহিত্য জীবন :

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হলেন সমাজসচেতন শিল্পী, তাই সেই সময়ের মানুষ ও তাদের জীবনবোধ তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে । সাম্যবাদী ভাবনায় দীক্ষিত এই লেখকের সাহিত্য উপাদান সংগ্রহ করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন নানা ঘটনা থেকে । তিনি ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হল: 'উপনিবেশ' (তিনপর্ব) (১৯৪৬), 'তিমিরতীর্থ' (১৯৪৪), 'মন্দ্রমুখর' (১৯৪৫), 'স্বর্ণসীতা' (১৯৪৬), 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' (১৩৫১), 'সূর্যসারথি' (১৯৪৮), 'বৈতালিক' (১৯৪৮), 'ট্রফি' (১৯৪৯), 'বিদিশা' (১৯৪৯), 'শিলালিপি' (১৯৪৯), 'পদসঞ্চার' (১৯৪৯), 'লালমাটি' (১৯৫১), 'মেঘরাগ' (১৯৫৯), 'বিদূষক' (১৯৫৯), 'অমাবস্যার গান' (১৯৬৫), 'পাতাল কন্যা' (১৯৬৬), 'কাচের দরজা' (১৯৭০) প্রভৃতি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'উপনিবেশ'রচনা সমন্ধে নিজেই জানিয়েছেন— "উপন্যাস লেখার কথা সেইদিনই আমার মনে এসেছিল— যেদিন প্রথম অনুভব করেছিলাম পৃথিবীটা অনেক বড়।" নিম্ন বঙ্গের সমুদ্র সংলগ্ন সুন্দরবনের জীবন, সেই জীবনের বিস্তার, তার সামগ্রিক পটভূমি ও বৈচিত্র্য এই উপন্যাসে স্থান লাভ করেছে। 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' উপন্যাসে কামারগোষ্ঠীর এবং 'লালমাটি' উপন্যাসে আহীর সম্প্রদায় ও জেলে পরিবারের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। আবার আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত 'মন্দ্রমুখর' উপন্যাসটিতে ধরা পড়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বাস্তব রূপ। একদিকে যুদ্ধভয়ে তটস্থ গ্রামের সাধারণ মানুষ আর অপরদিকে আগষ্ট আন্দোলনে সারা দেশের নগরের মানুষগুলির উদ্দাম বিপ্লবী স্বভাবের প্রকাশ উপন্যাসটিকে আলাদা মাত্রা দান করেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নানা ঘটনা ছাড়াও যুগ নিরপেক্ষ যে কোনো বিষয়ও তাঁর ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলি হল :'বীতংস' (১৯৪৫), 'দুঃশাসন' (১৯৪৫), 'ভাঙা বন্দর' (১৯৪৫), 'জন্মান্তর' (১৯৪৬), 'কালা বদর' (১৯৪৮), 'শ্বেতকমল' (১৯৫১), 'উর্বশী' (১৯৫৬), 'রাতের মুকুল' (১৯৬৪), 'আলেয়ার রাত' (১৯৮১) প্রভৃতি।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের নানা যুগান্তকারী ঘটনা 'দুঃশাসন', 'পুষ্করা', 'ভাঙা চশমা' ইত্যাদি গল্পে উঠে এসেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পদুটি যেন একই বিষয় বস্ত্রসংকটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে গল্পদুটির উদ্দেশ্য অভিন্ন। 'দুঃশাসন' গল্পে আছে প্রতিবাদ আর 'দুঃশাসন' গল্পে আছে আসন্ন বিপ্লবের আভাস। দেশবিভাগের বেদনার ছবি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'তিতির' ও 'সীমান্ত' গল্পদুটিতে। উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে রচিত তাঁর 'বাইশে শ্রাবণ', 'শ্বেতকমল' এবং 'শুভক্ষণ' উল্লেখযোগ্য। অতএব বলা যায় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবেশ রূপায়ণে, বিশুদ্ধ সময় চেতনায়, মানুষের প্রতি ভালোবাসায় ও জীবন প্রেমে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য সঞ্জীবিত।

১৪.৬ সমরেশ বসু

বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন শক্তিশালী লেখক হলেন সমরেশ বসু, যাঁর আরেকটি সত্তা কালকূট। তিনি সাহিত্যের অন্য কোন ধারায় নয়, শুধুমাত্র উপন্যাস ও গল্প লিখেই তার সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন-যা তাঁকে এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর লিখিত রচনা সমগ্রের আকার বিশাল, যা গুণে শেষ করা সম্ভব নয়। তিনি বাংলা সাহিত্যের বনস্পতির মত বিশাল প্রতিভা। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় শতাধিক এবং গল্পের সংখ্যা তার দ্বিগুণ। সমরেশ বসু লেখা প্রথম গল্প 'আদাব'এবং তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস হল 'উত্তরঙ্গ' ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় যদিও তাঁর লিখিত প্রথম উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি' ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়।

১৪.৬.১ ব্যক্তি পরিচয়

সমরেশ বসু জন্ম গ্রহণ করেন ১৯২৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার রাজনগর গ্রামে। তার বাবার নাম মোহিনী মোহন বসু ও মা শৈবালিনী দেবী, পিতৃত্ব নাম সুরথনাথ। পরে বন্ধু ও শ্যালক দেবশঙ্করের পরামর্শে সমরেশ- নামে পরিবর্তিত হয়। তাঁর পরিবারে সাংস্কৃতিক আবহাওয়া ছিল। তাঁর বাবা মোহিনী মোহন ছিলেন বেশ কিছু গুণে গুণবান ব্যক্তি। ভালো গান গাইতে পারতেন, আবার গান রচনাও করতেন। গান ছাড়া ছবি আঁকার ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। আবার তিনি অভিনয়ও করতে পারতেন। সমরেশ বসুর মার মধ্যে ছিল এক অসাধারণ গুণ। তিনি খুব সুন্দর করে ব্রতকথা ও গল্প বলতে পারতেন। তিনি তার মায়ের কাছ থেকেই সাহিত্য রচনার প্রেরণা পেয়েছেন। মায়ের প্রসঙ্গে সমরেশ বসু 'নিজেকে জানার জন্য' নামক প্রবন্ধে বলেছেন- "সাহিত্যকর্মে প্রবেশের প্রেরণার বিষয় প্রথম কিভাবে

আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, ঝটিতে এর যা জবাব বা ব্যাখ্যা দিতে পারি তা হবে অনেকটাই মামুলি, কারণ যখন এই উপলব্ধি ঘটল তার ভিতরে একটি বাসনা জাগরিত হচ্ছে আমি সাহিত্যকর্মে প্রবেশ করতে চাই প্রকৃতপক্ষে তার অনেক আগেই শৈশবের চিন্তার জগতে প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল এক কল্পলোক। অজ্ঞানত তার ধাত্রী বা ধাত্রী বলা যায় আমার মা যার মুখে শুনতাম অভূতপূর্ব সব ব্রত কথার কাহিনী। ... আমার কাছে ব্রতকথা আকর্ষণ ছিল তীব্র, যা আমার মা বলতেন ঢাকা জেলার গ্রাম্য আটপৌরে ভাষায়, যে ভাষা ছিল স্নিগ্ধ বলার ভঙ্গিতে থাকত বিশ্বাসযোগ্য অভিব্যক্তি। ...সেইসব ব্রতকথা কাহিনী শৈশবের হৃদয় ও মন কেয়ার জন্য করে রাখত এবং তখনই প্রেরণা বোধ হতো। যার ভাবনায় চিন্তার ধারণাটা তখন ছিল একেবারেই আলাদা অন্য বন্ধুদের শোনাতে হবে সেই কাহিনী। ... একে যদি প্রেরণা বলা যায় তবে তাঁর পদধ্বনি সেই শৈশবেই বেজেছিল, অচেতন, এবং সেইসব ব্রতকথা ও কথকতার মধ্যদিয়ে।"

সমরেশ বসুর স্বভাবে ছিল বন্ধনহীন। ঢাকা ও নৈহাটিতে তাঁর বিদ্যালয় জীবন কাটলেও তিনি অষ্টম শ্রেণীর গণ্ডি পেরোতে পারেননি। তাই কটন মিলে কাজেও আকর্ষণ অনুভব করেননি। স্কুল পালানোর মতো কারখানা পালানো শুরু করেছিলেন তিনি। তাঁর দাদা নৈহাটিতে থাকতেন সেখানেই তাঁর স্থান হয়।

জীবিকার জন্য শুরু করেন ডিম, মুরগি, সবজি, বিক্রির কাজ। সে সময় জগৎ দলের নেতা সত্য প্রসন্ন দাশগুপ্ত তার প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাঁকে দলের পোস্টার লেখার কাজ দেন। ১৯৪২ সালে গৌরী দেবীর সাথে বিয়ে হয় এবং ওই বছরে প্রসন্নের প্রভাবে ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে চাকরি পান।

১৯৪৬ এ তিনি ও গৌরী দেবী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন, কিন্তু পার্টি নেতাদের স্বার্থপরতা, হীনতা ধীরে ধীরে তার মনকে বিরূপ করে তোলে। ১৯৪৯-এ কমিউনিস্ট পার্টির নিষিদ্ধ হলে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তখন তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে গৌরী দেবী বিপর্যস্ত হন এবং মাসিক দেড়শো টাকা ব্যবস্থা করে দেন। ১৯৫১ তে কারামুক্ত হয়ে রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য সাহিত্য রচনাকে বেছে নেন।

১৪.৬.২ সাহিত্যিক জীবন

সমরেশ বসু উপন্যাস,গল্প, ভ্রমণ সাহিত্য, কিশোর সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হল : 'বি. টি. রোডের ধারে (১৯৫২), 'শ্রীমতী কাফে' (১৯৫৩), 'সওদাগর (১৯৫৫)', 'গঙ্গা' (১৯৫৭), 'জগদ্দল' (১৯৬৬), 'প্রজাপতি' (১৯৬৭), 'স্বীকারোক্তি' (১৯৬৭), 'পদ্মা', 'মানুষ', 'বিশ্বাস', 'পথিক' প্রভৃতি। তাঁর প্রকাশিত ছোটগল্প সংকলনগুলি হল 'মরশুমের একদিন' (১৯৫৩), 'অকাল বৃষ্টি' (১৯৫৩), 'ঋতু' (১৯৫৩), 'পশারিনী' (১৯৫৫), 'চেতনার অন্ধকার' (১৯৭২), 'বনলতা' (১৯৬৭), প্রভৃতি।

আমরা যদি তাঁর উপন্যাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাই তাহলে দেখা যাবে যে ইতিহাসের সূত্র ধরে সমরেশ বসু 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের শ্রেণীগত বৈষম্য ও শ্রেণী শোষণের দিক থেকে স্পষ্ট

করেছেন। এই উপন্যাসের উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন ইচাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে চাকরিকালে। প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি অবস্থায় তিনি উপন্যাসের রূপ দিতে থাকেন। 'বি.টি. রোডের ধারে' উপন্যাসটি বস্তির জীবনের বিভিন্ন চরিত্রের জটিল মানসিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ। আটপুর, জগদ্দল অঞ্চলের শ্রমিক জীবনের বাস্তব দলিল এই উপন্যাসটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে কৃষিজীবী শ্রমজীবী মানুষের যে কি দুর্দশা হয়েছিল, নাগরিক সাংস্কৃতিক রূপের অন্তরালে যে অস্বাস্থ্যকর অন্ধকার জীবন নিয়ে সাধারণ মানুষ দিন গুজরান করত- তাকেই বলিষ্ঠ রূপে এঁকেছেন লেখক।

'শ্রীমতী কাফে' রচনাকাল ১৯২২-১৯৩৯, যে সময় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলছিল সেই সময় একটি মফস্বল শহরে ছিল শ্রীমতী কাফের নামে একটি খাবারের দোকান সেই দোকানে বিপ্লব ও সাম্যবাদের আলোচনা হত ফলে লোকের কাছে মনে হতো এটি কমিউনিস্ট পার্টির অফিস।রেস্টুরেন্টের মালিকের ভাই নারায়ণ প্রথম বিপ্লবের বাণী বহন করে এনেছিলেন, সেই অঞ্চলে মুক্ত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই সময়ের সাথে ভজন চরিত্রের মধ্যে মধ্যবিত্তের সংকট ও পলায়ন ভঙ্গি লেখক উপস্থাপন করেছেন। 'স্বীকারোক্তি' উপন্যাসে ও বিশ্বাসের সংকট। লেখক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন সামন্ততন্ত্রের সঙ্কখলন ও ধনতন্তের কুফলকে। আসলে লেখক এর সমকালীন জীবন সম্পর্কে অনাস্থা, রাজনীতি সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গ, এই উপন্যাসের নায়ক সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে।

আমরা যদি তার ছোটগল্পের দিকে দৃষ্টি বেড়ায় তাহলে তার প্রথম সাড়া জাগানোর গল্প 'আদব' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে মানবিকতার গল্প। গল্পটির পটভূমি দাঙ্গা লাঞ্চিত ঢাকা শহর ও গল্পের বিষয়ক লেখকের অভিজ্ঞতা প্রসূত। নৈহাটির শিল্পাঞ্চলের অভিজ্ঞতা ও পূর্ববঙ্গের স্মৃতি গল্পটিতে উপাদান জুগিয়েছে। 'পশারিনী' গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'কিসমিস' গল্পটি রাজনৈতিক মতাদর্শের গল্প, গল্পটিতে বেচন চরিত্রের বিবর্তন ও সেই সূত্রে কারখানার শ্রমিকদের বস্তি জীবনের চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে।

সমরেশ বসুর গল্পে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক-কৃষক, ভিখারী-বাউন্ডুলে,অসহায়-আতুর সকলেই ভিড় জমিয়েছে। শুধু বিষয় বৈচিত্র্যে নয়, মানসিকতা বিভিন্ন স্তরের পরম্পরায় বিশ্লেষণে ও জীবনানুরাগের তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি তাঁর গল্পে এসেছে প্রেক্ষাপট হিসেবে কিন্তু সেই সব গল্পগুলির শিল্প সাফল্য সেই প্রেক্ষাপটের জন্য নয় প্রেক্ষাপটে থেকে উঠে আসা মানববোধের মনুষ্যত্বের উত্তরণে।

১৪.৭ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ স্বতন্ত্র্য চিহ্নিত আসনটি স্থায়ী করে যেতে পেরেছেন। তার প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'আগামী'। এছাড়া তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: 'তৃতীয় ভুবন', 'বিবাহ বার্ষিকী' প্রভৃতি। তাঁর গল্পসংকলন চারটি : 'কাছের যারা', 'চর্যাপদের হরিণী', 'হাওয়া না হাওয়া', 'অশ্বমেধের ঘোড়া'। 'আগামী' দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস। এই উপন্যাসের ভূমিকা লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর

রায়। উপন্যাসটির মধ্যে পদ্মা নদীর দুই তীরে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান দুটি গ্রামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে নদী, নিসর্গ, গাছপালার প্রচুর বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। এছাড়াও উপন্যাসটির মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দাঙ্গার চক্রান্তকারীদের পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে। 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাসটি তাঁর আরেকটি অন্যতম রচনা। আলোচ্য উপন্যাসটির মধ্যে একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের চারদিকে ছবি চিত্রিত হয়েছে। একটি মেয়ে কিভাবে বিভিন্ন অভিঘাতে বার বার বিবর্তিত হতে পারে সেই জটিলতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ উপন্যাসটিকে একটি আলাদা মর্যাদা দিয়েছে।

বাংলা কথাসাহিত্যে গল্পকার হিসেবে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতি। তিনি জীবনের গভীর রহস্য সন্ধান করেছেন। জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি তাঁর রচনার স্বাতন্ত্র্য। দীপেন্দ্রনাথের গল্প সংগ্রহের ৩১টি গল্পের মধ্যে প্রথম গল্প 'বৃত্ত' প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে এবং শেষ গল্প 'হওয়া না হওয়া' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে। তাঁর অন্যান্য গল্পগুলি হল:- 'গ্রহণ' (১৩৫৯), 'সানাই' (১৩৫৯), 'কিন্তু' (১৩৫৯), 'মহাকাব্যের ভূমিকা' (১৩৬০), 'গান' (১৩৬১), 'চর্যাপদের হরিণী' (১৩৬৬), 'জটায়ু' (১৩৬৭), 'অশ্বমেধের ঘোড়া' (১৩৬৭) প্রভৃতি।

আমরা যদি তার রচনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখা যাবে যে তিনি তার দশ বছর বয়সেই দেখেছিলেন পঞ্চাশের মন্বন্তর, পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তারপরে দেশভাগ ও উদ্বাস্তুদের আশ্রয়হীনতা। মানবতার এই অপমান, লাঞ্ছনা তাঁকে ব্যথিত করে এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গড়ে তোলে। তাই তার গল্পে রয়েছে জাতীয় আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, পারমাণবিক সমস্যা, মহাকাশ অভিযান ইত্যাদি।

দেশভাগ ও মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত 'গ্রহণ' গল্পটি। বৃদ্ধা সুবাসিনী উদ্বাস্তু কলোনি জীবনের সমকালীন প্রেক্ষিত বাস্তব রূপ পেয়েছে। বেকারত্ব ও দারিদ্রতার অসহায়তার ছবি 'সানাই' গল্পে চিত্রিত হয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন সমস্যায় জয়ী হয়েছে জীবন। তাই মনীষা ও সুরঞ্জনের না বলা কথার মধ্যে বেজে উঠেছে 'সানাই'। 'মহাকাব্যের ভূমিকা' ছোটগল্পটি আঙ্গিকগত দিক থেকে বড়গল্প। গল্প লেখার ছলে গল্পকার বিপ্লবী নন্দনতত্ত্বের ইফতারের আভাস দিতে চেয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্গীয় মানুষদের বাস্তব জীবন ও শ্রেণী সংগ্রামের প্রত্যয়কে রূপায়িত করেছেন লেখক।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পটি বাংলা ছোটগল্প ধারার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। সমসাময়িক কালের সময় ও সমাজের রূপায়ণে গল্পটি অনবদ্য। গল্পটির পটভূমিকায় রয়েছে পঞ্চাশের কলকাতা, যেখানে তখনও রয়েছে ইংরেজদের শোষণের ক্ষতিচিহ্ন। গল্পে রেখা ও কাঞ্চনের আশ্রয় সন্ধানে সমান্তরালভাবে সময় ও সমাজের ক্ষয় ও ক্ষয়ের একটি চিত্র যেন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠার মধ্যে গল্প নিহিতার্থ।

মার্কসবাদের মত আদর্শকেই শুধু উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করে নতুন ভঙ্গিতে নতুন ধরনের গল্প রচনায় ভর্তি হয়েছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনকার গল্প লেখকদের জনারণ্যে তিনি নিঃসঙ্গ পথিক কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ে তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন নি। আশাভঙ্গের হতাশায় ডুবে গিয়েও ফিরে এসেছেন তিনি, শুধু হার মেনেছেন ৪৬ বছর বয়সে নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে। সমালোচক গোপাল হালদারের বক্তব্যের মধ্যদিয়ে আলোচনার ইতি টানা যেতে

পারে— "সৃষ্টির ও দৃষ্টির সব সময় মিলন ঘটে না। কিন্তু যথার্থ স্রষ্টার থাকে সেই সুখ নিশ্চিত দৃষ্টি, আরো তাকে গভীরতর সত্যবোধ ও প্রেম। প্রথম থেকেই দীপেন এর ছিল এই সব দৃষ্টির শক্তি ও সৃষ্টির নিশ্চয়তা, সত্যবোধ ও প্রেম-ছিল সবই, ছিল আপনাকে প্রকাশের, বিকাশেরও সংকল্প"।

১৪.৮ নবারুণ ভট্টাচার্য

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একজন শক্তিশালী লেখক হলেন নবারুণ ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় কবি ও কথাসাহিত্যিক। তিনি ২৩ জুন ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত নাট্যকার অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য এবং সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর একমাত্র সন্তান নবারুণ ভট্টাচার্য।

স্কুল জীবনে তিনি বালিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় পড়াশোনা করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভূতত্ত্ব ও পরবর্তীতে ইংরেজি বিষয়ে পড়াশোনা করেন। চাকরিজীবনে তিনি ১৯৭৩ সালে একটি বিদেশী সংস্থায় যোগদান এবং ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সেখানে চাকরি করেন। তারপর কিছুদিন বিষ্ণুদে'র 'সাহিত্যপত্র' সম্পাদনা করেন এবং ২০০৪ থেকে 'ভাষাবন্ধন' নামের একটি পত্রিকা পরিচালনা করে। একসময় দীর্ঘদিন তিনি 'নবান্ন' নাট্যগোষ্ঠী পরিচালনা করেন।

কবি, গল্পকার, এবং ঔপন্যাসিক এই তিনটি পরিচয়ের মিশেলে নবারুণ গড়ে তুলেছিলেন স্বকীয় একটি ধারা। নাটক করেছেন কলকাতার মঞ্চে। বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী নবারুণ দীর্ঘদিন কাজ করেছেন 'সোভিয়েত দেশ'পত্রিকায়।'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না'— এর মত কবিতার পঙ্‌ক্তি কিংবা 'হারবার্ড', 'কঙ্কাল মালসাট'- এর মত তির্যক উপন্যাস গড়ে তুলেছিলেন নবারুনের প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভাবমূর্তি। ব্যক্তি জীবনেও তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর।

নবারুণ ভট্টাচার্য কাব্যগ্রন্থ, ছোটগল্প, উপন্যাস প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হল— 'হারবার্ড' (১৯৯৩), 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' (১৯৯৬), 'অটো ও ভোগী', 'কাঙাল মালসাট', 'মবলগে নভেল', 'খেলনা নগর' প্রভৃতি। তাঁর রচিত ছোটগল্প সংকলনগুলি হল:- 'হালাল ঝান্ডা' (১৯৮৭), 'নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প' (১৯৯৬, 'নবারুণ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠগল্প', 'ফ্যাতাড়ুর কুম্ভিপাক', 'ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক' প্রভৃতি।

নবারুণ ভট্টাচার্যের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ভাসান' (১৯৬৮ সালের সাহিত্য পত্রিকা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়। এটি নকশালদের বোমা হামলায় পার্কে নিহত এক পাগলের গল্প, যে এখন তার মৃতদেহের মধ্য দিয়ে কথা বলতে বা ভাবতে থাকে। (১৯৬৮ সাল ছিল বিশ্বের একটি উল্লেখযোগ্য বছর- দুর্নীতিগ্রস্ত ও অদক্ষ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এবং বিভিন্ন দেশের ছাত্র ও শ্রমিক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় পশ্চিমবঙ্গ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হয়েছিল এবং খাদ্য আন্দোলনে সামাজিক অবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই বিষয়গুলি (১৯৬৭-৬৮) সালের নকশালবাড়ি এলাকায় উপজাতি-কৃষক বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটায় যা নকশাল আন্দোলন নামে পরিচিতি পায়। নবারুণ ভট্টাচার্যের সাহিত্য রচনা সূচনা সেই বৈশ্বিক রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিবেশে হয়েছিল এবং বারবার রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন ও প্রতিরোধের বিষয়গুলোতে ফিরে

এসেছিল।

তাঁর পরবর্তী তৃতীয় বিশ্বের নগর জীবনের প্রান্তিক এবং অদৃশ্যমান চরিত্রগুলোর মত। বিস্ফোরণ নবারুণের একটি পুনরাবৃত্ত বিষয়। ১৯৯৩ সালে নবারুণ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'হারবার্ড' প্রকাশ করেন যা হারবার্ট সরকারের জীবন ও সময়কাল নিয়ে লেখা। ১৯৯৫ সালে 'প্রমা' পত্রিকায় প্রকাশিত নবারুণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি 'ফ্যাটারু'-এ বিস্ফোরণ ক্ষতির চেতনায় পরিণত হয়। পায়াটার ওরা হলো নিম্ন শ্রেণীর উড়ন্ত মানুষ যাদের কাজ হল উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সম্পত্তি নষ্ট করা এবং তাদের ব্যক্তিগত স্থানগুলোকে নোংরা করা তারা তাদের হঠাৎ উড়ে যাওয়ার মাধ্যমে পুলিশদের মধ্যে ভয় তৈরি করে। নবারুণ তাঁর পরবর্তী অনেক গল্পে এই চরিত্রগুলি চালিয়ে যান যার মধ্যে রয়েছে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'কাঙাল মালসাট'।

১৪.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ

বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবারুণ ভট্টাচার্য হলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, যাঁরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তর, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও মানবজীবনের অন্তর্লীন টানাপোড়নেকে তুলে ধরেছেন। সুবোধ ঘোষ তাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক গল্পের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য স্থান অধিকার করেছেন। 'ফসিল' তাঁর অন্যতম কালজয়ী রচনা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন ব্যঙ্গ ও কৌতুকধর্মী লেখার পথিকৃৎ, তাঁর 'টেনিদা' চরিত্র বাংলা কিশোর সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। সমরেশ বসু নগর জীবনের বাস্তবতা, শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-সঙ্কট তুলে ধরেছেন 'গঙ্গা' ও 'শাম্ব' উপন্যাসে। মহাশ্বেতা দেবী সমাজের শোষিত, নিপীড়িত মানুষের কথা বলেছেন, বিশেষত আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষের জীবনকে তুলে ধরেছেন 'হাজার চুরাশির মা' এবং 'অরণ্যের অধিকার'-এ। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে জীবনদর্শন ও গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এনেছেন। নবারুণ ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবী ও আঙ্গিকগত নতুনত্ব এনেছেন, 'হারবার্ট' উপন্যাসে যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে। তাঁরা তাঁদের বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা কথাসাহিত্যের ধারা সমৃদ্ধ করেছেন এবং পাঠকের চিন্তাজগতকে প্রসারিত করেছেন।



১৪.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতা স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা গ্রহণ সম্ভব হল।
- বাংলার কথাসাহিত্যের বর্তমান গতিপ্রকৃতি বোঝা সম্ভব হল।
- বাংলা প্রতিভাবান ও ব্যতিক্রমী কথাসাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি সাহিত্যিক জীবন সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠল।



১৪.১১ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, দেবেশ (২০১০) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; ২য় খণ্ড; কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- আচার্য্য, দেবেশ (২০২১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; ৩য় খণ্ড; কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- আচার্য্য, দেবেশ (২০২১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; ৪র্থ খণ্ড; কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- গুপ্ত, ক্ষেত্র (২০০৬) বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস; কলকাতা : গ্রন্থ নিলয়
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮) বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা; কলকাতা : তুলসী পাবলিকেশন
- চৌধুরী, ভূদেব (২০০৮) বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার; কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি
- দত্ত, বীরেন্দ্র (১৪০৫ বাংলা); বাংলা কথাসাহিত্যের একাল (১৯৪৫-১৯৮০) কলকাতা : পুস্তক বিপণি



১৪.১২ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। কল্লোলোত্তর কথাসাহিত্যের মধ্যে একজন অন্যতম শিল্পী হলেন সুবোধ ঘোষ।। ..."তিলাঞ্জলি" উপন্যাসের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু হয়... এভাবে উত্তর নির্মাণ করতে হবে। (দ্রষ্টব্য : ১৪.৩.২ অংশ)

২। বিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলা কথাসাহিত্য যে ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েছে তার মূল পথ প্রদর্শক হলেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসগুলি হল — 'নটী' (১৯৫৭), 'মধুরে মধুর' (১৯৫৮)... এভাবে সাহিত্যকৃতি সাজাতে হবে। (দ্রষ্টব্য : ১৪.৪.২ অংশ)



১৪.১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক কৃতিত্ব নিজের ভাষায় লিখুন।

২। আধুনিক কালের বিশিষ্ট কথাশিল্পী সমরেশ বসুর কথাসাহিত্যিক কৃতিত্ব বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। বাংলা কথাসাহিত্য জগতের বিশিষ্ট শিল্পী দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৪। ব্যতিক্রমী কথাসাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্য বিষয়ে বিশদে আলোচনা করুন।

.....